Contents

তাওহীদের ডাক

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫

- নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি
- সাংগঠনিক মযবুতির উপায়
- আদর্শ সমাজ গঠনে লুক্বমান হাকীমের উপদেশ
- শরণার্থী সংকট : চিন্তিত বিশ্ব নেতৃবৃন্দ!
- ইসলামের দৃষ্টিতে কাফফারা
- শিশু-কিশোরদের উপর নৃশংস নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার

◆ সাক্ষাৎকার

মুহতারাম আমীরে জামা'আত

◆ সরেযমীন প্রতিবেদন

সাতক্ষীরা যেলার কিছু মাযার ও খানকা

বিশেষ সংখ্যা

কর্মী সম্মেলন ২০১৫



ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা

Contents

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

২৫ তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সহকারী সম্পাদক : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯ (বিকাশ)
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www.tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

Contents

সম্পাদকীয়

সমাজ উন্নয়নে চাই সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব

নেতা সমাজ ও দেশের পরিচালক, সমাজ উন্নয়নের পথ নির্দেশক ও জাতির নিয়ন্ত্রক। নেতা ভাল হ'লে সমাজ ও রাষ্ট্র ভাল হয়; নেতা মন্দ হ'লে সমাজ ও রাষ্ট্র মন্দ হয়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজ অসৎ ও অযোগ্য নেতৃত্ব সমাজ জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। অথচ শান্তিকামী বনু আদম শান্তির অন্বেষায় পাগলপারা। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই। সর্বত্রই হিংসা-হানাহানি বিরাজ করছে। এর কারণ আমাদের দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব। দেশে বর্তমানে দু'ধরনের নেতা রয়েছে- ১. সৎ, যোগ্য ও দক্ষ, ২. অসৎ, অযোগ্য ও অদক্ষ। প্রথম প্রকারের নেতার মাধ্যমে সমাজ ও দেশ উন্নত হয়, জাতি হয় আদর্শবান। তারা সমাজে দিশারীর ভূমিকা পালন করেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের নেতার দ্বারা দেশ ও জাতি অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়। সমাজ অবক্ষয়ের দিকে ক্রমশঃ ধাবিত হয়। দেশের নাগরিকদের মধ্যে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ব্যক্তিস্বার্থ জন্ম নেয়। জাতি আদর্শহীন জাতিতে পরিণত হয়। বর্তমানে সর্বত্র এই প্রকার নেতারই আধিক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নেই; জনজীবনে নিরাপত্তা নেই। সামাজিক জীবন হচ্ছে পর্যুদস্ত। আর এ অবস্থা সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের প্রচলিত দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা। এ নির্বাচন ব্যবস্থার বিষময় ফল হচ্ছে সামাজিক দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক রেষারেষি, খুন-খারাবী, গুম-হত্যা, কালো টাকার ছড়াছড়ি ইত্যাদি। যার রেষ পরিবার পর্যন্ত গড়াচ্ছে। ফলে পরিবারও হয়ে উঠছে অশান্তির অগ্নিগর্ভ। সুশাসনের জিগির তুলে এবং নেতৃত্বের সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষকে নির্বাচনে নামানো হয়। কিন্তু শেষ পরিণামে জনগণই হয় শোষণ ও বঞ্চনার নির্মম শিকার। অথচ তখন তাদের করার আর কিছু থাকে না।

সমাজবদ্ধ মানুষ একজন নেতার অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। যার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হয়। নেতৃত্ব যেহেতু চেয়ে নেওয়ার বিষয় নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৩)*, তাই অন্যদেরকে নেতা বাছাই করতে হয়। আর এ বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে। নেতা নির্বাচনের দু'টি পদ্ধতি হচ্ছে- (ক) শূরা কর্তৃক মনোনীত ও (খ) জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত। বিশ্বে বর্তমানে দ্বিতীয় পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন দল থেকে মানুষ প্রার্থী হয়, নিজেরা নেতৃত্ব প্রার্থনা করে। আর দেশের সকল শ্রেণীর জনগণ নিজেদের মতামত বা রায় প্রদান করে এ নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। এখানে মেধা ও মননের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। সততা ও ন্যায়পরায়ণতাকেও বিবেচনায় আনা হয় না। বরং প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিত্ত-বৈভবকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে অদক্ষ, অযোগ্য ও অসৎ লোকেরাই সাধারণতঃ নির্বাচিত হন। অপর দিকে নির্বাচন নির্দিষ্ট মেয়াদ ভিত্তিক হওয়ায় মানুষ সর্বদা ক্ষমতা লাভের নেশায় মত্ত থাকে। একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ ও অব্যাহত গীবত-তোহমত এবং গুম-খুন ও অপহরণের মত জঘন্য কাজের ভিতর দিয়ে তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। জনগণের সেবা করার সময় ও সুযোগ তাদের হয়ে ওঠে না। বরং নির্বাচনের পর থেকে নেতারা থাকেন জনগণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। নাগরিকরা কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তি থেকে চরমভাবে বঞ্চিত হয়। যতদিন দেশে এ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকবে, ততদিন দেশের অবস্থা হবে আরো করুণ ও শোচনীয়।

নেতা নির্বাচনের প্রথমোক্ত পদ্ধতি হচ্ছে শূরা বা পরামর্শ ভিত্তিক মনোনয়ন পদ্ধতি। দূরদর্শী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ পরামর্শের ভিত্তিতে একজন দক্ষ, যোগ্য ও সৎ ব্যক্তি নেতা মনোনীত হবেন। কেননা যোগ্য ও বিচক্ষণ নির্বাচক ব্যতিরেকে যোগ্য বিচক্ষণ নেতা নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। সমাজের সীমিত সংখ্যক জ্ঞানী ও দূরদর্শী ব্যক্তিরাই নেতা নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবেন। এক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হ'লে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এতে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। বরং তারা নেতা মনোনীত হওয়ার পরে তার কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করবে। এভাবে নেতা মনোনীত হ'লে তাকে কেউ দলীয় ভাববে না এবং তিনিও কারো প্রতি দলীয় প্রীতি বা বিদ্বেষ পোষণ করবেন না। কারণ তিনি প্রার্থী হননি এবং কেউ তাকে ভোট দেয়নি। ফলে সকলের প্রতি তার দৃষ্টি হবে সমউদার। তিনিও সকলের নিকটে হবেন গ্রহণীয় ও বরণীয়। আর নেতা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মন নিয়েই অধীনস্তদের সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র পথে পরিচালনার চেষ্টা করবেন। যিনি তা করতে সক্ষম হবেন, তিনি সফল বিবেচিত হবেন। যে সমাজ ও রাষ্ট্রে এরূপ নেতৃত্ব থাকবে, সে সমাজ ও রাষ্ট্র সুদৃঢ় ও সফলকাম হবে। আর যে জাতি এই ধরনের নেতৃত্ব পাবে, সে জাতি হবে ধন্য।

এক্ষণে এ ধরনের নেতা নির্বাচনে আমাদের পরামর্শ হ'ল, দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নেতা মনোনীত হবেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞদের নিয়ে ছোট্ট একটি পরামর্শসভা গঠন করবেন। পরামর্শকগণ নিজেরা ও অন্যান্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে সমাজ ও দেশ পরিচালনা করবেন আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী *(মুসলিম হা/১২৯৮; মিশকাত হা/৩৬৬২)*। নেতা ও পরামর্শকরা সর্বদা আল্লাহ, মজলিসে শূরা ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকবে। যা ইসলামী বিধানমতে বিচার করবে। সেখানে যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণিত হ'লে তিনি স্বীয় দায়িত্ব থেকে অপসারিত হবেন এবং ইসলামী বিধান মতে দণ্ডিত হবেন।

সুতরাং সৎ ও যোগ্য নেতা মনোনীত হ'লে এবং তার দ্বারা দেশ ও সমাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হ'লে সমাজ ও দেশ উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করবে এবং সেখানে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী বিধান মতে সমাজ ও দেশ পরিচালনার তাওফীক দিন- আমীন!

Contents

হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা

আল-কুরআনুল কারীম :

١- وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

(১) ‘তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়রূপে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে উহা বিচারকগণের নিকট পেশ কর না’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

٢- وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوْا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا.

(২) ‘ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং ভালোর সাথে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশ্রিত করে গ্রাস কর না, নিশ্চয় ইহা মহাপাপ’ *(নিসা ৪/২)*।

٣- وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيْبًا.

(৩) ‘ইয়াতীমদেরকে যাচাই করবে যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয় এবং তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংযত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রাখবে। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট’ *(নিসা ৪/৬)*।

٤- إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

(৪) ‘যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে’ *(নিসা ৪/১০)*।

٥- وَتَرَى كَثِيْراً مِنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ.

(৫) ‘তাদের অনেকেই আপনি দেখবেন পাপে, সীমালংঘন ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর; তারা যা করে নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট’। রব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণ কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? তারা যা করে নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট’ *(মায়েদা ৫/৬২-৬৩)*।

٦- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ- إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

(৬) ‘নিশ্চয় আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফারমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তাতে কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু’। ‘আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা নিজেদের উদরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছু পুরে না। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে’ *(বাক্বারাহ ২/১৭৩-১৭৪)*।

٧- وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ.

(৭) ‘যাতে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা আহার কর না; উহা অবশ্যই পাপ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাদের কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে’ *(আন‘আম ৬/১২১)*।

হাদীছে নববী :

٨- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنِّي أُوتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوْهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوْهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.

Contents

(৮) মিক্বদাম ইবনু মা'আদীকারাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জেনে রাখ! আমাকে কুরআন এবং তার সাথে অনুরূপ (সুন্নাহ)ও দেওয়া হয়েছে। জেনে রাখ! এমন এক সময় আসবে, যখন কোন উদরপূর্ণ বিলাসী লোক তার তখতে বসে বলবে, তোমরা শুধু এই কুরআনকে গ্রহণ করবে এবং তাতে যা হারাম পাবে তাকে হারাম জানবে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা হারাম করেছেন তাও তারই অনুরূপ, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। জেনে রাখ! তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধা হালাল নয় এবং কেনানো ছেদন-দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র পশুও তোমাদের জন্য হালাল নয়। এমনিভাবে সন্ধিতে আবদ্ধ (জিম্মি) অমুসলিমদের হারানো বস্তু তোমাদের জন্য হালাল নয়, তবে যদি মালিক তার দাবী ছেড়ে দেয়। আর যখন কোন লোক কোন সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করে তখন তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। যদি তারা তা না করে, তবে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হলেও তার আতিথ্য পরিমাণ জিনিস আদায় করা জায়েয হবে *(আবুদাউদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩, সনদ ছহীহ)*।

৯- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ.

(৯) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করে দিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তা দিয়ে তো নৌকার প্রলেপ দেওয়া হয় এবং চামড়া তৈলাক্ত করা হয় আর লোকেরা তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে। তিনি বললেন, না, তাও হারাম। তারপর আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইহূদীদেরকে বিনাশ করুন। আল্লাহ যখন তাদের জন্য মৃতের চর্বি হারাম করে দেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে *(বুখারী হা/২২৩৬; মুসলিম হা/৪১৩২; মিশকাত হা/২৭৬৬)*।

১০- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ.

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, কিভাবে সে মাল অর্জন করল; হালাল উপায়ে না-কি হারাম উপায়ে *(বুখারী হা/২০৮৩)*।

১১- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

(১১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরী'আত সম্মত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা (৪) সূদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা নেক্কার নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া *(বুখারী হা/২৭৬৬; মুসলিম হা/২৭২; মিশকাত হা/৫২)*।

১২- عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

(১২) আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক গ্রহণ করা হ'তে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/২২৩৭; মুসলিম হা/৪০৯২; মিশকাত হা/২৭৬৪)*।

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যার উদরে হারাম প্রবিষ্ট হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার ছালাত কবুল করবেন না।

২. ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, হারাম খাদ্য, পানাহার ও পোশাক অশান্তির মূল কারণ।

৩. ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে মুত্তাক্বীদের পরিচয় জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'মুত্তাক্বী সেই ব্যক্তি যে সকল হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে'।

সারবস্তু :

১. দো'আ কবুলের পরিপন্থী বিষয় হ'ল হারাম ভক্ষণ করা।

২. হারাম ভক্ষণ করলে সৎ আমল ও পবিত্র কথা নষ্ট হয়ে যায়।

৩. এটি দ্বীন ও বিশ্বাসের দুর্বলতার প্রকৃষ্ট উপায়।

৪. শরীর ও বুদ্ধির ধ্বংস সাধনকারী হ'ল হারাম ভক্ষণ করা।

৫. হারাম খাদ্য ভক্ষণকারী জাহান্নাম ও আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ।

নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি

-অনুবাদক : আবু সাঈদ

*[**লেখক পরিচিতি :** উক্ত প্রবন্ধের মূল রচয়িতা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তুওয়ায়জিরী। তিনি ১৩৭১ হিজরীতে সঊদী আরবের বুরায়দা নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি বুরায়দা শহরেই লেখাপড়া শুরু করেন। এরপর তিনি 'ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ আল-ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়', রিয়াদ থেকে 'শরী'আ' বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর ১৩৯৫ হিজরীতে তিনি শারঈ বিষয়ে তৎকালীন আলেম শায়খ বিন বায ও ওছায়মীন (রহঃ)-এর নিকট বিদ্যা অর্জন করেন। তিনি দ্বীনী দাওয়াতের জন্য উইরোপ-আমেরিকা ও এশিয়ার অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর লিখিত 'আল্লাহর পথে দাওয়াত' একটি অনুবাদ্য বৃহৎ গ্রন্থ। যার মধ্যে থেকে 'নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি' অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে 'তাওহীদের ডাক'-এর পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হ'ল]*

আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয় দিয়ে নবী ও রাসূলগণকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। যেমন :

(১) আল্লাহ্র দিকে আহ্বান। (২) (মানুষকে) এমন রাস্তা চিনিয়ে পরিচয় দেওয়া, যা তাঁর কাছে পৌঁছে দিবে। (৩) আগমনের পর মানুষের অবস্থার বর্ণনা।

আলোচনার ধারাবাহিকতা :

প্রথমতঃ তাওহীদ ও ঈমানের বর্ণনা। দ্বিতীয়তঃ বিধি-বিধান সম্পর্কে। তৃতীয়তঃ ক্বিয়ামত দিবসের বর্ণনা, যেখানে রয়েছে প্রতিদান, শাস্তি, জান্নাত ও জাহান্নাম।

অতঃপর আল্লাহ্র দিকে আহ্বান এমন হবে যে, মানুষ জানতে পারবে আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর গুণবাচক নামসমূহ, কার্যাবলী, বড়ত্ব ও মহত্ত্ব, সৃষ্টি জীবের প্রতি তাঁর নে'মত ও অনুগ্রহ সমূহ সম্পর্কে। মানুষ আরো জানতে পারবে যে, তিনি একক ও সৃষ্টি জগতের পরিচালক। তিনি ব্যতীত বাকী সবকিছু মাখলূক্ব। এ জন্য মহান আল্লাহ এককভাবে ইবাদত পাওয়ার হক্বদার।

আর এটিই হচ্ছে দাওয়াতের প্রথম ও সর্বোত্তম স্তর এবং মূলনীতি ও উত্তম ভিত্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হ'তে পারে, যে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম' *(ফুছছিলাত ৪১/৩৩)*।

অতঃপর পরবর্তী দাওয়াত হবে পরকালীন সম্পর্কিত। মানুষকে নছীহত করা, ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও খারাপ কাজের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন, জান্নাতের নে'মতরাজীর সুসংবাদ, জাহান্নামের অধিবাসীদের বর্ণনা, আল্লাহ্র অঙ্গীকার ও শাস্তি এবং অন্যান্য বিষয়াবলী যেগুলো ক্বিয়ামত দিবসে ঘটবে। এরপর দাওয়াত হবে ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কে। যেমন ফযীলত, মাসয়ালা-মাসায়েল, হালাল-হারাম, ওয়াজিব, অধিকার, শিষ্টাচার ও সুন্নাত প্রভৃতি।

মক্কায় দাওয়াত ছিল আল্লাহ, আখেরাত এবং পূর্ববর্তী রাসূলগণ ও তাঁদের উম্মতগণের অবস্থা সম্পর্কে। আর মদীনাতে আল্লাহ তা'আলা দ্বীন ইসলামকে সমস্ত বিধানাবলী দ্বারা পূর্ণ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে এটাকে গ্রহণ করে। যার ফলে কাফের-মুনাফিকরা বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করেন। অতঃপর মানুষ মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ- وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

'যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন; তিনি তো তওবা কবুলকারী' *(নাছর ১১০/১-২)*।

আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য :

আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আদর্শ হচ্ছেন নবী ও রাসূলগণ। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্বাচিত, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, সাধারণভাবে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের পথ অনুসরণ করতে। বিশেষভাবে ইবরাহীম (আঃ)-এর নীতি অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন। আর ইবরাহীম (আঃ) দ্বীনের প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যেমন নফস, ধন-সম্পদ, সময়, শহর, পরিবার-পরিজন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি ত্যাগ করার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর এ কারণে আল্লাহ আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বিষয়াবলী ব্যতীত। তাছাড়া তিনি প্রতিটি মুসলিমের চিন্তা-চেতনা, কথাবার্তা, আমল, আখলাক্বের ক্ষেত্রে একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ- أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ.

(১) 'তাঁদেরকেই আমি গ্রন্থ-শরী'আত ও নবুঅত দান করেছি। অতএব যদি এরা আপনার নবুঅত অস্বীকার করে, তবে এর জন্য এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি যারা এতে

অবিশ্বাসী হবে না। এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি বিশ্ববাসীর জন্য একটি উপদেশ মাত্র' *(আন'আম ৬/৮৯-৯০)*।

(২) অন্যত্র তিনি বলেন,

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(নাহল ১৬/১২৩)*।

(৩) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে লক্ষ্য করে বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে নবীগণের জীবন দর্শন :

নবীগণের কর্মকাণ্ড ও চরিত্র তাঁদের জীবনী থেকে নেয়া হয়েছে। নবীগণ আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। আল্লাহ্‌র পথে তাঁদের পদযুগল ধুলায় ধুসরিত হয়েছে। তাঁরা নিজেদের মাল ও জান আল্লাহ্‌র কালিমা উঁচু করার জন্য ব্যয় করেছেন। তাঁদের কপালের ঘামের বিনিময়ে, পা থেকে ঝরে পড়া রক্তের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র দ্বীন পৃথিবীতে কায়েম করতে প্রচেষ্টা করেছিলেন। আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় নবীগণকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা হিজরত করেছেন, যুদ্ধ করেছেন এবং নিহতও হয়েছেন। যুদ্ধ করতে করতে বহিষ্কৃত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ও ক্ষুধায় কাতর হয়েছেন। অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁদেরকে গালমন্দ করা হয়েছে, অপবাদ ও ভর্ৎসনা দেওয়া হয়েছে। এমনকি তাঁদেরকে প্রহার করা হয়েছে। ইহা সত্ত্বেও তাঁরা দয়াশীল ছিলেন এবং ধৈর্যধারণ করেছেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন। আর তাঁদের দ্বারাই আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে কুফরী ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ 'তোমার পূর্বে বহু নবী ও রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, অতঃপর তারা এই মিথ্যা প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অম্লান বদনে সহ্য করেছেন, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আল্লাহ্‌র আদেশকে পরিবর্তন করার কেউ নেই, রাসূলগণের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো আপনার নিকট এসেছে' *(আন'আম ৬/৩৪)*।

(২) অন্যত্র তিনি বলেন,

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ- لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

'অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলেন এবং লোকে ভাবল যে, রাসূলকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এলো এভাবে, আমি যাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। আর অপরাধী সম্প্রদায় হ'তে আমার শাস্তি রদ করা হয় না। তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। ইহা এমন বাণী, যা মিথ্যা প্রবন্ধ নয়। কিন্তু মুমিনদের জন্য এটা পূর্ব গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত' *(ইউসুফ ১২/১১০-১১১)*।

দাওয়াতের পরে মানুষের অবস্থান :

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের পরে মানুষের অবস্থান দুইভাবে ভাগ হয়ে যায়। (ক) একভাগ ঈমান আনয়ন করে (খ) অন্যভাগ অস্বীকার করে।

অতঃপর যারা ঈমান এনেছে তাদের আল্লাহ দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাদের সাথে মানুষ শত্রুতা পোষণ করেছে এবং কষ্ট দিয়েছে। যাতে সত্যবাদী থেকে মিথ্যাবাদী এবং মুনাফিক থেকে মুমিন পৃথক হয়ে যায়। আর যারা নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনেনি, তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যা ছিল বড় কষ্টকর। সুতরাং প্রত্যেক আত্মাকেই কষ্টের সম্মুখীন হ'তে হবে, চাই সে ঈমান আনয়ন করুক বা কুফরী করুক। মুমিনের কষ্টটা পৃথিবীতে সাময়িক সময়ের জন্য; কিন্তু পৃথিবীতে ও পরকালে শেষ পরিণতির ফল প্রসংশিত। পক্ষান্তরে কাফেরদের ধন-দৌলত প্রাচুর্যতা ও বিলাসিতা ক্ষণস্থায়ী। যা দুনিয়া ও আখেরাতে চিরস্থায়ী কষ্টের কারণ হবে।

(১) আল্লাহ বলেন, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 'বললেই তাদেরকে অব্যহতি দেয়া হবে, অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। আমিতো তাদের পূববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন- কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী' *(আনকাবূত ২৯/৩-২)*।

(২) অন্যত্র তিনি বলেন, لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ- مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ- لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. 'দেশে দেশে কাফেরদের সদস্যের পদচারণা তোমাকে যেন বিভ্রান্ত না করে। সামান্য ভোগ, তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস। আর কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামাগার। কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা তাতে চিরকাল থাকবে। এ হ'ল আল্লাহ্র নিকট হ'তে নাযিলকৃত। আর আল্লাহ্র নিকট যা আছে, তা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য অতি উত্তম' *(আলে ইমরান ৪/১৯৬-১৯৮)*।

(৩) আল্লাহ আরো স্পষ্ট করে বলেন, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 'কাজেই তাদের ধন-সম্পত্তি আর সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে মুগ্ধ না করে। ওসব দিয়েই আল্লাহ দুনিয়াতে ওদেরকে শাস্তি দিতে চান, আর তারা কাফির তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে' *(তওবা ৯/৫৫)*।

নবী-রাসূলগণের আমল ও তাদের অনুসরণ :

ঈমান ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে নবী-রাসূলগণ ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ। তাঁদের চরিত্র-শিষ্টাচার ছিল সুন্দর। তাঁদের কথাবার্তা ও আমল ছিল সর্বোত্তম। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে দু'টি জিনিস প্রদান করেছেন। (ক) ঈমান (খ) সৎ-আমল। আর তিনি তাঁদেরকে এগুলো মানুষদের মাঝে প্রচার করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ এই উম্মতকে তাই নির্দেশ দিয়েছেন, যা তিনি নবী-রাসূলকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। উক্ত কাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের অনুসারীগণ উত্তম চরিত্র নিয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন। তাঁরা মানুষের জন্য তাওহীদ, ঈমান ও সৎ আমল বহন করেন এবং তাঁদেরকে সেদিকে আহ্বান করেন। তাঁদের নিকট সব ক্ষেত্রে প্রিয় বিষয় ছিল আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, সৎ আমল ও উত্তম চরিত্র। তাঁদের প্রবল ইচ্ছা ছিল প্রতিপালকের দর্শন করে তাঁরা সন্তুষ্টি অর্জন করবে ও জান্নাতের নে'মত ও বালাখানার জন্য। তাঁরা সত্যায়ন করেছেন, জিহাদ করেছেন, বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন ও ধৈর্যধারণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁরাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর এ পদ্ধতিগুলো তাঁরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ছিলেন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁদের মূলনীতি এ রকম, যেগুলো দ্বারা তাঁরা আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করতেন। যাতে প্রত্যেক দাঈ এ মূলনীতি গুলো অনুসরণ করতে পারে।

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি :

মূলনীতি-১ : দাওয়াত হবে তাওহীদ, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা এবং সেই সত্তার ইবাদতের প্রতি, যিনি একক ও যার কোন শরীক নেই।

(এক) আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ 'আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাকে এই আদেশ প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২১/২৫)*।

(দুই) তিনি অন্যত্র বলেন, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- اللَّهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ 'বলুন! তিনি আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি' *(ইখলাছ ১১২/১-৩)*।

(তিন) আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তারা যেন বলে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন এবং কিছু সংখ্যককের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়েছিল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে' *(নাহল ১৬/৩৬)*।

মূলনীতি-২ : আল্লাহ্র দ্বীনকে মানুষের নিকটে পৌঁছে দেওয়া ও তাদেরকে উপদেশ দেওয়া।

(এক) আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 'সেই নবীগণ আল্লাহ্র বাণী প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্মাদ তোমাদেরকে কোন ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নবী; আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন' *(আহযাব ৩৩/৩৯-৪০)*।

(দুই) নূহ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 'তোমাদেরকে প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি যেগুলো তোমরা জান না' *(আ'রাফ ৭/৬২)*।

(তিন) মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. ‘হে রাসূল! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে আপনি তাঁর বাণী কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না’ *(মায়েদা ৫/৬৭)*।

মূলনীতি-৩ : মানুষের বাড়ীতে, মহল্লায়, বাজারে ও শহরে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া।

(এক) আল্লাহ মুসা (আঃ)-কে বলেছেন, اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي- اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى- فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. ‘তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শিথিলতা করো না। তোমরা উভয় ফেরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অতঃপর তোমরা তাকে নম্রভাবে কথা বল, হয়তো সে চিন্তা ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে’ *(ত্বহা ২০/৪২-৪৪)*।

(দুই) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ- اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ- وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ‘শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাঁদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না অথবা তাঁরা সুপথপ্রাপ্ত। আমার কি হ’ল যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করব না’ *(ইয়াসীন ৩৬/২০-২২)*।

(তিন) নবী করীম (ছাঃ) মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের বাড়ী যেতেন, তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করতেন, নিজেকে গোত্রের নিকট সমর্পণ করতেন এবং বলতেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا ‘হে লোক সকল! তোমরা লা-ইলাহা ইলাল্লাহ বল, তাহ’লে সফলকাম হবে’।[১]

(চার) ওসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) সা‘আদ বিন ওবাদাহ (রাঃ)-কে সেবা করতে গেলেন। এমতাবস্তায় তিনি একটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যাতে মুসলিম-মুশরিক-মূর্তিপূজক ও ইহুদীরা মিশ্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাদের সালাম দিলেন। অতঃপর তিনি বাহন থেকে নামলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করলেন ও কুরআন পড়ে শুনালেন।[২]

১. মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৬৫৪; দারাকুৎনী হা/৩০২০, সনদ ছহীহ।

২. বুখারী হা/ ৫৬৬৩; মুসলিম হা/১৭৯৮।

মূলনীতি-৪ : সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রসংশা, যিকির ও তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(এক) ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ- رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ছালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন। যেদিন হিসাব কায়েম হবে’ *(ইবরাহীম-১৪/৪০-৪১)*।

(দুই) আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সব সময় আল্লাহ্র যিকির করতেন।[৩]

(তিন) আগার আল-মুযানি (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম বলেছেন, আমি দিনে একশ’ বার আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি’।[৪]

মূলনীতি-৫ : বিধর্মী রাষ্ট্রে পত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়া।

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) পত্রের মাধ্যমে কায়ছার, কিসরা নাজ্জাশী ও প্রতাপশালী শাসকদের নিকট আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করেছেন।[৫]

মূলনীতি-৬ : মুশরিকদের হেদায়াতের জন্য প্রার্থনা করা।

(এক) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ‘আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। আপনার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপদগামী হয়। সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত’ *(নাহল ১৬/১২৫)*।

(দুই) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তুফায়েল ও তার এক সাথী আসলেন এবং বললেন, يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! দাউস গোত্র দ্বীন গ্রহণে অস্বীকার করছে, আপনি তাদের উপর বদ দো‘আ করুন, অথবা তাঁকে বলা হয়েছিল, দাউস গোত্র ধ্বংস হয়েছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি দাউস গোত্রকে হেদায়াত দাও এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আস’।[৬] *(চলবে)*

[অনুবাদক : ২য় বর্ষ, আল-হাদীছ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

৩. মুসলিম হা/৩৭৩।

৪. মুসলিম হা/২৭০২।

৫. মুসলিম হা/১৭৭৪।

৬. বুখারী হা/২৯৩৭; মুসলিম হা/২৫২৪।

সাংগঠনিক মযবুতির উপায়

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন

ভূমিকা :

‘সংগঠন’ শব্দের সাধারণ অর্থ সংঘবদ্ধকরণ। বিশেষ অর্থ দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীবন। নির্ভেজাল তাওহীদ ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার কাজে আঞ্জাম দেয় যে সংগঠন তাকেই বলা হয় নির্ভেজাল ইসলামী সংগঠন। উক্ত সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নির্ভেজাল তাওহীদ ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য যরূরী কর্তব্য। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র প্রেরিত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হ’তে পারে না। আর সংগঠিত উদ্যোগ ছাড়াও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। এ মর্মে আল্লাহ্‌র ঘোষণা,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

‘তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রশি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, আর দলে দলে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। স্মরণ কর তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তারপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি ঘটালেন, কাজেই তাঁর অনুগ্রহে তোমরা হ’লে ভাই-ভাই। আর তোমরা ছিলে এক আগুনের গর্তের কিনারে, তারপর তিনি তোমাদের তা থেকে বাঁচালেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশাবলী সুস্পষ্ট করেন, যেন তোমরা পথের দিশা পাও’ *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা‘আতবদ্ধ জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ ‘আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। জামা‘আতবদ্ধ জীবন-যাপন, নেতার আদেশ শ্রবণ, নেতার আনুগত্য, হিজরত এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা’।[৭]

অতএব নির্ভেজাল ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কোন শখের ব্যাপার নয়। নির্ভেজাল ইসলামী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অন্যদিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন। নিম্নে ‘সাংগঠনিক মযবুতির উপায়’ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হ’ল :

গঠনতন্ত্র :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গঠনতন্ত্র রচনা করা এবং গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন জনশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার সর্বাত্মক প্রচষ্টা অব্যাহত রাখা। কেন্দ্র থেকে শাখা পর্যন্ত প্রত্যেক সেক্টরে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যাবলী পরিচালনা একান্ত যরূরী। তাছাড়া এটি গঠনতন্ত্র অনুসরণেরও মৌলিক অনুষঙ্গ।

যোগ্য নেতৃত্ব :

নেতৃত্ব হ’ল এমন একটা প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির নির্দেশনা, পরামর্শ, মেধা, ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে কোন জনগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে। এটা একটা সামাজিক প্রক্রিয়া, যার দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রখ্যাত গবেষক কার্টার বলেন, Leadership is the process of influencing the activities of an organised group to wards goal setting and goal achievement.

সুধী পাঠক! যোগ্য নেতৃত্বের ফলে একটি সংগঠন অতিদ্রুত উন্নতি লাভ করে। আবার অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে সংগঠন ধ্বংস হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রকার গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নেতার যোগ্যতা নিরূপিত হয়। সংগঠনের মধ্যে যিনি যতবেশী গুণ সম্পন্ন, তিনি ততবেশী যোগ্য হিসাবে কর্মীদের নিকটে গ্রহণীয় ও অনুসরণীয়। উল্লেখ্য যে, একটি সংগঠনের মযবুতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে যোগ্য নেতৃত্বের ধারাবাহিকতার উপর।

ইসলামী সংগঠনে নেতার আনুগত্য :

নেতার আনুগত্য ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ওপর অবশ্যই কর্তব্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ.

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে উলুল আমর তার আনুগত্য কর’ *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى.

‘যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করল সে আল্লাহকেই অমান্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে

৭. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪, সনদ ছহীহ।

আমারই আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হ'ল সে আমারই অবাধ্য হ'ল'।[৮]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ 'তোমরা শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কোন হাবশী গোলামকেও নেতা নিয়োগ করা হয় এবং তার মাথা দেখতে আঙ্গুরের মত হয়'।[৯]

একটি উত্তম সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হ'ল, সংগঠনের সকল স্তরের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া। যে সংগঠনে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য যত বেশী, সে সংগঠন তত বেশী মযবুত ও গতিশীল।

নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী :

সাধারণতঃ কোন ইমারত তৈরীর জন্য সর্বপ্রথম একটি বিশেষ কাঠামো এবং নির্দিষ্ট মাপে ইট তৈরী করা হয়। তারপর এটা শুকানো হয় এবং সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়। এরপরই শুরু হয় তাকে আগুন দিয়ে পোড়ানোর পালা। যাতে করে ইটের কঠিনতা ও মযবুতি বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে এ অগ্নিদগ্ধ মযবুত ইটের দ্বারাই অট্টালিকা তৈরী হয়।

যোগ্য নেতার হাতে সংগঠনের দায়িত্ব অর্পিত হ'লেও যদি নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মীবাহিনী না থাকে, তাহ'লে সংগঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে হয়। সেজন্য একদল কর্মীবাহিনী একটি সংগঠনের অন্যতম ভিত্তি বললেও অত্যুক্তি হবে না। যদি একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ ড্রাইভারের সাথে কিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হেলপার না থাকে, তাহ'লে একজন ড্রাইভার যেমন একটি গাড়ী নিরাপদে ও সুন্দরভাবে গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে না। তেমনিভাবে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী ব্যতীত একজন নেতার মাধ্যমে কোন সংগঠনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। যেমনি কাঁচা ইট দ্বারা অট্টালিকার আশা করা যায় না। তাই সংগঠনের মযবুতি নির্ভর করে জ্ঞানী, পরিশ্রমী, দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ত্যাগী এবং অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ একদল নিবেদীতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর উপর।

নেতা ও কর্মীর সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ :

নেতা ও কর্মীর সম্পর্ক হবে সু-মধুর ও টেকসই একটি পরিবারের মত। সেখানে থাকবে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা ও ভক্তি। জুনিয়র কর্মী সিনিয়র কর্মীদের প্রতি হবে শ্রদ্ধাশীল। আবার সিনিয়র কর্মী বা দায়িত্বশীল নেতা জুনিয়র কর্মীদের প্রতি হবেন স্নেহপরায়ণ এবং তাদের হক্ব আদায়ে হবেন সর্বদা সচেতন। এভাবে নেতা ও কর্মীদের মাঝে অবিচ্ছেদ্য দেহের ন্যায় সম্পর্ক এবং পরিবেশ তৈরী হ'লে সংগঠনের মযবুতিতে ইস্পাত সদৃশ ভূমিকা পালন করবে।

৮. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/৪৮৫২; মিশকাত হা/৩৬৬১।
৯. বুখারী হা/৭১৪২; মিশকাত হা/৩৬৬৩।

মজলিসে শূরা পরিষদ :

الشورى শব্দটি আরবী। আভিধানিক অর্থ কোন বিষয়ে পরামর্শ করা, অনুসন্ধান করা, পরস্পর পরামর্শ করা, উপদেশ, পরামর্শ পরিষদ প্রভৃতি।[১০] ইসলামী সংগঠনের প্রাণ হ'ল পরামর্শ পরিষদ। সংগঠন পরিচালনায় মজলিসে শূরার সদস্যগণ আমীর বা নেতাকে পরামর্শ দিবেন। তবে শূরা সদস্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, তাক্বওয়া, যোগ্যতা, দ্বীন ও আমানতদারিতা হ'ল মজলিসে শূরা সদস্যগণের মূল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী। আমীর তার রাষ্ট্রীয় বা সাংগঠনিক বিষয়ে সর্বদা মজলিসে শূরার পরামর্শ নিবেন।

এটা মহান আল্লাহ্র হুকুম এবং বৈষয়িক বিষয় সমূহের ইসলামের বুনিয়াদী মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

'আল্লাহ্র করুণার ফলেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলেন। আপনি যদি রুক্ষ ও কঠোর-হৃদয় হতেন তবে নিঃসন্দেহ তারা আপনার চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। অতএব তাদের অপরাধ মার্জনা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কাজকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন সংকল্প গ্রহণ করবেন তখন আল্লাহ্র উপরে নির্ভর করুন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ভালবাসেন তাঁর উপর নির্ভরশীলদের' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 'যারা তাদের প্রভুর প্রতি সাড়া দেয় এবং ছালাত আদায় করে, তাদের কাজকর্ম হয় নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে। আমরা তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে থাকে' *(শূরা ৪২/৩৮)*।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

জাতি আজ মৌলিক শিক্ষা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। এমনকি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র শিক্ষা থেকে অধিকাংশ জনশক্তি মুক্ত। সরকার কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতিতেও ৯৫% মানুষের ৮ম শ্রেণীর পর মৃত্যু পর্যন্ত কুরআন-সুন্নাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কোন সুযোগই নেই। যতটুকু আছে তাও বস্তুবাদী ও নির্দিষ্ট মাযহাবী চিন্তা-চেতনায় ভরপুর। যে জনশক্তি দ্বারা নির্ভেজাল তাওহীদকে এ মানচিত্রে প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে সে জনশক্তি যদি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ থেকে পুরাটা অন্ধকারে থাকে তাহ'লে সে শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলিমদের কোন উপকারে আসতে পারে না। তাই জাতিকে অহি-র আলো দেখানোর জন্য এবং একটি সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো সময়ের দাবী।

১০. মু'জামুল ওয়াসীত্ব ১/৪৯৯ পৃঃ ।

Contents

সাহিত্য ভাণ্ডার :

একটি সংগঠনের মযবুতি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে রচিত সাহিত্য ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করে। কারণ চলমান আধুনিক বস্তুবাদী সাহিত্য জাতিকে পথভ্রষ্ট করছে। অথচ কুরআন-সুন্নাহ থেকে মুক্ত চিন্তা-চেতনা ভিত্তিক রচিত গ্রন্থমালা শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকে শয়তানের পথে পরিচালিত করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। তাই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বইপত্রসহ মানুষের আক্বীদা ও আমল বিশুদ্ধ রাখতে নির্ভেজাল ইসলামী সাহিত্য রচনা ও প্রকাশ করা অতীব যরূরী।

বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন :

একটি সংগঠনকে কার্যকরী সংগঠনে পরিণত করতে হ'লে প্রয়োজন যুগোপযোগী বাস্তব ভিত্তিক কর্মসূচী নির্ধারণ করা। বাস্তবতার আলোকে সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূলনীতির দিকে খেয়াল রেখে সেগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন করা। এ পর্যায়ে সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা নির্ধারণ করা। সংগঠনের প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী কর্মসূচী ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তাই কর্মসূচী বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যরূরী। ফলে সংগঠনের সর্বস্তরের কর্মীরা সংগঠনের কর্মসূচীর আলোকে নিজ নিজ কার্য সম্পাদনে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে। সংগঠনের কার্যাবলী যত বেশী বাস্তবায়িত হবে, তত বেশী মযবুতি অর্জন করবে।

অফিস নিয়ন্ত্রণ করা :

কোন সংগঠন/প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের মধ্যে অফিস হ'ল অন্যতম। অফিসে সংগঠনের প্রয়োজনীয় রেজিস্টার, ফাইলপত্র, কাগজপত্র সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিস সহকারী নিয়োগ দেওয়া। আর সংগঠনের প্রাণ হ'ল অফিস ও অফিসের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। অফিসের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যদি নেতার অনুগত, আমানতদার না হয়, তাহ'লে সংগঠন যে কোন মুহূর্তে হোঁচট খেতে পারে। তাই সর্বস্তরে সংগঠনের মযবুতির জন্য অফিসকে কার্যকরী করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নিয়োজিত অফিস সহকারীদের আচার-আচরণ, চাল-চলন, দৃষ্টি-ভঙ্গির দিকে লক্ষ্য রাখা সাংগঠনিক মযবুতির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

বায়তুল মালের সমৃদ্ধি :

রক্তছাড়া যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না, তেমনি অর্থ ছাড়া দ্বীনী সংগঠন চলতে পারে না। সংগঠনের আর্থিক অবস্থা যত শক্তিশালী হবে সংগঠনের মযবুতি ততবেশী বৃদ্ধি পাবে। আর ইসলামী সংগঠনে আয়ের প্রধান উৎসসমূহ হচ্ছে- যাকাত, ফিৎরা, ওশর, কুরবানীকৃত পশুর চামড়া বিক্রয়ের অর্থ, দায়িত্বশীল কর্মী ও সুধীজনদের ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে অর্থ দান প্রভৃতি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুমিনগণ যেন তাদের অর্থ-সম্পদ অকাতরে দান করে, তার নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

'হে ঈমানদারগণ! আমরা তোমাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ কর, সেই দিন আসবার আগে যে দিন দরদস্তুর করা চলবে না, বন্ধুত্ব থাকবে না এবং সুপারিশ টিকবে না। যারা অবিশ্বাসী তারাই যালেম' *(বাক্বারাহ ২/২৫৪)*।

নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব :

পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী হওয়ার জন্য নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা একান্ত যরূরী। আমরা সবাই ইসলামী আন্দোলনের পথ একযোগে অতিক্রম করে চলছি। আমাদের মধ্যকার যোগাযোগ ও সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য এমন নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব তৈরী করা দরকার, যেমনটি তৈরী করেছিলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে। যার ফলে তারা ভালবাসা ও ত্যাগের অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ইসলামী আন্দোলনের পথে অপর এক ভাইয়ের হাতকে এমন মুষ্টি দিয়ে শক্তিশালী করে তোলা, যার মধ্যে রয়েছে ভালবাসা, ত্যাগের যোগ্যতা, দয়া ও করুণা। কিন্তু সে মুষ্টি এমন শক্তিশালী হবে, যা প্রচণ্ড কম্পন, কঠিন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা-বিপর্যয় এবং কঠিন পরীক্ষার সময়েও অটল থাকবে। এ শিক্ষার দিকে প্রিয় নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِى تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তুমি ঈমানদারদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন সমস্ত শরীর তজ্জন্য বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।[১১]

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না। যে

১১. বুখারী হা/৬০১১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫৩।

ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাবে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদ সমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন।[১২]

অতএব স্রেফ দ্বীনী স্বার্থে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য লৌকিকতা পরিহার করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন যত দৃঢ় হবে সাংগঠনিক মযবুতি তত বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

মুখোশ-পরা দুশমনদের থেকে সতর্কতা :

ইসলামী আন্দোলন যখন শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং যখন বাহির থেকে আক্রমণ চালিয়ে তাকে স্তব্ধ করা যায় না, তখন ইসলামের দুশমনরা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। ভিতর থেকে সংগঠনকে আঘাত হানার জন্য তাদের কিছু সংখ্যক লোক সংগঠনে ঢুকে পড়ে এবং ক্ষতিকর তৎপরতা চালানোর জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এই ক্ষতিকর তৎপরতার প্রধান ধরণ হচ্ছে ইসলামী সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চরিত্র হনন। সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি কর্মীগণ গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করে থাকে। এই ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের কারণেই ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য হয় স্বতঃস্ফূর্ত ও অখণ্ড। আনুগত্য সাংগঠনিক শৃঙ্খলার প্রধান উপকরণ। তাই ইসলামী সংগঠনের সংহতি বিনাশ করতে হ'লে এই স্বতঃস্ফূর্ত ও অখণ্ড আনুগত্যের ভিত্তিতে আঘাত হানতে হয়।

এই আঘাত হানার জন্য প্রয়োজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সততা ও যোগ্যতা সম্পর্কে কর্মী ও জনসাধারণের মাঝে সংশয় সৃষ্টি করা। এই সংশয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ছোটখাটো মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে কর্মী বাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। এতে সফলতা অর্জন করার সম্ভাবনা দেখা না দিলে মিথ্যা কল্প-কাহিনী রচনা ও রটনা করে নেতৃত্বের সততা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো হয়।

সংগঠনে অনুপ্রবেশ করে খাপটি মেরে বসে থেকে ইসলামের মুখোশপরা দুশমনরা এই কাজই করতে থাকে। খোদ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক পরিচালিত সংগঠন এই আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে বারবার। দুশমনরা বুঝেছিল আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের চরিত্র হনন করতে না পারলে এই আন্দোলন কিছুতেই বিনাশ করা যাবে না। তাই তারা রাসূলের ওপরও নৈতিক আক্রমণ চালাতে কুণ্ঠিত হয়নি।

আল্লাহ্র রাসূলের সঙ্গে যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর বিয়েকে কেন্দ্র করে মুনাফিকরা একটা ইস্যু বানিয়েছিল। অন্যদিকে বনু মুস্তালিক যুদ্ধের পর একরাতে আয়শা (রাঃ) পিছনে পড়ে যাওয়া এবং এক ছাহাবীর সাথে মদীনায় ফিরে আসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের অপপ্রচার মিথ্যা ইস্যু তৈরী করে, যে অপপ্রচার মুসলিম মিল্লাতের সংহতির প্রতি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুধী পাঠক! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অহি অবতীর্ণ করে এই ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ না করলে সেদিন মদীনায় গড়ে ওঠা নতুন ইসলামী শক্তির কী দুর্দশা হত তা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। মনে রাখা দরকার যে, মুখোশপরা দুশমন হক্বপন্থী সংগঠনকে সর্বাধিক টার্গেট করে থাকে। অতএব এব্যাপারে সংগঠনের উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ সহ সকল স্তরের নেতা ও কর্মী বাহিনীকে সজাগ থাকতে হবে এবং সনাক্ত করে সে ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দৃঢ়তার ওপরই সংগঠনের মযবুত :

একথা সত্য যে, যে ব্যক্তি অকথ্য যুলুম ও নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে এবং অন্তর আল্লাহকে অস্বীকার করতে সম্মত হয়নি, বরং অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি নিশ্চিতভাবে ঈমান রয়েছে, এমন ব্যক্তির মৌখিক কুফরী কথাকে (শুধু নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মুখে মুখে আল্লাহকে অস্বীকার করা) ওযর হিসাবে আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। এ ওযর গ্রহণ বস্তুত আপন বান্দাগণের প্রতি আল্লাহ্র বিরাট করুণা। আর এ করুণা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সীমিত শক্তি ও সামর্থ্যের কথা জানেন। আল্লাহ বলেন,

مَن كَفَرَ بِاللَّه من بَعْد إِيمَانه إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَان وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

'যে ব্যক্তি ঈমান লাভের পর বাধ্য হয়ে কুফরী করে, অথচ তার অন্তর ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও অবিচল থাকে তবে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি মনের সন্তোষ সহকারে কুফরী কবুল করে নিল তার উপর রয়েছে আল্লাহ্র গযব। এসব লোকদের জন্য ভীষণ আযাব রয়েছে' *(নাহল ১৬/১০৬)*।

কুফরীর মুকাবিলায় দৃঢ় ঈমানের সাথে নিজের জীবনকে আল্লাহ্র পথে কুরবানী করাই উত্তম। প্রকৃত আন্দোলন সুবিধা গ্রহণকারীদের ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। বরং সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে দৃঢ়তা এবং স্থির মনোবল পোষণকারীদেরকে ভিত্তি করে। এ কারণেই আন্দোলনে আল্লাহ্র রাসূলের চিরাচরিত নীতি হ'ল, কর্মীদেরকে যাঁচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অগ্রসর করা। তাই আমরা দেখতে পাই যে, রাসূল (ছাঃ) সুযোগ গ্রহণের উপদেশ দেননি, যাতে করে কুরাইশদের যুলুম-অত্যাচার থেকে নব মুসলিমরা বেঁচে থাকতে পারে। বরং তাদের প্রতি তার অপরিসীম সহানুভূতি থাকার পরও ছবর, দৃঢ়তা এবং নির্যাতন সহ্য করার উপদেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে আল্লাহ্র সাহায্য এবং জান্নাত প্রদানের শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

১২. বুখারী হা/২৪৪২; তিরমিযী হা/১৪২৬; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫৮।

Contents

মুসলিমদের সাথে এ ভূমিকা পালন করা ছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য আর কোন পথ খোলা ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অহি নাযিল হ'ল,

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ.

'অবস্থা যাই হোক না কেন আপনি এ কিতাবকে মযবুত করে ধরে রাখেন, যা অহি-র মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। আপনি নিঃসন্দেহে সঠিক পথের পথিক। প্রকৃত কথা এই যে, এ কিতাব আপনার জন্য এবং আপনার জাতির জন্য বিরাট মর্যাদার বিষয়। আর অতি শীঘ্রই আপনাদেরক জবাবদিহি করতে হবে' *(যুখরুফ ৪৩/৪৩-৪৪)*।

ইসলামী সংগঠনে অগ্নি পরীক্ষা আল্লাহ্‌র চিরাচরিত নীতি :

ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে আল্লাহ্‌র নীতি হ'ল এই যে, মুমিনরা এবং সংগঠনের কর্মীরা যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হবেই। এমনকি কোন কোন সময় অগ্নি পরীক্ষার তীব্রতা এতই বৃদ্ধি পাবে যে, এ পরীক্ষার কথা শুনলে মনে ও দেহে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। অতএব মুখের কথার নাম ঈমান নয়। অথবা কতগুলো নিছক আলামতের নামও ঈমান নয়। কিংবা কতগুলো বাহ্যিক দৃশ্য আর গগনভেদী শ্লোগানের নাম ঈমান নয়। বরং ঈমানের জন্য অপরিহার্য বিষয় হ'ল অগ্নিপরীক্ষা এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া। অতঃপর সাফল্যের সাথে এসব অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করা ছাড়া আল্লাহ্‌র সাহায্য আসতে পারে না। আল-কুরআনে এ চিরন্তন নীতির স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.

'মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি এই কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? আমি তো পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী' *(আনকাবূত ২৯/২-৩)*।

পথের বক্রতা থেকে সাবধান :

হক্ব আন্দোলনের পথ-ঘাট খুবই স্পষ্ট। এর উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সহজ ও সরল। তবে এ পথের যাত্রীকে এমন কতগুলো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হ'তে হবে, যা তাকে আন্দোলনের সঠিক পথ থেকে ছিটকে ফেলে দিতে পারে। আন্দোলনের পথে এমনটি ঘটার অর্থ এই নয় যে, সে আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করেছে অথবা তার নিয়তকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। বরং প্রকৃত ঘটনা এর বিপরীত কারণেও হ'তে পারে। এ ধরণের বক্রতা বা প্রতিবন্ধকতায় যে পদস্খলন হয়ে থাকে তার জন্য দায়ী হ'ল কাজের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ এবং ঝোঁক প্রবণতা।

যাত্রাপথের এ বিন্দু থেকেই অভিজ্ঞতা আর অনুশীলনের মাধ্যমে আজকের চক্ষুষ্মান মুসলিম যুবকদের দ্রুত চক্ষু খুলে দিতে চায়। এটা হবে তাদের প্রতি সহানুভূতি। যার ফলে তারা অজ্ঞতাবশতঃ পথের কোন পিচ্ছিল জায়গায় হোঁচট খাবে না। স্থিতিশীলতার পর তাদের পদচ্যুতি ঘটবে না। দুর্বোধ্য হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে। ঔষধের চেয়ে সংযমের নীতি অপেক্ষাকৃত ভাল। এটা তারা উপলব্ধি করতে পারবে। আল্লাহ্‌র ঘোষণা,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

'আমার এ পথ খুবই সোজা। অতএব এ পথের অনুসরণ কর। অনেক পথ অবলম্বন কর না, তাহ'লে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র উপদেশ, যাতে করে তোমরা সংযমী হতে পার' *(আন'আম ৬/১৫৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

'(হে রাসুল!) আপনি বলুন যে, এটাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

দাঈ ও মানুষের মাঝে দূরত্বর প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা :

ইসলামী সংগঠনে অনেক দাঈ থাকে। যাদের মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করানো হয়ে থাকে বা করে থাকেন। সেক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হ'ল, আমাদের অনেক দাঈভাই কোন সম্প্রদায়কে খারাপ কাজে লিপ্ত দেখে আবেগ তাড়িত হয়ে ঘৃণাবশত তাদের কাছে যেতে ও উপদেশ দিতে চান। এমন নীতি পরিহার করে তাদের কাছে যাওয়া, দাওয়াত দেওয়া, উৎসাহ যোগানো এবং জাহান্নামের ভয় দেখানো একান্ত যরূরী। যারা ইতিহাস অধ্যয়ন করেন তারা জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জের মওসুমে মীনায় অবস্থানের দিগুলোতে মুশরিকদের আবাসস্থলে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকতেন। তার থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِى إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشاً قَدْ مَنَعُونِى أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ

'এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে যাবে। যাতে আমি (তাদের কাছে) আমার প্রভুর বাণী পৌঁছিয়ে দিতে পারি। কেননা কুরাইশরা আমার প্রভুর বাণী (মানুষের কাছে) পৌঁছিয়ে দিতে বাধা দিয়েছে'।[১৩]

---

১৩. মুসনাদে আহমাদ হা/১৫২২৯, ৩/৩৯০; হাকিম হা/৪২২০; দারেমী হা/৩৩৫৪, সনদ ছহীহ।

ফেৎনা-ফাসাদের আধিক্য দেখে নিরাশ না হওয়া :

মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে ফেৎনা-ফাসাদের আধিক্য এবং হক্বের-প্রতিরোধকারীদের দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখে সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী হক্ব বা সত্যের স্বরূপ হচ্ছে,

الحق منصور وممتحن فلا * تعب فهذه سنة الرحمن

'হক্ব বিজিত ও পরীক্ষিত হবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে? কারণ এটাই তো আল্লাহ্র রীতি'। মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا.

'এভাবে অপরাধীদেরকে আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/৩১)*।

অপরাধীরা মানুষকে পথভ্রষ্ট, হক্বকে অকার্যকর এবং মানুষকে নিশ্চুপ করে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন নবীদের শত্রুদের মধ্যে যে রাসূল (ছাঃ)-কে পথভ্রষ্ট করতে এবং বাধা দিতে চায় তার ক্ষেত্রে তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট। কাজেই আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়; বরং অপেক্ষা করা ও আশান্বিত হওয়া দরকার। অচিরেই মুত্তাক্বীদের জন্য শুভ পরিণতি নির্ধারিত হবেই হবে ইনশাআল্লাহ।

শাসক-গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা :

শাসক-গোষ্ঠী তথা রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক, মন্ত্রণালয়ের লোকজন ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা উচিত। তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করা এবং একথা মনে করা ঠিক নয় যে, আমরা এক গ্রহের বাসিন্দা আর তারা অন্য গ্রহের বাসিন্দা। যখন আমাদের মনে এ চিন্তা ভর করবে তখন সংস্কার হবে দুঃসাধ্য। তাই হক্বের বিজয় দোরগোড়ায় পৌঁছার জন্য আমাদেরকে বিনয়ী হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ 'যে কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হবে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন'।[14] শাসকগোষ্ঠী বিচারক ও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ লোকদের সাথে যখন আমাদের যোগাযোগ থাকবে এবং আমাদেরও তাদের মাঝে চমৎকার বোঝাপড়া সৃষ্টি হবে, তখন ফলাফল ভাল হবে ইনশাআল্লাহ। সংগঠনের মযবুতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পাবে।

উপসংহার :

পরিশেষে বলতে চাই, সংগঠনের মযবুতিতে কর্মীদের নিরলস ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টাসহ প্রয়োজন সময়ের। কাঙ্খিত মানের কর্মীবাহিনী গঠন এবং কর্ম দেশের জনগণের মনে ইসলামী-বিধান গ্রহণের মন-মানসিকতা গঠনের জন্য ব্যাপক সময়ের প্রয়োজন। তড়িঘড়ি করে মনযিলে মাক্বছূদে পৌঁছে যাওয়া হক্ব সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ 'এমন এক কৃষি, যা অঙ্কুর বের করল, অতঃপর শক্তি সঞ্চয় করল। তারপর মোটা-তাজা হ'ল এবং অবশেষে নিজ কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে গেল' *(ফাতহ ৪৮/২৯)*।

অতএব আসুন! সাংগঠনিক মযবুতির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সংগঠনের প্রত্যেকটি সেক্টরের কাজকে গতিশীল করি। যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও সার্বিক কুসংস্কার হটিয়ে দিয়ে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করি। হে আল্লাহ! আমাদের এ মনোবাসনা কবুল করুন এবং সংগঠনের মযবুতিতে আপনার সাহায্য অবতীর্ণ করুন-আমীন!!

[লেখক : সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, যশোর সাংগঠনিক যেলা ও অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর]

'আহলেহাদীছ' সম্পর্কে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর অভিমত

'আহলেহাদীছগণ (আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের সাথে একত্রিত করুন!) হলেন তাঁরাই, যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির রায়কে প্রাধান্য দেন না, যত বড়ই তিনি হউন না কেন। তারা তাদের বিরোধী, যারা হাদীছ ও তার প্রতি আমলের তোয়াক্কা করে না, তারা যেমন কেবল তাদের ইমামদের রায়কে প্রাধান্য দেয় অথচ তাদের ইমামগণ এ থেকে নিষেধ করে গেছেন, তেমনি আহলেহাদীছগণ একমাত্র তাদের নবীর কথাকে প্রধান্য দেন'।

অতঃপর তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলেন, 'এই বর্ণনার পর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, আহলেহাদীছরাই সেই বিজয়ী কাফেলা এবং নাজাতপ্রাপ্ত দল; বরং মধ্যমপন্থী উম্মত, যারা মানবজাতির উপর হবে সাক্ষী স্বরূপ' *(সিলসিলা ছহীহাহ ১/৪৮২ পৃঃ, হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা)*।

আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ। -*যুবসংঘ*

১৪. মুসনাদে আহমাদ হা/১১৭৪২; মিশকাত হা/৫১১৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩২৮; ছহীহুল জামে' হা/৬১৬২, সনদ ছহীহ।

Contents

আদর্শ সমাজ গঠনে লুক্বমান হাকীমের উপদেশ

-বযলুর রহমান

ভূমিকা :

একটি পরিবার ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির মৌলিক উপাদান হল সুশিক্ষা, সচ্চরিত্র ও সার্বজনীন উন্নত আদর্শ। যে আদর্শ হবে কল্যাণকর ও হিতকার। পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র কল্যাণকামী আদর্শ হ'ল ইসলামী আদর্শ। যেখানে বর্ণ-ভাষা-গোত্র-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের ও সকল বিষয়ে হেদায়াত মওজুদ রয়েছে। শৈশবকালে যে আদর্শ অনুযায়ী একটি শিশুকে গড়ে তোলা হয় মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে ঐ আদর্শের অনুসারী হয়। এই জন্য বর্তমানে ভঙ্গুর পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করতে ইসলামী আদর্শের বিকল্প নেই। যেভাবে লুক্বমান হাকীম তাঁর ছোট্ট সন্তানকে আদর্শ শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই শিক্ষা পদ্ধতি মহান আল্লাহ্র পসন্দ হওয়ায় পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। যাতে বিশ্ববাসী তাদের পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত ও সুসংহত করতে পারে। লুক্বমান হাকীমের সেই শিক্ষানীতিই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

লুক্বমান হাকীমের পরিচয় :

লুক্বমান হেকীমের পরিচয় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। যথা :

(ক) জাহেলী যুগের লোক কাহিনী অনুযায়ী লুক্বমান হাকীম ছিলেন 'আদ বংশোদ্ভূত বাদশা। আল্লাহ পাকের গযবে 'আদ জাতি ধ্বংস হয়। এ সময় ঈমানদার লোকেরা নবী হূদ (আঃ)-এর সাথে নিরাপদে থাকেন। লুক্বমান ছিলেন বেঁচে যাওয়া লোকদেরই বংশোদ্ভূত। তার বংশের লোকেরা ইয়ামানে সরকার ও শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখানে যারা দায়িত্ব পালন করেছিলেন লুক্বমান হেকীম তাদের অন্যতম।[১৫]

(খ) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী লুক্বমান হাকীম ছিলেন হাবশী গোলাম। (গ) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী লুক্বমান ছিলেন 'নূবাহ'-এর অধিবাসী। (ঘ) সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রাঃ)-এর মতে, তিনি ছিলেন মিসরের কৃষ্ণাঙ্গ লোকদের একজন।[১৬] (ঙ) ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ)-এর মতে, লুক্বমান ছিলেন আইয়ূব (আঃ)-এর ভাগ্নে। মুক্বাতিলের বর্ণনা মতে, তিনি আইয়ূব (আঃ)-এর খালাতো ভাই ছিলেন।[১৭] (চ) লুক্বমান (রহঃ) আল্লাহ্র এক বান্দা, যাকে আল্লাহ অনেক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। তিনি কোন নবী ছিলেন না। যে বর্ণনার ভিত্তিতে তাকে কেউ নবী বলতে চেয়েছে যে বর্ণনা সঠিক নয়।[১৮]

সুধী পাঠক! উপরিউক্ত অভিমতের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রথম মতটি বড় বড় ছাহাবীদের বর্ণনার পরিপন্থী। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর পরবর্তী বর্ণনা তিনটির মর্মার্থ একই। কেননা তখনকার দিনে কালো বর্ণের লোকেরা আরবীদের নিকট হাবশী বলে পরিচিত ছিল। আর 'নুবাহ' ছিল মিসরের দক্ষিণে ও সুদানের উত্তরে অবস্থিত এক এলাকার নাম। এই কারণে বর্ণনাকারীর ভিন্নতায় একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে হাবশী, নুবাহবাসী ও মিসরীয়-এই ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মূলতঃ তিনটি উক্তিতে এই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।[১৯]

বংশ তালিকা :

তাঁর বংশ তালিকা নিয়ে কয়েকটি মতামত পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে, তাঁর বংশ তালিকা হ'ল, লুক্বমান ইবন আনকা' ইবন সুরুন। আবার কারো মতে, লুক্বমান ইবন বাউরা ইবন নাহুর ইবন তারাহ।[২০] ইবনু কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিঃ)-এর বর্ণনা মতে, লুক্বমান ইবন আলকা' ইবনু সুদূন। ইবনু আব্বাস (মৃত ৭০ হিঃ)-এর মতে, তাঁর বংশ তালিকা হ'ল, লুক্বমান ইবন 'আদ ইবন আল-মুলতাত ইবন আস-সিকসাক ইবন ওয়াইল ইবন হিময়ার।[২১]

পেশা :

লুক্বমান ছিলেন ক্রীতদাস। তাঁর পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিঃ)-এর মতে, লুক্বমান সুতরা বা কাঠমিস্ত্রী ছিলেন।[২২] সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (জন্ম ১৭-১৯ হিঃ) বলেন, তিনি ছিলেন দর্জি।[২৩] ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, তিনি কাঠ চেরার কাজ করতেন।[২৪]

উপদেশ সমূহ :

লুক্বমান হাকীম তাঁর সন্তানকে মোট ৮টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন, যা একটি পরিবার, সমাজ ও জাতির উন্নয়নের প্রধান উপায়। যেমন সন্তানকে নির্ভেজাল

---

১৫. তাফহীমুল কুরআন ১১/১১৪ পৃঃ।

১৬. তাফসীর নূরুল কুরআন ২১/১১৯ পৃঃ।

১৭. তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন ৭/৩৪ পৃঃ; তাফসীর কাশশাফ ৩/৪৯২ পৃঃ।

১৮. তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ৫/৪৯১ পৃঃ।

১৯. তাফসীর নূরুল কুরআন ২১/১১৯ পৃঃ।

২০. তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৪১ পৃঃ।

২১. তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/৪২৭ পৃঃ; ইসলামী বিশ্বকোষ ২৩/২৯১ পৃঃ।

২২. তাফসীর নূরুল কুরআন ২১/১১৯ পৃঃ।

২৩. তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৪১ পৃঃ; তাফসীর ইবন কাছীর ৩/৪২৭ পৃঃ।

২৪. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৭/৩৫ পৃঃ; বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মাদ আব্দুল করীম, 'সূলা লুক্বমান-এর আলোকে শিষ্টাচার ও আনুগত্য এবং তার বাস্তব প্রয়োগ' এম.এ থিসিস।

তাওহীদের শিক্ষা প্রদান করা, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা, ছালাত কায়েম করা, সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ হতে বিরত থাকা, বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করা, অহংকার করে পৃথিবীতে বিচরণ না করা, সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা, কণ্ঠের আওয়াজ নীচু করা।

(ক) নির্ভেজাল তাওহীদের শিক্ষা প্রদান করা :

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের সুষ্ঠু পরিচর্যা এবং নিয়ন্ত্রিত জীবন গঠনের অভিপ্রায়ে। স্থিতিশীল সমাজ ও শান্তিময় পৃথিবী গড়তে নির্ভেজাল তাওহীদের শিক্ষা ও নিরংকুশ উলূহিয়াতের বিশ্বাস কর্মে প্রতিফলিত করার কোন বিকল্প নেই। রুবূবিয়াত হিসাবে আল্লাহকে এক গণ্য করা ও তাঁর নাম ও গুণাবলীর উপর নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন করা তাওহীদপন্থী মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এ বিষয়ে পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে বিশ্বের সকল হঠকারী লোক থেকে শুরু করে ঈমানদার ও সাধারণ জনগণের বিশ্বাস এক ও অভিন্ন ছিল।

বিশ্বের সকল মানুষ আল্লাহকে পালনকর্তা, মৃত্যুদাতা, জন্মদাতা, রিযিকদাতা, বিশ্বের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক হিসাবে এবং এ বিশ্ব জগতের সৃষ্টির পিছনে এক মহাশক্তির চিরস্থায়ী অস্তিত্বকে স্বীকার করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ.

'হে নবী! আপনি ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হ'তে রূযীর ব্যবস্থা করে থাকেন? তোমাদের শ্রবণ ও দর্শনের মালিক কে? কে প্রাণহীন বস্তু হ'তে জীবন্তকে এবং জীবন্ত হ'তে মৃত্যুকে বের করে আনেন? কে এই সৃষ্টি জগতের সকল কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিবে, 'আল্লাহ'। আপনি বলুন! তবে কেন তোমরা তাঁকে ভয় করো না'? *(ইউনুস ১০/৩১)*।

সুধী পাঠক! দূর অতীতে দুনিয়ার সকল মানুষ আল্লাহকে একক স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কেউ তাঁর একক আনুগত্য স্বীকার করত না। বরং তাঁকে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন অসীলা বা মাধ্যম অথবা সুপারিশকারীর অনুসন্ধান করত এবং তাদের পূজা-অর্চনা করত। এমনকি তাদের নিকট তার জীবনের সকল আশা-আকাংঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া নিবেদন করত। কুরবানী পর্যন্ত দিত তাদের উদ্দেশ্যে। সূদ-ঘুষ, মুনাফাখোরী, মওজুদকারী ও চক্রবৃদ্ধিহারে সূদের জালে বন্দি ছিল সাধারণ জনগণ। আল্লাহকে তারা সকল ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করত না। বরং নিজেরাই এক একজন প্রভু হিসাবে বনে গিয়েছিল।

বর্তমানে যা রাজনীতির নামে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে চলমান। যেখানে গণতন্ত্রের নামে জনগণকে মা'বূদের আসনে বসানো হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মানুষকে ধর্ম থেকে দূরে রেখে বস্তুবাদকে মুক্তির উৎস হিসাবে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি পুঁজিবাদী অর্থনীতির নামে চরম ভোগবাদিতা ও সীমাহীন ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে সমাজের উন্নয়ন কাঠামো আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাওহীদে ইবাদতের মৌলিক অর্থ হ'ল, 'জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রকারের আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই নিবেদন করা এবং ত্বাগূতের আনুগত্য থেকে দূরে থাকা ও চরমভাবে ঘৃণা করা। আর এই বৈপ্লবিক আহ্বানের নির্দেশনা প্রদান করেই মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ সকল নবী ও রাসূলের মিশন ছিল এক ও অভিন্ন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই দাওয়াত দেওয়ার জন্য যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং ত্বাগূতের আনুগত্য হ'তে বিরত থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*।

সুধী পাঠক! এই চিরন্তন দাওয়াত পৃথিবীর যে অঞ্চলে গিয়ে উপনীত হয়েছে, সেই অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে ক্বায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর মনে তখনই কম্পন সৃষ্টি হয়েছে। তাওহীদের এই বিপ্লবাত্মক কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্দ ও নসাৎ করে দেওয়ার জন্য তারা তাদের সর্বশক্তিও নিয়োগ করেছে। ইবরাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নমরূদের শত্রুতা, মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ফেরাঊনের অভিযান, ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তাঁর দেশের সম্রাটের হত্যা প্রচেষ্টা, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে আবু জাহল, আবু লাহাবসহ গোটা আরব জাতির ক্বায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর সম্মিলিত উত্থান- এ সবই তার জাজল্য প্রমাণ। বলা বাহুল্য, মানব জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মূলতঃ নবীগণের আগমন ঘটেছিল। সুতরাং তাওহীদ বলতে বলা যায়, যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া, আবেদন-নিবেদন ও আনুগত্যের দাবীদার হিসাবে একমাত্র আল্লাহকেই বিশ্বাস করা।

তাওহীদের উপরিউক্ত তাত্ত্বিক দিক উপলব্ধি করেই লুক্বমান হাকীম তাঁর প্রিয় শিশু পুত্রকে সর্বপ্রথম তাওহীদের প্রতি আকৃষ্ঠ আনুগত্যের উপদেশ দিয়েছিলেন। এই মর্মে তিনি তাঁর সন্তানকে লক্ষ্য করে বলেন,

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

'হে প্রিয় বৎস! তুমি আল্লাহ্র সাথে শিরক কর না। নিশ্চয় শিরক মহা অন্যায়' *(লুক্বমান ৩১/১৩)*।

প্রথমেই তিনি তাঁর সন্তানকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। তিনি বলেন, খবরদার হে আমার আদরের সন্তান! তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার বানিও না। কেননা তাঁর সাথে শিরক করা জঘন্য অন্যায় কর্মকাণ্ডের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট অন্যায় কর্ম। যার ফলে তার সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়। আর শিরককারীর

গুনাহ আল্লাহ কখনো ক্ষমা করেন না। এটি কাবীরা গুনাহ্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا.

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক স্থাপন করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না, ইচ্ছা করলে অন্যান্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শিরক স্থাপন করে সে মহাপাপ কাজই করে’ *(নিসা ৪/৪৮ ও ১১৬)*।

শিরককারীর উপর আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন। যেমন

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ.

‘নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শিরক করবে, তার উপর জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম হবে তার আবাসস্থল। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না’ *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

জাবের (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতে ও জাহান্নামে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য কী? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে বিন্দুমাত্র শিরক করবে সে জাহান্নামে যাবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে বিন্দুমাত্র শিরক করবে না সে জান্নাতে যাবে’।[২৫]

শিরক করলে তার বিগত দিনের যাবতীয় আমল নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ‘যদি তারা শিরক করে তাহলে তাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে’ *(আন‘আম ৬/৮৮)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

‘আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করেন, তাহলে আপনার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন’ *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِى بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِى لاَ تُشْرِكُ بِى شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার নিকট যমীন ভর্তি পাপ নিয়ে আস আর শিরক মুক্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ কর তাহ’লে আমি ঐ যমীন ভর্তি পাপ ক্ষমা করে দিব।[২৬]

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে শিরক করা। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।[২৭]

নির্ভেজাল তাওহীদের পিবরীত হ’ল শিরক। আর শিরককে লালন করতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি যদি আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করা হয় কিংবা কেটে টুকরা টুকরা করে হত্যা করা হয় তবুও শিরক থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ.

‘আল্লাহ্র সাথে কাউকেও শরীক স্থাপন না করা। যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলা হয় অথবা জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়’।[২৮]

সুতরাং শিশুকে তার সৃষ্টিকর্তা মহান শিল্পী আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা প্রদান করতে হবে। যেন তাঁর সাথে কেউ শিরক স্থাপন না করে। সন্তান-সন্ততি সঠিকভাবে লালন-পালন করার জন্য পিতা-মাতার যে গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কর্তব্য হ’ল, শিশু যখন কথা বলা শিখবে তখন তাকে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া এবং তার অন্তরে সেটা প্রোথিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আর এই জন্যই লুক্বমান হাকীম তার শিশু সন্তানকে প্রথমে আল্লাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেন। কেননা এটা হবে তার পরবর্তী জীবনের যাবতীয় বিপদাপদে হক্ব পথে দৃঢ় থাকার একমাত্র সুদৃঢ় অবলম্বন।

কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেখানে একটি শিশু ছোটবেলা থেকেই পাশ্চাত্য কর্তৃক চালু করা শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে উঠছে। তাদের মূল টার্গেট হ’ল ঈমান,

২৫. ছহীহ মুসলিম হা/২৭৯ ও ২৭৮; মিশকাত হা/৩৮।

২৬. তিরমিযী হা/৩৫৪০; ইবনু মাজাহ হা/৩৮২১; মিশকাত হা/২৩৩৬, সনদ ছহীহ।

২৭. ছহীহ বুখারী হা/২৬৫৩; ছহীহ মুসলিম হা/২৬৯; তিরমিযী হা/১২০৭; মিশকাত হা/৫০।

২৮. মুসনাদে আহমাদ হা/২২৭২৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৩৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৮; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৫১৬; ইরওয়াউল গালীল হা/২২৪; মিশকাত হা/৬১, সনদ ছহীহ।

আক্বীদা, আমল ও নৈতিকতা বিহীন শিক্ষা। ‘দুনিয়ার চাকচিক্যই যথেষ্ট’ নামে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের শিখানো থিওরিতে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আজ বিপর্যস্ত। অথচ সাধারণ মুসলিম সেগুলোকেই সফলতার মানদণ্ড হিসাবে আখ্যা দিয়ে থাকে।

(খ) পিতা-মাতার সাথে সদচারণ করা :

পিতা-মাতার উপর সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হ’ল তার সবচেয়ে ভাল ও উত্তম ব্যবহার শুধুমাত্র তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা। পৃথিবীর আর কেউ তাদের মত শ্রদ্ধা পাওয়ার হক্ব রাখে না। কাজেই যারা তাদের অনুগত হবে না তারাই হবে বড় ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা দুনিয়াতে দ্বিতীয় বড় পাপ হচ্ছে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।[২৯] এই জন্যই লুক্বমান হাকীম (রহঃ) তাঁর সন্তানকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনের শিক্ষা দিয়ে বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ.

‘আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য আদেশ করেছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুধ ছাড়া পর্যন্ত তাকে দু’বছর দুধপান করিয়েছে। কাজেই আমার শুকরিয়া আদায় কর এবং তোমার মাতা-পিতার শুকরিয়া আদায় কর’ *(লুক্বমান ৩১/১৪)*।

সুধী পাঠক! সদাচরণের ভিত্তি স্থাপিত হয় মূলতঃ পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। তারা তাদের সন্তানদের এই মর্মে শিক্ষা প্রদান করবে যে, সন্তানের পক্ষ থেকে সকল প্রকারের সদাচরণ তারা প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা‘আলা পিতা-মাতাদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্র ইবাদত করার পরই যে উত্তম কাজটি করার কথা বলা হয়েছে সেটি হ’ল পিতা-মাতার সাথে ইহসান ব্যবহার করা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا.

‘আপনার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তোমাদের নিকট যদি তাদের কোন একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাদেরকে ‘উহ’ পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না; বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে। রহমদীলে তাদের সাথে সর্বদা বিনয়াবনত থাকবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন’ *(বানী ইসরাঈল ১৭/২৩-২৪)*।

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبٌّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ .

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় আমল কী? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘সময়মত ছালাত আদায় করা’। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কী? তিনি বললেন, ‘পিতা-মাতার অনুগত হওয়া’।[৩০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে এক ব্যক্তি বলল, আমি (আল্লাহ্র পথে) জিহাদ করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা-মাতা আছেন কী? লোকটি বলল, হ্যাঁ আছেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি এ দু’জনের ব্যাপারে জিহাদ কর অর্থাৎ তাদের সেবা কর।[৩১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে মানুষের পিতা-মাতার প্রতি অভিশাপ করা। জিজ্ঞেস করা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মানুষ কিভাবে পিতা-মাতার প্রতি অভিশাপ করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, মানুষ কারো পিতাকে গালি দিলে সে তার পিতাকে গালি দেয়। কেউ কারো মাতাকে গালি দিলে সে তার মাতাকে গালি দেয়।[৩২] পিতা-মাতার সেবা করলে আল্লাহ দো‘আ কবুল করেন।[৩৩] বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা জান্নাতের মাধ্যম এবং সেবা না করা ভর্ৎসনার মাধ্যম।[৩৪] অমুসলিম পিতা-মাতার সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে।[৩৫] পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি।[৩৬]

---

২৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০।

৩০. ছহীহ বুখারী ২/৮৮২ পৃঃ; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৮।

৩১. ছহীহ বুখারী ২/৮৮৩ পৃঃ।

৩২. ছহীহ বুখারী ২/৮৮৩ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৬।

৩৩. ছহীহ বুখারী ২/৮৮৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৯৩৮।

৩৪. ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১২।

৩৫. ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৪৯১৩ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়।

৩৬. তিরমিযী হা/১৮৯৯, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৯২৭।

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِى امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّى تَأْمُرُنِى بِطَلاَقِهَا قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ.

আবু দারদা (রাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার মাতা আমার স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দিতে বলছেন (এখন আমি কী করব)। আবু দারদা (রাঃ) তাকে বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, পিতা-মাতা হচ্ছেন জান্নাত লাভের মাধ্যম। আপনি ইচ্ছা করলে তা হিফাযত করতে পারেন আবার নষ্টও করতে পারেন।[৩৭]

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِىِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا.

মু‘আবিয়া ইবনু জাহিমা আস-সুলামী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জাহেমা নামে একজন ছাহাবী যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পরামর্শ নিতে আসল। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার মাতা আছেন কী? লোকটি বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি তাঁর সেবা কর। কেননা তাঁর পায়ের নিকট জান্নাত রয়েছে।[৩৮]

সুধী পাঠক! ইসলামী শরী‘আতে পিতা-মাতার মর্যাদা অপরিসীম। পিতা-মাতার প্রতি সন্তান-সন্ততিদের সদ্ব্যবহার ও দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে অটুট থাকলে সমাজে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে। বৃদ্ধাবস্থায় পিতা-মাতাকে আর বৃদ্ধাশ্রমে দিনাতিপাত করতে হবে না। নানা নির্যাতন ও নিপীড়নের অসহায় শিকার হতে হবে না। মূলতঃ এই সমস্ত বিষয়গুলো তখনই কার্যকর হবে যখন সন্তানকে লুক্বমান হাকীমের ন্যায় শৈশব কালে ইসলামী আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হবে। এটিই ছিল লুক্বমান হেকীমের হেকমত।

(গ) ছালাত ক্বায়েমের নছীহত করা :

ইসলামী শরী‘আতে ছালাতই একমাত্র ইবাদত, যার হিসাব ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সর্বপ্রথম গ্রহণ করবেন। এটি শুদ্ধ হ’লে সবই শুদ্ধ হবে, অন্যথায় সবই বিফলে যাবে।[৩৯] ছালাত যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। এটিই মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড।[৪০] তাছাড়া যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ছালাত পরিত্যাগ করবে, সে কুফুরী করবে[৪১] এবং শিরক করবে।[৪২] ছালাতের মাধ্যমে সূদ-ঘুষ, দুর্নীতি ও অন্যায় প্রতিরোধ করা যায়। ছালাতের মাধ্যমে ব্যক্তির পরিচয় ফুটে ওঠে। এটি আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শারীরিক সুস্থতারও মাধ্যম বটে। ছালাত এমন একটি ইবাদত, যা স্বয়ং জিবরীল (আঃ) এসে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।[৪৩] এই জন্য লুক্বমান (রহঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় শিশু সন্তানকে ছালাতের উপদেশ দিয়ে বলেন, يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ ‘হে প্রিয় বৎস! তুমি ছালাত কায়েম কর’ *(লুক্বমান ৩১/১৭)*।

ইবাদত হিসাবে ছালাত সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। এটি ছাহাবীগণকে রাসূল (ছাঃ) হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন।[৪৪] ছালাতের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হ’ল, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى أُصَلِّى ‘তোমরা ছালাত আদায় কর ঐভাবে, যেভাবে আমাকে দেখছ’।[৪৫] আর এই ছালাত নির্ধারিত সময়েই বিশ্ব মানবতার উপর ফরয হয়েছে *(নিসা ৪/১০৩)*। ছালাতের ব্যাপারে অলসতাকারীর জন্য চরম দুর্ভোগ রয়েছে *(মাঊন ১০৭/৪-৫)*।

সুধী পাঠক! উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়া, পরিবার ও সমাজ জীবনে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহের জন্য ছালাতই একমাত্র প্রধানতম উপায়। লুক্বমান হেকীম এজন্য তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তানকে নিয়মিত ছালাত আদায়ের নছীহত করেছেন। তাছাড়া ইসলামী শরী‘আতেও একজন শিশুর বয়স যখন সাত বছর বয়স হবে, তখন তার ছালাত আদায়ের প্রতি নির্দেশনার কথা এসেছে।[৪৬] *(চলবে)*

---

৩৭. তিরমিযী হা/১৯০০; মিশকাত হা/৪৯২৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯১৪, সনদ ছহীহ।

৩৮. নাসাঈ হা/৩১০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৯, সনদ হাসান।

৩৯. ত্বাবারাণী-মু‘জামুল আওসাত্ব হা/১৮৫৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮, সনদ ছহীহ।

৪০. সূরা তওবা ৯/১১; মারিয়াম ১৯/৫৯; ছহীহ মুসলিম হা/১৫২০; মিশকাত হা/১০৭২; নাসাঈ হা/৮৫৭; মালেক মুওয়াত্ত্বা হা/৪৩৫; ছহীহ মুসলিম হা/২৫৬-২৫৭; মিশকাত হা/৫৬৯।

৪১. তিরমিযী হা/২৬২১; নাসাঈ হা/৪৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/৫৭৪, সনদ ছহীহ।

৪২. ইবনু মাজাহ হা/১০৮০, সনদ ছহীহ।

৪৩. আবুদাঊদ হা/৩৯৩; তিরমিযী হা/১৪৯; মুসনাদে আহমাদ হা/৩৩২২, সনদ ছহীহ।

৪৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩।

৪৫. ছহীহ বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৭৯০ ও ৭৫।

৪৬. আবুদাঊদ হা/৪৯৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৮৬৭, সনদ ছহীহ।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

(শেষ কিস্তি)

হে মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুর কিতাব নিয়ে গবেষণা কর। তা বেশী বেশী তেলাওয়াত কর। এ কিতাবের আদেশ অনুযায়ী জীবন গড়, এর নিষেধগুলো থেকে বেঁচে থাক। পবিত্র কুরআনের দেখানো প্রশংসিত আখলাক্ব ও আমলের সাথে পরিচিত হও। সে পথেই অগ্রসর হয়ে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়নে উদ্যমী হও।

আর সে আখলাক্ব ও আমলের সাথেও পরিচিত হও, যাদের অনুসারীদের ব্যাপারে কুরআন নিন্দা ও ভীতি প্রদর্শন করেছে। তোমরা বদ আমল ও আখলাক্ব থেকে সর্তক হও, বেঁচে থাক। তোমরা পরস্পর একে অপরকে উপদেশ দাও এবং তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত এর উপর ধৈর্যধারণ করে থাক। এভাবেই তোমরা সম্মানের অধিকারী হবে, মুক্তি ও সৌভাগ্য তোমাদের আচ্ছাদন করবে। সর্বোপরি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান-মর্যাদার অধিকারী হবে।

আর মুসলিমদের উপর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল, সুন্নাতে রাসূলের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, তা নিয়ে গবেষণা করা এবং এর আলোয় জীবন পরিচালনা করা। কেননা এটা অহীর দ্বিতীয় উৎস এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাখ্যা ও এর মধ্যকার দুর্বোধ্য অর্থের স্পষ্টকারী। আল্লাহ বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

'আর আপনার কাছে আমি যিকির (হাদীছ) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে (কুরআন), যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

'আমি আপনার প্রতি এমন গ্রন্থ নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ' *(নাহল ১৬/৮৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' *(নূর ২৪/৬৩)*।

এছাড়াও আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি আনুগত্যের আবশ্যকতা ও তাঁর সুন্নাতের মর্যাদাকে প্রসার করে। এছাড়াও যা সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা, এর বিরোধীতা করা এবং সুন্নাতের ব্যাপারে খুববেশী অলসতা দেখানোর ব্যাপারে সতর্ক করছে। সাথে সাথে যা কুরআন নিয়ে গবেষণার কথা শিক্ষা দেয় এবং রাসূল (ছাঃ) থেকে যেসব ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা অনুধাবনের শিক্ষা দেয়।

কুরআনুল কারীম ও সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ, তার সম্মান করা, সকল অবস্থায় এ ব্যাপারে সদোপদেশ দেওয়া ও এর উপরে ধৈর্যধারণ ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার কোন কল্যাণ, সৌভাগ্য, সম্মান-মর্যাদা ও মুক্তি নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে' *(আনফাল ৮/২৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং যে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং

Contents

প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব, যা তারা করত' *(নাহল ১৬/৯৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ 'মর্যাদা তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না' *(মুনাফিকুন ৬৩/৮)*।

অতঃপর মহান আল্লাহ এসব আয়াতে এ মর্মে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে এবং কথা ও কাজে এর উপর অবিচল থাকবে তার জীবনটা পবিত্র প্রশান্তিময়, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও মর্যাদাপূর্ণ হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং এগুলো ছেড়ে অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, সে সর্বদা কষ্ট, দুঃখ-দুর্দশা, চিন্তা পেরেশানী আর জীবন-যাপনে সংকীর্ণতায় ভোগবে। দুনিয়ার বন্দীদশা শেষে এর চেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ বীভৎস জাহান্নামের আগুনে তাকে নিক্ষেপ করা হবে। মহান আল্লাহ্‌র কাছে এ থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি। আল্লাহ বলেন,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ-فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ.

'তাদের (মুনাফিকদের) অর্থ সাহায্য নিষেধ করা হয়েছে এই জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, ছালাতে আসে অলসতার সাথে এবং ব্যয় করে সংকুচিত মনে। সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ্‌র তো এর দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। তারা কাফের থাকাবস্থায় তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে' *(তওবা ৯/৫৪-৫৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى- وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.

'এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়াত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না'। 'যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব' *(ত্ব-হা ২০/১২৩-১২৪)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 'গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ- وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ 'সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে' *(ইনফিতার ৮২/১৩-১৪)*। কিছু মুফাসসিরে কুরআনের মতে, এ আয়াতে সাধারণভাবে সৎ ও পাপী ব্যক্তিদের দুনিয়া ও আখেরাতের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর মুমিন ব্যক্তি দুনিয়া, কবর ও পরকালে সুখ-শান্তিতে থাকবে। যদিও দুনিয়ার জীবনে তার উপর বাহ্যিক দৃষ্টিতে দরিদ্রতা, অসুস্থতার মত বিপদাপদ আপতিত হতে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখ-শান্তি অন্তরের প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তির নাম। ফলে মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আস্থা, নির্ভরশীলতা, তাঁর কাছে অমুখাপেক্ষীর প্রার্থনা, তাঁর হক্ব আদায় ও তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাশীল হওয়ার মাধ্যমে অন্তরের পরিতৃপ্তি, বুকের প্রশান্তি ও হৃদয়ে এক অনাবিল প্রফুল্লতা অনুভব করে। আর একজন পাপী ব্যক্তি, তার অন্তরের ব্যাধি, মূর্খতা, সন্দেহ প্রবণতা, আল্লাহ বিমুখতা আর দুনিয়ার প্রবৃত্তি অন্বেষণের পিছনে অন্তরের পেরেশানী তাকে সর্বদা কষ্ট, উদ্বেগ ও ক্লান্তিতে রাখে। এরপরও কু-প্রবৃত্তির মোহ তার বিবেককে এ বিষয় উপলব্ধি থেকে আচ্ছন্ন রাখে।

অতঃপর হে মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তার অনুসরণের জন্য যে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, এ ব্যাপারে সতর্ক হও। তার বিধান উপলব্ধি কর এবং তোমার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত এর উপরই অটল থাক। তাহ'লেই চিরস্থায়ী সুখ লাভে ধন্য হবে। জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ- نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ- نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ.

'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য

Contents

আছে, যা তোমরা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন' *(ফুছছিলাত ৪১/৩০-৩২)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ- أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর এর উপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী! তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল' *(আহক্বাফ ৪৬/১৩-১৪)*।

মহান আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের ও তোমাদের তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আমাদের অন্তর ও আমলের খারাপী থেকে পরিত্রাণ দান করেন। নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ের উপর শক্তিধর। দরূদ ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হোক এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সম্মানিত ছাহাবীদের উপরও।

মুসলিম নেতা ও তাদের আনুগত্যের উদ্দেশ্যে সাধারণ উপদেশ :

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত। দরূদ ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ ও সমস্ত ছাহাবীদের উপর বর্ষিত হউক। অতঃপর সংক্ষিপ্ত হামদ ও ছানার পর, (অবগতির বিষয় হল) আল্লাহ্র হিকমত নির্ধারিত হয়ে গেছে যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভাল, খারাপ, সুস্থতা, অসুস্থতা, দরিদ্রতা, ধনাঢ্যতা, শক্তি ও দুর্বলতা দ্বারা পরীক্ষা করবেন, এটা দেখার জন্য যে, তারা সমৃদ্ধি ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ও সকল অবস্থায় তাঁর হক্ব আদায় করে কি-না? মহান আল্লাহ বলেন, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 'আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(আম্বিয়া ২১/৩৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

الم- أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.

'আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি এই কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? আমি তো পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী' *(আনকাবুত ২৯/১-৩)*।

যখন এটা জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করবেন, তাদের কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যের পরীক্ষা নিবেন, যাতে তারা আল্লাহ্র কাছ থেকে নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিদান গ্রহণ করতে পারে। তখন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক হল, যখন আল্লাহ তা'আলা সম্পদের নে'মতের মাধ্যমে তার উপর অনুগ্রহ করবে, তখন সে তার অভাবী হতদরিদ্র ভাইয়ের কথা স্মরণ করবে, তাকে নিজ সম্পদ থেকে সহযোগিতা করবে, যাতে সে জীবনের প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং সে স্বীয় সম্পদ থেকে আল্লাহ্র আবশ্যকীয় হক্ব আদায় করবে। আর সর্বদা আল্লাহ্র স্মরণ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

'আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্দারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে আমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পসন্দ করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৭)*।

যখন একজন মুসলিম ব্যক্তি শারীরিকভাবে পূর্ণ সামর্থ্যবান হবে, তার জন্য উচিত হ'ল, সে তার অসুস্থ ভাই ও অপারগ দুর্বল প্রতিবেশীকে স্মরণ করবে, তাদের যাবতীয় প্রয়োজনে সহযোগিতা করবে এবং তাদের সুস্থ করে তুলতে সার্বিক চেষ্টা করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যখন একজন জ্ঞানের দিক দিয়ে শক্তিশালী হবে, তখন তার উপর আবশ্যক হ'ল, ইলম বঞ্চিত আল্লাহ্র মুসলিম বান্দাদেরকে জ্ঞান দ্বারা সহযোগিতা করবে। তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারে আসে এমন সব বিষয়ে তাদের নির্দেশনা দিবে এবং তাদের উপর আল্লাহ যা আবশ্যক করেছেন তা শিক্ষা দিবে। সাথে সাথে তারা যেন সবাই আল্লাহ্র এ বাণীকে স্মরণ করে,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

'যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

(সুধী পাঠক!) এখানে একক কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি, বরং গোটা মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। তাই ধন-দৌলত, শৌর্য-বীর্য, অস্ত্র অথবা জ্ঞানের দিক দিয়ে শক্তিশালী ব্যক্তির উপর এই উম্মতের দুর্বলদের

Contents

সাহায্য-সহযোগিতা করা যরূরী। আর তারা নিজেদের ও দ্বীনের হেফাযতের ব্যাপারে সাহায্য করবে এবং তাদের উপর চারপাশ থেকে চেপে ধরা হিংস্রতা থেকে বাধা দিবে এবং আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারিত যে সম্পদ ধার্য করেছেন তা প্রদান করবে। এটা হ'ল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবী। যে বন্ধন পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের দুই মুসলিমের মধ্যে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

অতঃপর হে মুসলিম নেতা ও তোমাদের নেতৃত্ব! হে মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! প্রত্যেক স্থানে আমি তোমাদেরকে এ মহান আয়াতে কারীমার পূর্ণ বাস্তবায়নের আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি, সকল মুসলিমদের মাঝে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য। যদিও তারা জাতি, বর্ণ ও ভাষায় আলাদা। মুসলিমরা যেন শত্রুদের মুকাবেলায় মুষ্টিবদ্ধ একহাত হয়ে যায়।

জেনে রাখ! মহান আল্লাহ পূর্বের যুগের তুলনায় এ যুগে তোমাদের উপর বেশী বেশী পরীক্ষা চেপে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা এ মুসলিম উম্মাহ্‌র একদলকে বিভিন্ন ধরনের নে'মত দান করেছেন, আবার আরেক দলকে দরিদ্রতা, মূর্খতা ও ইসলামের শত্রু ইহুদী-নাছারা, কমিউনিষ্টদের তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন। তিনি এযুগের নব আবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, যার মাধ্যমে লোকেরা তড়িৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার সংবাদ নিতে ও তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। যাকে তারা জবাবদিহিতা ও সাহায্যের বড় মাধ্যম হিসাবে ধরেছে এবং যখন তাদের ইচ্ছা হয় এর মাধ্যমে তারা পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে, এমন সব যন্ত্রের দ্বারা তিনি পরীক্ষা করছেন। এর ফলে আজকের মুসলিমরা ফিলিপাইন, আফগানিস্তান, ইরিত্রিয়া, হাবশা, ফিলিস্তীনের মত আরো কাছের দেশের মুসলিম ভাইদের উপর অমানবিক যা ঘটছে। এছাড়াও কমিউনিষ্ট কাফের জনপদে সংখ্যালঘু অনেক মুসলিম বোন রয়েছে। অথচ মুসলিমরা এদের হক্বের ব্যাপারে উদাসীন। তারা তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতার জন্য ছাড়াচ্ছে না। অথচ রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِى تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

'ভালবাসা, দয়া, সহানুভূতির দিক দিয়ে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হ'ল একটি দেহের ন্যায়। দেহের একাংশ আক্রান্ত হ'লে সমগ্র দেহ জ্বরগ্রস্ত ও নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে'।[৪৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য গৃহ স্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় রাখে। অতঃপর তিনি তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন'।[৪৮] এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে না তার উপর যুলুম করতে পারে আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন কষ্ট বা অসুবিধা দূর করে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদ থেকে অংশ বিশেষ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন'।[৪৯] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ.

'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের দোষ গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।[৫০]

রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত এসকল ছহীহ হাদীছ স্পষ্ট করে যে, মুসলিমদের উপর পরস্পর সহযোগিতা ও একজনের প্রয়োজনে অপরজনের এগিয়ে আশা আবশ্যক। বিশ্বের উলামায়ে কেরাম এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পশ্চিম দিগন্তে একজন বোন বিপদে পড়লে, পূর্ব দিগন্তে স্থানরত ভাইয়ের উপর তার সাহায্যে এগিয়ে আসা অবশ্যক। তাহ'লে

৪৭. বুখারী হা/৬০১১; মিশকাত হা/৪৯৫৩।

৪৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫৫।

৪৯. বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/৬৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৫৮।

৫০. মুসলিম হা/৭০২৮; মিশকাত হা/২০৪, 'ইলম' অধ্যায়।

Contents

কিভাবে? অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর হত্যা, গৃহহীন করা, যুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়ভাবে বন্দী করার মত অমানবিক কর্মকাণ্ড চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারপরও তার অন্য ভাই তাদের মুক্ত করতে আন্দোলন করছে না, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে না? আল্লাহ্র ইচ্ছায় সামান্য দু-একজন ব্যতীত। তাই পৃথিবীর ইসলামী রাষ্ট্র ও ধনাঢ্য, সম্পদশালী ব্যক্তিদের উচিত তাদের অসহায়-দুর্বল ভাইদের প্রতি সহানুভূতি ও দয়ার দৃষ্টিতে তাকানো এবং তাদের মিত্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে সফর করার মাধ্যমে তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা। অথবা ইসলামী শাসনের নামে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্যে একটি দল প্রেরণ করা উচিৎ। যারা এসকল মুসলিম রাষ্ট্র অপরাপর সংখ্যালঘু মুসলিম বোনদের খবরাখবর নিবে। আর যখন ইহুদী, নাছারা, কমিউনিষ্ট ইত্যাদি কাফের সম্প্রদায়গুলো, বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিজ নিজ ধর্মের লোকদের অধিকার সংরক্ষণে এগিয়ে আসছে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের দ্বারা তাদের কেউ আক্রান্ত হ'লে কখনো কখনো তাদের হুমকি-ধুমকি দিচ্ছে, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে। যদিও তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ফিরছে। সেখানে কিভাবে মুসলিমরা আজ বিশ্বের নানা অঞ্চলে স্থায়ী যুদ্ধ, যুলুম অত্যাচার সহ নানাবিধ কষ্ট তার ভাইদের উপর চাপিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও নীরব রয়েছে? এরপরও মুসলিম কোন জাতি বা দল তাদের জন্য আন্দোলন করছে না, তারা যে বিপদ দুঃখ-কষ্ট কষ্টের কথা শুনছে, দেখছে তা তাদের উপরও এসে পড়ে? এই ভয়ে! তাদের সহযোগিতায়, তাদের উপর আপতিত যুলুম-অত্যাচর প্রতিরোধ করার মত কাউকে তুমি পাবে না। একমাত্র আল্লাহই তাদের সাহায্যকারী। আর তাঁর কাছ একটিই মাত্র চাওয়া, তিনি যেন তার বান্দাদের অন্তরকে তার অনুসরণে নিবেদিত করে দেন। বিশ্বের মুসলিম নেতা ও তাদের অনুসারীদের হেদায়াত দান করেন এবং তারা যেন আল্লাহ্র আদেশ বাস্তবায়ন, তার কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাহ্র অনুসরণ, মুসলিম ভাইদের সহাযোগিতা এবং যালেম-সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মুসলিম নেতা ও তাদের অনুসারীদের হাতকে এক করে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত করে দেন। যেমন মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ- الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

'আল্লাহ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্র সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর'। 'তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত' *(হজ্জ ২২/৪০-৪১)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা' *(মায়েদাহ ৫/২)*। তিনি আরো বলেন, وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. 'কসম যুগের (সময়ের)। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের এবং উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের' *(আছর ১০৩/১-৩)*।

আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাঁর সকল অনুসারীদের উপর।

[অনুবাদক : তৃতীয় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী]

ফিৎনা সম্পর্কে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর মন্তব্য

'যে ব্যক্তি ইসলামে ছোট-বড় যত ফেৎনা সংঘটিত হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করবে, সে এই মূলনীতির লঙ্ঘন এবং খারাপ কাজ দেখে ধৈর্যধারণ না করার বিষয়টি দেখতে পাবে। কেননা এর অপসরণ চাইতে গিয়ে তার থেকে বড় ফিৎনার সৃষ্টি হয়। রাসূর (ছাঃ) মক্কার বড় বড় খারাপ কাজসমূহ প্রত্যক্ষ করতেন। কিন্তু তিনি তা পরিবর্তন করতে সক্ষম হননি। বরং আল্লাহ তা'আলা যখন মক্কা বিজয় দান করলেন এবং সেটি ইসলামের আবাস্থলে পরিণত হ'ল, তখন তিনি বায়তুল্লাহ পরিবর্তনের এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করলেন। কিন্তু তার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এর চেয়ে বড় ফিৎনা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কায় এ কাজ থেকে বিরত থাকলেন। কারণ কুরাইশদের নতুন ইসলাম গ্রহণ এবং সদ্য কুফরী থেকে বের হয়ে আসায় তারা তা সহ্য করতে পারত না' *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৩/২ পৃঃ)*।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা

-হাফেয আব্দুল মতীন

(২য় কিস্তি)

(১০) এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ওয়াজীব : হে মানব জাতি! আল্লাহ্র উপর ভরসা কর, তবে এমনটি নয় যে, কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে বসে থাকবে। সৎ আমল করবে, অন্যায়-পাপ থেকে দূরে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ 'সুতরাং মুমিনরা যেন আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করে' *(তাগাবুন ৬৪/১৩)*।

আমাদের জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করব, আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর প্রতি সুধারণা রাখব, জীবনের যেকোন কঠিন বিষয় হোক না কেন তাঁরই নিকট কাকুতি-মিনতি করব। কেননা তাঁরই দিকে রুজু হ'লে সকল বিষয় সহজ হয়ে যাবে। বান্দার ঈমান অনুযায়ী আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে থাকে এবং তাঁরই উপর ভরসা করে থাকে। বান্দার ঈমান যত মযবুত হবে ততই আল্লাহ্র উপর ভরসা শক্তিশালী হবে।[৫১] যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'তারা বলেছিল আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং মঙ্গলময় কর্মবিধায়ক' *(আলে ইমরান ৩/১৭৩)*। তিনি আরো বলেন, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ 'আল্লাহ্র উপরই ভরসা কর, যদি তোমরা মুমিন হও' *(মায়েদাহ ৫/২৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাইহ যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই' *(ত্বালাক্ব ৬৫/৩)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

'আমার উম্মতের সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাঁরা (হবে) ঐ সকল লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করে না, অবৈধভাবে মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করে না এবং তাঁরা তাদের প্রতিপালকের উপর একমাত্র ভরসা রাখে'।[৫২] মানব জাতির উচিত হবে যে, বাড়ীতে বসে না থেকে সৎ আমল করা, কাজ করা। এরপর আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। নিজ হাতে খেটে খাওয়া, মানুষের নিকট চাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করা। যুবাইর ইবনু আওয়াম (রাঃ)-এর সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ 'তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পীঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনে এবং তা বিক্রি করার মাধ্যমে রিযিক অন্বেষণ করে, ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (যাঞ্চা করার লাঞ্ছনা হ'তে) রক্ষা করেন, যা মানুষের নিকট চাওয়া থেকে অনেক উত্তম। কারণ অন্যের নিকট চাইলে সে কিছু দিবে অথবা না করবে'।[৫৩] অন্যত্র তিনি বলেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহ্র নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন'।[৫৪]

(১১) এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, নবী করীম (ছাঃ)-কে ভালবাসা ওয়াজিব : মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস (তাঁর ভালবাসা পেতে চাও) তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন। মহান আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। আলোচ্য আয়াতটি ঐ সকল ব্যক্তির দাবীর খণ্ডণ ও ফায়ছালা করে, যে সমস্ত ব্যক্তিরা আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করে, অথচ সে দাবীটি মুহাম্মাদী তরীকার উপর নয়, তাহলে তাদের নিজের দাবীটি মিথ্যা বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ না তাদের সকল কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, চাল-চলন মুহাম্মাদী শরী'আতের অনুসরণে হবে।[৫৫]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই'।[৫৬]

---

৫১. তাফসীর আস-সা'দী, পৃঃ ৮৬৮।
৫২. বুখারী হা/৬৪৭২; মিশকাত হা/৫২৯৫।
৫৩. বুখারী হা/১৪৭১।
৫৪. বুখারী হা/২০৭২।
৫৫. তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/৪৬ পৃঃ।
৫৬. বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/৪৪।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ أَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلّٰهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ.

'তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হ'তে অধিক প্রিয় হওয়া (২) কাউকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসা এবং (৩) কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপসন্দ করা'।[৫৭]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ لاَ شَىْءَ إِلاَّ أَنِّى أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ক্বিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তুমি ক্বিয়ামতের জন্য কী জোগাড় করেছ? সে বলল, কোন কিছুই জোগাড় করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যাদেরকে ভালবাস তাদের সাথেই তোমার হাশর হবে।[৫৮]

(১২) এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মান-মর্যাদা দেওয়া ওয়াজীব : মহান আল্লাহ বলেন, لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا 'যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাকে সাহায্য কর ও সম্মান প্রদর্শন কর; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর' *(ফাতহ ৪৮/৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ 'সুতরাং তাঁর (রাসূলের) প্রতি যারা ঈমান আনে তাকে সম্মান ও সাহায্য সহানুভূতি করে' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*।

মানব জাতির করণীয় হ'ল কুরআন ও সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, রাসূল (ছাঃ)-কে সম্মান প্রদান করা, এ বিষয়ে ইহূদী-খ্রীষ্টানদের ন্যায় বাড়াবাড়ি না করা, কবর পূজা না করা, মহান আল্লাহ তাঁকে যে শরী'আত দিয়েছেন সে শরী'আতের অনুসরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا 'রাসূলের আহ্বানকে তোমরা একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য কর না' *(নূর ২৪/৬৩)*। রাসূল (ছাঃ)-কে হে মুহাম্মাদ! হে আবাল কাসেম বলে ডাকা হত, এভাবে ডাকতে মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন; বরং সম্মানের সাথে ডাকতে বলা হয়েছে, যেমনটি করে ডাকলে তাঁর মান-মর্যাদা ঠিক থাকে, হে আল্লাহ্র রাসূল, হে আল্লাহ্র নবী।[৫৯]

ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্র প্রমাণ পাওয়া গেলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। সালাফে-ছালেহীনদের পথ ধরতে হবে, কোন মাযহাবী গুঁড়ামী চলবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রগামী হয়ো না' *(হুজুরাত ৪৯/১)*।

রাসূলের কণ্ঠস্বরের উপর কণ্ঠস্বর উঁচু করে কথা বলাও সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ 'তোমরা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না' *(হুজুরাত ৪৯/২)*।

সুধী পাঠক! এটাই হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) এর সাথে উত্তম আদব, রাসূলের সম্মান-মর্যাদা দেওয়া, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহ্র আদেশ মত চলা, তাঁর নিষেধকৃত কাজ-কর্ম থেকে দূরে থাকা। রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করা, তাঁর দেখানো পদ্ধতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে বেড়ে কোন কথা না বলা, যেটা যেভাবে বলা হয়েছে সেটা ঠিক সে-ভাবেই বলা, যেভাবে আদেশ করা হয়েছে ঠিক সে-ভাবেই পালন করা। মূলতঃ এগুলোই হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে প্রকৃত আদব এবং আদায়কৃত ওয়াজীব বিষয় সমূহ। এটাই হ'ল মানব জাতির ইহকাল ও পরকালে কল্যাণকামী বিষয়।[৬০]

(১৩) ব্যক্তির দ্বীন কমতে কমতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া কিংবা তার নিকটবর্তী হওয়া কুফরী থেকে অনেক উত্তম : আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ أَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلّٰهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ.

'তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। (এক) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হ'তে অধিক প্রিয় হওয়া (দুই) কাউকে একমাত্র

৫৭. বুখারী হা/১৬; মুসলিম হা/৪৩।
৫৮. আহমাদ হা/১৩১৭১; বুখারী হা/৩৬৮৮; মুসলিম হা/২৬৩৯; ইমাম বায়হাক্বী, আল-জামী লি শু'আবিল ঈমান ২/৫০১ পৃঃ।
৫৯. তাফসীর ইবনু কাছীর ১০/২৭৯ পৃঃ।
৬০. তাফসীর আস-সা'দী, পৃঃ ৭৯৯।

Contents

আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসা (তিন) কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার থেকে অধিক অপসন্দ করা’।[৬১]

(১৪) ইলম অন্বেষণ করা : মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ‘আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা আলেমগণ রয়েছেন, তারাই তাঁকে বেশী ভয় করে’ *(ফাতির ৩৫/২৮)*। তিনি আরো বলেন, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ‘আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয় তিনি ব্যতীত সত্য কোন মা‘বূদ নেই এবং ফেরেশতাগণ, ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্বানগণও (সাক্ষ্য প্রদান করেন)। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা‘বূদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়’ *(আল ইমরান ৩/১৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ‘আল্লাহ আপনার প্রতি গ্রন্থ ও বিজ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না, তিনি তাই আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অসীম করুণা রয়েছে’ *(নিসা ৪/১১৩)*।

মানব জাতি দুনিয়া ও পরকাল উভয় জীবনে কল্যাণ লাভ করবে, যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে, ইলম অর্জন করে ও রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে জীবন-যাপন করে। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন’ *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে যারা জ্ঞান রাখেন আর যারা জ্ঞান রাখেন না তারা কখনো সমান নয়। অনুরূপভাবে যারা কুরআন-সুন্নাহ বুঝে-শুনে আমল করে, আর যারা করে না তারাও কখনো সমান হ’তে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الْأَلْبَابِ ‘বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে’ *(যুমার ৩৯/৯)*। অতএব হে মানব জাতি! নিজে কুরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞানার্জন কর এবং সন্তান-সন্ততিদেরকেও শিক্ষা দাও।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا. ‘আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম উঠিয়ে নেন না। কিন্তু দ্বীনের আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার ভয় করি। যখন কোন আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মুর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা ফাতাওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে’।[৬২]

(১৫) ইলম প্রচার করা :

কুরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞান অর্জনকারীদের বসে থাকলে চলবে না। সর্বাগ্রে প্রথম নিজের জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, শিরক-বিদ‘আত ও সকল অন্যায়-অপকর্ম থেকে দূরে থাকতে হবে। এরপর দাওয়াতী কাজ শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে নিজের পরিবার থেকে সন্তান-সন্ততি, নিজের স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর সকলের মাঝে কুরআন-সুন্নাহ্‌র বাণী পৌঁছাতে হবে। আমলে বাস্তবায়নের প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে। নিজেকে, পরিবারকে, আত্মীয়-স্বজনকে ও এলাকা বাসীকে বাঁচাতে তাদের সকলের মাঝে দাওয়াতী কাজ করতে হবে। এমনি করে দেশবাসী সহ সারা বিশ্বে ইলম প্রচারের মহতী কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। ইলম প্রচারের ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে-ছালেহীনদের পথ অনুসরণ করতে হবে। নিজেদের মনগড়া কোন পথ-পদ্ধতির মাধ্যমে নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ ‘তোমরা নিশ্চয় এটা লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে (ইলম লোকদের মাঝে প্রচার-প্রসার করবে) এবং তা গোপন করবে না’ *(আল ইমরান ৩/১৮৭)*। অতএব আলেমগণের উচিৎ হবে তাদের নিকট যে কল্যাণকর জ্ঞান রয়েছে তা নিজে আমল করা, মানব জাতির মাঝে প্রচার করা, অন্যদের সৎআমল করার জন্য উৎসাহিত করা এবং এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান গোপন না রাখা।[৬৩]

সুধী পাঠক! মানুষকে আক্বীদা সংশোধনের দাওয়াত দেওয়া, শিরক-বিদ‘আত থেকে দূরে থাকার আহ্বান করা, সৎ আমল করার, অন্যায় থেকে বেঁচে থাকার, রাসূলের চরিত্র নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে সেদিকে ডাকা, হালাল ব্যবসা বাণিজ্য করার প্রতি জোরালো আহ্বান করা, সূদ-ঘুষ খাওয়া থেকে দূরে থাকার প্রতি আহ্বান করা। সর্বদা সত্য কথা বলা, মিথ্যা পরিহার করা, আমানাত রক্ষা করা, খিয়ানাত করা থেকে দুরে থাকা, জান্নাতের পথে ডাকা, জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার আহ্বান করা, সকল সৎ কর্মের দিকে, অন্যায় থেকে দূরে থাকার আহ্বান করা, ছাত্রদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহ্‌র সঠিক বুঝ দেওয়া, সালাফে-ছালেহীনদের পথ অনুসরণ করতে বলা ইত্যাদি ভাবে ইলম প্রচার করা ও দাওয়াতী কাজ করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ. ‘আর মুমিনদের এটাও সমীচীন নয় যে, (জিহাদের

৬১. আহমাদ হা/১২০০২; বুখারী হা/১৬; মুসলিম হা/৪৩।

৬২. আহমাদ হা/৬৫১১; বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩।

৬৩. ইবনু কাছীর ৩/২৯০।

জন্য) সবাই একত্রে বের হয়ে পড়ে, সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হ'তে এক একটি ছোট দল বহির্গত হয়, যাতে তারা ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে পারে, আর যাতে তারা নিজ সম্প্রদায়কে (নাফরমানী অন্যায় অপকর্ম হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা সতর্ক হয়' *(তওবা ৯/১২২)*।

সুধী পাঠক! একজন মানুষ জ্ঞানার্জন করে তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেলে তাদের মাঝে সে ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করতে পারবে, শিরক-বিদ'আত থেকে দূরে রাখতে পারবে, এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জানাতে পারবে, জান্নাতের সুসংবাদ দান করবে, জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে ভয় দেখাবে, ইসলামের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে পারবে।[৬৪] রাসূল (ছাঃ) মিনার খুৎবার ভাষণে বলেন,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

'তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর মর্যাদা সম্পন্ন। অতএব এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা (আমার এ বাণী) যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট আমার সব কথা পৌঁছে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে, যে এ বাণীকে তার চেয়ে অধিক আয়ত্তে রাখতে পারবে'।[৬৫]

মোদ্দাকথা, ইলম অর্জনে, জ্ঞান প্রচার-প্রসারে, আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতী কাজে সর্বপ্রথম নিয়ত বা ইখলাছ বিশুদ্ধ করতে হবে। এর নেকী আল্লাহ্‌র নিকট চাইতে হবে, মানুষকে দেখানোর জন্য নয়, মানুষের সন্তুষ্টির জন্য নয়, দ্বীনের খেদমত করে পরকালে নাজাতের জন্য এবং সর্বোপরী আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে যেতে হবে। যার প্রতিদান মহান আল্লাহ দিবেন। মহান আল্লাহ হূদ (আঃ) সম্পর্কে বলেন, يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর (দাওয়াতের) জন্য তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় শুধু তারই যিম্মায় রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তবুও কি তোমরা বুঝ না'? *(হূদ ১১/৫১)*। হূদ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আমি যে তোমাদের একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আহ্বান করছি, নছীহত করছি, কল্যাণের পথে ডাকছি, শিরক কাজ ছাড়তে বলছি, এর বিনিময় ছাওয়াব আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে। এ দাওয়াতী কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ও পরকালে নাজাতের জন্য করছি, আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য করছি। আর যাতে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল কল্যাণময় হয় এর জন্য কল্যাণের পথে ডাকছি। এর প্রতিদান তোমাদের নিকট চাই না। এর প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে যিনি তোমাদেরকে এবং আমাকে সৃষ্টি করেছেন।[৬৬]

(১৬) কুরআন মাজীদের সম্মান করা। নিজে শিক্ষা অর্জন করা এবং অপরকে শিক্ষাদান করা। এর মধ্যকার হুদূদ, হুকুম-আহকাম হিফয করা, তার মধ্যকার হারাম-হালাল বিষয়য়াদী শিক্ষা এবং আমল করা। এর ধারক-বাহকদের সম্মান করা, এর মধ্যে যে, মহান আল্লাহ জাহান্নামের শাস্তি উল্লেখ্য করেছেন তার ভয়ে ক্রন্দন করা এবং জান্নাত লাভের জন্য সৎ আমল করা : মহান আল্লাহ বলেন, لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ 'যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে' *(হাশর ৫৯/২১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ- فِي كِتَابٍ مَكْنُوْنٍ- لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ -تَنْزِيْلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, পূতঃ পবিত্ররা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এটা জগৎ সমূহের প্রতিপালকের নিকট হ'তে অবতীর্ণ' *(ওয়াক্বিয়াহ ৫৬/৭৭-৮০)*।

কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর উপর জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মানব জাতির জন্য ইহকালে ও পরকালে কল্যাণের পথ এবং নে'মতরাজি বর্ণিত হয়েছে। এটি মানুষকে অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। এর মধ্য মানব জাতির জীবনের চলার পথ নিহিত রয়েছে। অতএব কুরআন পড়তে হবে বুঝতে হবে, নিজে শিক্ষা অর্জন করে অপরকে শিক্ষা দিতে হবে। এর মধ্যকার হুকুম-আহকম, হালাল-হারাম, সকল বিষয় বুঝে-শুনে আমল করতে হবে। কারণ এর মধ্যেই উভয় জীবনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[৬৭] অতএর কুরআনের উপর বিশ্বাস করে, আল্লাহর উপর ঈমান এনে, রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করে, সালাফে-ছালেহীনদের পথ অনুসরণের মাধ্যমে উভয় জীবন সুখময় করতে হবে। এছাড়া নাফরমানি করলে কাঠিন শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا 'যদি কোন কুরআন এমন হত, যার দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ

৬৪. তাফসীর ইবনু কাছীর ৭/৩১৯ পৃঃ।
৬৫. আহমাদ হা/২০৩৮৭; বুখারী হা/৬৭; মুসলিম হা/১৬৭৯।
৬৬. তাফসীর ইবন কাছীর ৭/৪৪৭ পৃঃ।
৬৭. তাফসীর আস-সা'দী, পৃঃ ৮৩৬।

করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করত না' *(রা'দ ১৩/৩১)*।

ওছমান (রাঃ)-এর সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়'।[৬৮]

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَعَاهَدُوْا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِلِ فِى عُقُلِهَا 'তোমরা কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে (নিয়মিত তেলাওয়াত করবে)। আল্লাহ্র কসম! যার হাতে আমার জীবন, কুরআন বাঁধন ছাড়া উটের চেয়েও দ্রুত গতিতে দৌঁড়ে যায়'।[৬৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বিলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَحَاسُدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهْوَ يَتْلُوْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَهْوَ يَقُوْلُ لَوْ أُوتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِىَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهْوَ يُنْفِقُهُ فِى حَقِّهِ فَيَقُوْلُ لَوْ أُوتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِىَ عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ 'দু'টি বিষয় ব্যতীত হিংসা করা যায় না। এক ব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহ যাকে কুরআন দান করেছেন, আর সে দিনরাত তা তেলাওয়াত করে। (পড়ে ও বুঝে-শুনে সে অনুযায়ী আমল করে)। অন্য লোকটি বলে, এ লোকটিকে যা দেয়া হয়েছে, আমাকে যদি তেমন দেয়া হত, তাহলে আমিও তেমন করতাম, সে যেমন করছে। আরেক লোক হচ্ছে সে, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। ফলে সে তা যথাযথভাবে ব্যয় করছে। তখন অন্য লোক বলে, একে যা দেয়া হয়েছে, আমাকেও যদি তেমন দেয়া হত, আমিও তাই করতাম, যা সে করছে'।[৭০]

সালিম (রহঃ) তাঁর পিতা নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهْوَ يَتْلُوْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهْوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. 'একমাত্র দু'টি বিষয়েই হিংসা করা যায়। একজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, আর সে তা রাতদিন তেলাওয়াত করে। আরেক জন হ'ল, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আর সে রাতদিন তা ব্যয় করে'।[৭১] রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ 'এই কুরআন দ্বারাই মহান আল্লাহ এক জাতির মান-সম্মান বাড়িয়ে উপরে উঠিয়ে দেন এবং এর দ্বারাই অন্য জাতির মান-সম্মান কমিয়ে নীচে নামিয়ে দেন'।[৭২]

(১৭) পবিত্রতা অর্জন করা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 'তোমার পোশাক পবিত্র রাখ' *(মুদ্দাসসির ৭৪/৪)*। এখানে পোশাক বলতে উদ্দেশ্য হ'তে পারে, ব্যক্তি তার সমস্ত আমলই খালেছ নিয়তে পবিত্রতার সাথে পালন করবে। এর পরিপূর্ণতা হ'ল, মানব জাতি সমস্ত বাতিল আমল ও ফাসাদকারী আমল থেকে নিজের অন্তরকে পরিষ্কার রাখবে এবং পবিত্র রাখবে। ইসলাম ধ্বংসকারী শিরকী কাজকর্ম, নিফাক্বী ও লোক দেখানো আমল করা থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখবে। গৌরব, অহংকার এবং গাফেলতী থেকে দূরে থাকবে। আরো বেঁচে থাকবে ঐ সকল কাজকর্ম থেকে যে কর্মগুলো বান্দাকে মহান আল্লাহ্র ইবাদত করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। পরিধানের কাপড় পবিত্র রাখবে। বিশেষ করে ছালাত আদায়ের পূর্বে। কারণ ছালাতের পূর্বশর্ত হ'ল শরীর বা কাপড় পবিত্র করা। পবিত্রতা বলতে আরো বলা যায়, মানব জাতির শারঈ ওযূর মাধ্যমে অর্জন করবে। আর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অপবিত্র নাজাসাত থেকে নিজেকে পবিত্র রাখবে।[৭৩] মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ 'নিশ্চয় আল্লাহ (অন্তর থেকে খালেছ নিয়তে) তওবাকারী ও (দৈহিকভাবে) পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতের জন্য প্রস্তুত হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর' *(মায়েদা ৫/৬)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ 'পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কারু ছালাত কবুল হয় না এবং হারাম মালের ছাদাক্বা কবুল হয় না'।[৭৪] *(চলবে)*

[লেখক : এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব]

৬৮. আহমাদ হা/৪১২; বুখারী হা/৫০২৭।
৬৯. আহমাদ/১৯৫৪; বুখারী হা/৫০৩৩; মুসলিম হা/৭৯১।
৭০. আহমাদ হা/১০২১৪; বুখারী হা/৭৫২৮।
৭১. আহমাদ হা/৪৫৫০; বুখারী হা/৭৫২৯; মুসলিম হা/৮১৫।
৭২. মুসলিম হা/১৯৩৪; শু'আবিল ঈমান ৩/৩২৭।
৭৩. তাফসীর আস-সা'দী, পৃঃ ৮৯৫।
৭৪. আহমাদ হা/৫৪১৯; মুসলিম হা/২২৪।

ইসলামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম

ভূমিকা :

পৃথিবীতে মানুষ কতগুলো স্বতঃসিদ্ধ অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। দেশ-কাল, ভাষা-বর্ণ ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের জন্য সে অধিকারগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য। এই অধিকারগুলো এমনই একটি অলঙ্ঘনীয় বিষয় যে, একে হরণ কিংবা দলন করার অধিকার দুনিয়ার কোন শক্তির নেই। এই অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল 'বাক-স্বাধীনতা' বা 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ক্ষমতার মদমত্ত শাসক, নেতা-নেত্রী এবং বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা আল্লাহ প্রদত্ত মানবজাতির এই স্বীকৃত অধিকার অবলীলায় হরণ ও দলন করে চলেছে। অন্যদিকে বাক-স্বাধীনতার নামে চলছে বাক-স্বেচ্ছাচারিতা। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বর্তমান বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিষয়। ফলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমারেখা নিয়ে বিতর্কের ঝড় তোলা হচ্ছে ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায়। বাক-স্বাধীনতার নামে বাক-বিতণ্ডা ও দ্বন্দ-সংঘাত চলছে সভ্যতার প্রায় উষাকাল থেকেই। ব্যক্তির পদমর্যাদা, মানসম্মান নষ্ট করতেও কুণ্ঠাবোধ করছি না আমরা। বাক-স্বাধীনতার নামে চলছে গীবত, অপবাদের মত জঘন্য অপরাধ কার্যক্রম। অথচ বাক-স্বাধীনতা একটি জিজ্ঞাস্য বিষয়। বাক-স্বাধীনতার নামে আমরা যাই প্রকাশ করি না কেন, সে ব্যাপারে অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে পাকড়াও করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ 'তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হ'তে গ্রহণ করবেন। সুতরাং যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*।

মতপ্রকাশের অধিকার :

স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। একজন মানুষ যা বলতে চায়, তা বলতে দেয়া ব্যক্তিত্ব প্রকাশের চূড়ান্ত মাধ্যম। এটি সেই ব্যক্তির নাগরিকত্বের পূর্ণতার পূর্ণ স্বাক্ষর।[৭৫] রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতে, স্বাধীনতা অধিকার থেকে অবিচ্ছিন্ন। কারণ স্বাধীনতা ব্যতীত অধিকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকারের স্বরূপ হ'ল, সমাজ পরিপ্রেক্ষিত তা এমন হবে যে, প্রত্যেকটি নাগরিকই তথায় স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভার বাস্তব প্রকাশ ও বিকাশ দানের সুযোগ পাবে। এ পথে কোন প্রতিবন্ধকতা আসবে না।[৭৬] জাহেলী সমাজে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার ছিল অকল্পনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বাধীনতার পয়গাম নিয়ে এসে বিশ্ব সভ্যতাকে এহেন আস্তাকুঁড় থেকে উদ্ধার করেন। এমনিভাবে নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের চরম লক্ষ্যই ছিল ব্যক্তির মতামতের স্বাধীনতা।[৭৭] ইসলাম মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনিষ্টের বিপক্ষে এবং ভালর স্বপক্ষে ব্যক্তির বাক-স্বাধীনতার নিশ্চিত হওয়া অপরিহার্য বলে মনে করে।

ইসলামে বাক-স্বাধীনতার গুরুত্ব :

ইসলামে ব্যক্তির মত পোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মূলত ব্যক্তির মেধা, চিন্তা ও মানবিক প্রতিভার স্ফুরণের জন্য বাক-স্বাধীনতা থাকা একান্ত অপরিহার্য। মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে মুসলিমরা দ্বীনী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে না। অথচ ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা মুসলিম মাত্রই কর্তব্য। আর মতপোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতা থাকলেই এ কাজ বাস্তবায়িত হ'তে পারে। পবিত্র কুরআনে এ কাজের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং এ কাজকে মানুষের ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْعَصْرِ-إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ-إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. 'কালের শপথ। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়' *(আছর ১০৩/১-৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করে' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎকাজের

৭৫. Human Rights in Islam, Vol.xvii, p.241.

৭৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রীঃ), পৃঃ ২৮৬।

৭৭. মুহাম্মাদ শফীউদ্দীন, বিশ্বসভ্যতায় মহানবী (ছাঃ)-এর অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ১২ বর্ষ, ৭তম সংখ্যা, (ঢাকা : ই.ফা.বা, জুলাই, ৯৭ইং), পৃঃ ১৮৪-১৮৬।

নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে' *(তওবা ৯/৭১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আর্বিভূত করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ কর' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ 'তোমাদের কেউ গর্হিত কাজ হ'তে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগ) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (বাক্য) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে, তবে এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম স্তর'।[৭৮]

পারস্পরিক পরামর্শ বিধান :

পারস্পরিক পরামর্শ বিধানের ক্ষেত্রে অনেক মতামত লক্ষ্য করা যায় এবং পরিশেষে মঙ্গলজনক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে চিন্তা ও মতের স্বাধীনতা অপরিহার্য। বরং তা না থাকলে পারস্পরিক ইসলামী বিধান কার্যকর হওয়া অসম্ভব। রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবনে মতপোষণ ও প্রকাশের বাস্তব প্রয়োগ করে আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেছেন, যার ঐতিহাসিক ঘটনার কোন শেষ নেই। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে ছাহাবীদের মতপোষণ ও প্রকাশের ফলে রাসূল (ছাঃ) মাক্কী বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অথচ তিনি মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বের হননি। ওহুদ, আহযাবের যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে তিনি ছাহাবীদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং তাঁর নিকট যে মতটি অধিক যথার্থ ও সঠিক বিবেচিত হত, সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এই জন্য ইসলামে শূরা বা পরামর্শের গুরুত্ব অপরিসীম। আমীর, নেতা, নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সাংগঠনিক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিষয়ে সর্বদা মজলিসে শূরা বা যোগ্য পরামর্শকারী ও তাক্বওয়াশীলদের পরামর্শ নিবেন। এটাই আল্লাহ্র নির্দেশ। আর এটাই হ'ল বৈষয়িক বিষয়সমূহে ইসলামের বুনিয়াদী মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. 'আপনার কর্মকাণ্ডে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তার উপরে ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। পরামর্শ করে কাজ করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ 'তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, ছালাত কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শ মতে কাজ করে' *(শূরা ৪২/৩৮)*।

নেতৃত্ব নির্বাচন :

সমাজ পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব একটি অপরিহার্য বিষয়। মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত সমূহের অন্যতম সেরা নে'মত হ'ল নেতৃত্বের যোগ্যতা। এই যোগ্যতা ও গুণ সীমিত সংখ্যক লোকের মধ্যেই আল্লাহ দিয়ে থাকেন। বাকীরা তাদের অনুসরণ করে। নবী-রাসূলগণ ব্যতীত অন্য নেতাদেরকে আল্লাহ সরাসরি নিয়োগ করেন না। বরং বান্দাদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে যোগ্য, তাক্বওয়াশীল, আদর্শ ও আমানতদার ব্যক্তিদের একজন নেতা নির্বাচন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন এ বিষয়ে যে, তোমরা আমানত সমূহ যথাযোগ্য স্থানে সমর্পণ কর। আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার-ফায়ছালা করবে, তখন ন্যায় বিচার করবে' *(নিসা ৪/৫৮)*।

সুধী পাঠক! নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য এযাবৎ চারটি পন্থা দেখা গেছে। যথা-অছিয়ত বা নামকরণ ভিত্তিক, পরামর্শভিত্তিক, রাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক।[৭৯] প্রচলিত চারটি নির্বাচন পদ্ধতির প্রথম দু'টির সাথে ইসলামের সম্পর্ক স্বাভাবিক। পরামর্শভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে মতপোষণ ও প্রকাশের অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। যার বাস্তব শিক্ষা দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) আমাদের জন্য আদর্শ হিসাবে অবশিষ্ট রেখে গিয়েছেন। যদি ইসলামে মতপোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকত, তাহ'লে ইসলামের তৃতীয় খলীফা নির্বাচনে ওমর (রাঃ) বাধাপ্রাপ্ত হতেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইসলামে স্বীকৃত বলেই তিনি খলীফা নির্বাচনে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন এবং নিজের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে ওছমান (রাঃ)-কে খলীফা নির্বাচন করা হয়। সুতরাং সাংগঠনিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহ সকল ব্যবস্থায় নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে মতপ্রকাশের গুরুত্ব অত্যধিক।

মতপ্রকাশের মূলনীতি :

বাক-স্বাধীনতা ইসলাম স্বীকৃত অধিকার। এটি মানবাধিকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজ অবধি হেয়জ্ঞান করা হয়ে থাকে বাক-স্বাধীনতার মূলনীতিকে। নিম্নে মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা হ'ল।

---

৭৮. মুসলিম হা/১৮৬; মিশকাত হা/৫১৩৭; মুসনাদে আহমাদ হা/১১৪৭৮।

৭৯. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃঃ ২৩।

মূলনীতি-১ : আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-কে সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব এবং রাসূল (ছাঃ)-কে একমাত্র আর্দশ এবং পথ প্রদর্শনকারী হিসাবে গ্রহণ করে, সে কখনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্তের চেয়ে নিজের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিতে পারে না। এটা ঈমানের প্রাথমিক ও মৌলিক দাবী। এর ব্যত্যয় ঘটলে নিজেকে মুমিন বা মুসলিম হিসাবে দাবী করার কোন পথ অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে অগ্রগামী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(হুজুরাত ৪৯/১)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এর অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী কোন বক্তব্য পেশ না করা'।[৮০]

মূলনীতি-২ : ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বিরোধী না হওয়া।

মত প্রকাশের অধিকার ভোগ করার সময় ইসলামের মৌলিক বিধান, আক্বীদা বা বিশ্বাসের বিরোধীতা করা যাবে না। ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস ও জীবনাদর্শের সমালোচনা করা যাবে না এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ইসলামী আদর্শের বিকৃতরূপ প্রচার ও প্রসার করার অধিকারও কাউকে দেওয়া যেতে পারে না। কেননা এ কাজ মুসলিমকে নাস্তিক বা মুরতাদে রূপান্তরিত করে। আর অমুসলিমের জন্য বাক-সন্ত্রাসের পথ সুগম করে। 'ফ্রীডম অফ এক্সপ্রেশন', 'ফ্রীডম অফ স্পীচ', তথা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতার নাম করে পশ্চিমা বিশ্ব আজ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি আঘাত হানতে শুরু করেছে। বিশেষতঃ নাইন-ইলেভেনের পর থেকে ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণার অপতৎপরতা চালাচ্ছে কিছু পশ্চিমা মিডিয়া। উদাহরণ স্বরূপ :

(এক) 'শার্লি এবাদো' নামক কুরুচিপূর্ণ ম্যাগাজিনের কথা। শুধু 'শার্লি এবাদো' নয়, শার্লি এবাদোর পূর্বে ডেনমার্ক সহ বেশ কয়েকটি দেশের পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। আর তাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদ যুগিয়েছে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব।[৮১]

(দুই) পশ্চিমা বিশ্বের ন্যায় বর্তমানে বাংলাদেশেও পশ্চিমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী একটি নির্দিষ্ট আদর্শিক শ্রেণীর ব্লগার ব্যাঙের ছাতার ন্যায় প্রকাশ পেয়েছে, যারা তথাকথিত মুক্তচিন্তা-মুক্তবুদ্ধি ও নাস্তিকতার নামে প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর মান-মর্যাদার অবমাননা করে এবং জঘন্য ইসলামবিদ্বেষী আচরণের মাধ্যমে তাওহীদী জনতার ধর্মীয় অনুভূতিতে তীব্রভাবে আঘাত করেছে। একজন মুসলিমের নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসার স্থানটি পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে পবিত্র। আর সেই মহা শ্রদ্ধার মানুষটাকে যখন কেউ হাসির পাত্র হিসাবে উপস্থাপন করে, তখন মুসলিমের অন্তরে কিভাবে তা দগ্ধ করে! কতটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়! কিভাবে বিষফোড়ার মত যন্ত্রণা করে! বাক-স্বাধীনতার ফেরিওয়ালা বা মুক্তমনা ধ্বজাধারীরা কী সেটা বোঝে না? সবাইকে মনে রাখতে হবে, সীমাহীন মতপ্রকাশ ও বাক-স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। অন্যের ধর্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধকে ক্রমাগত আঘাত বা কটাক্ষ করে উস্কানিমূলক বর্ণবাদী বক্তব্য, লেখালেখি ও ব্লগিং-কোনভাবেই স্বীকৃত বাক-স্বাধীনতার আওতায় পড়ে না। উপরন্তু এগুলো বাকসন্ত্রাস বৈ কিছু নয়।

মূলনীতি-৩ : ইসলামের নৈতিক নিয়ম-নীতিকে পূর্ণমাত্রায় বহাল রাখা :

ইসলামের নৈতিক নিয়ম-নীতিকে পূর্ণমাত্রায় বহাল রাখতে হবে। কোনক্রমেই তা লংঘন করা যাবে না। বাক-স্বাধীনতার নামে কেউ কাউকে কটুবাক্য বলা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস, তুচ্ছ জ্ঞান করা, দোষারোপ, পরনিন্দা, বিকৃত বা পিড়াদায়ক নামে কাউকে আহ্বান, নিকৃষ্ট অনুমান, ছিদ্রান্বেষণ, গীবত, বদনাম, তোহমত প্রদান এবং সমালোচনা করতে পারবে না। কেননা এরূপ করার স্বাধীনতা দেয়ার অর্থ মত প্রকাশের স্বাধীনতা নয়। আধুনিক বিশ্বে বাক-স্বাধীনতার নামে চলছে অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্বের দাম্ভিকতা। একদিকে তন্ত্রমন্ত্রের নিকৃষ্ট নর্দমায় নেমে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি আর বাক-স্বাধীনতার নামে বাক-স্বেচ্ছাচারিতা লালন করছি। রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ, বিবৃতি ও টকশোগুলো পর্যালোচনা করলে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

অন্যদিকে আমরা বাক-স্বাধীনতার দোহায় দিয়ে ইসলামের নামে অন্য মুসলিম ভাইকে দোষারোপ করা, তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা প্রচার করা ও গীবত-তোহমত করার মত ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যস্ত রয়েছি। ইসলামী দলগুলো আবার মতপ্রকাশের নামে তন্ত্রমন্ত্রের ন্যায় দলাদলির নোংরা খেলায় মেতে উঠেছে। লেখনি বা বক্তব্য-বিবৃতিতে মতামত ব্যক্ত করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিচ্ছে হিংসা-বিদ্বেষ। আর ব্যক্তি বিদ্বেষ ক্ষত-বিক্ষত করছে মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের সুদৃঢ় বন্ধনকে। আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পরিণত হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী শত্রুতায়। ফলে ভাল কথা ও কাজ সবই প্রতিপক্ষের মানদণ্ডে নিরুপিত হয়ে থাকে। যা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চরম দুঃখজনক পরিণতি।

সুধী পাঠক! বাক-স্বাধীনতার বিকৃতরূপ বাক-স্বেচ্ছাচারি নামক ভাইরাস সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষফোড়ার রূপ ধারণ করেছে। এই বিষাক্ত ভাইরাস শুধু আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে না, বরং পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থাকেও বিনাশ করেছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট অপ্রিয় সত্যকে উন্মোচিত করছে। এই বিষবৃক্ষ মুসলিম সমাজে সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও বিচলিত করেছিল এই সংক্রামক রোগের বিষ। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

'যখন মা আয়েশা (রাঃ)-কে যেনার মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছিল। মুনাফিকদের প্রচারণা এবং দীর্ঘদিন অপেক্ষার

৮০. তাফসীরে তাবারী ২২/২৭২ পৃঃ।
৮১. মাসিক আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী ২০১৫, পৃঃ ২৭।

পরেও এবিষয়ে কোন অহী অবতরণ না হওয়ায় তিনি কয়েকজন ছাহাবীকে ডেকে পরামর্শ চাইলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর জামাই আলী (রাঃ) পরামর্শ দিলেন তাঁকে (মা আয়েশা রাঃ-কে) ত্বালাক্ব দেওয়ার জন্য। রাসূল (ছাঃ) চুপ থাকলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অব্যাহত কুৎসা রটনায় মনোকষ্ট দূর করার জন্য রাসূল (ছাঃ) একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করলেন। তখন আউস গোত্রের উসায়েদ বিন হুযায়ের (রাঃ) তাঁকে হত্যা করার অভিমত ব্যক্ত করলেন। একথা শুনে খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহর মধ্যে গোত্রীয় উত্তেজনা জেগে ওঠে। ফলে মসজিদে উপস্থিত উভয় গোত্রের লোকদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়ে যায়। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে থামিয়ে দেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর আয়েশা (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন, কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে যে আদর-যত্ন, ভালবাসা ও সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার কথা ছিল, তা না পাওয়ায় তিনি মনে মনে কিছুটা অশান্তিবোধ করতে থাকেন। আয়েশা (রাঃ) যখন অপবাদের কথা জানতে পারলেন তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। দুই রাত ও একদিন নির্ঘুম কাটান ও অবিরতধারায় কাঁদতে থাকেন। এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিকটে এসে তাশাহহুদ পাঠ করে বললেন, يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ 'হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে কিছু বাজে কথা আমার কানে এসেছে। যদি তুমি নির্দোষ হও, তবে সত্বর আল্লাহ তোমাকে দোষমুক্ত করবেন। আর যদি তুমি পাপকর্মে জড়িয়ে থাক, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তওবা কর। কেননা বান্দা যখন দোষ স্বীকার করে ও আল্লাহ্র নিকট তওবা করে, তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন'।[৮২] রাসূল (ছাঃ)-এর জবাবে আয়েশা (রাঃ) বলেন,

وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي فَوَاللَّهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.

'আল্লাহ্র কসম! যে কথা আপনারা শ্রবণ করেছেন ও আপনাদের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে এবং যাকে আপনারা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, এক্ষণে আমি যদি বলি যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ, তবুও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি বিষয়টি স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ জানেন যে, আমি এ ব্যাপারে নির্দোষ, তাহ'লে আপনারা সেটাকে বিশ্বাস করে নিবেন। এমতাবস্থায় আমার ও আপনার মধ্যে ঐ উদাহরণটাই প্রযোজ্য হবে, যা ইউসুফ (আঃ) পিতা ইয়াকূব (আঃ) বলেছিলেন, 'অতএব ধৈর্যধারণ করাই উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য কাম্য, সেসব বিষয়ে যা তোমরা বলছ *(ইউসুফ ১২/১৮)*'।[৮৩] অবশেষে আল্লাহ তা'আলা অহি-র মাধ্যমে আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতার ঘোষণা প্রদান করে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করেন *(নূর ২৪/১১-২০)*।

সুধী পাঠক! ইফকের ঘটনায় কুরআনের আয়াত নাযিলের ফলে সমাজে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে। কিন্তু বর্তমান সমাজে অহি নাযিল বন্ধ। তাই বাক-স্বাধীনতার নামে আমরা যদি ইসলামের দিক-নির্দেশনা বহির্ভূত কার্যক্রম পরিচালনা করি তাহ'লে সমাজ কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সমাজ জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে। একটি বিষয় অবশ্যই স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, আমাদের উপর যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ফরয তেমনিভাবে ঠাট্টা, পরনিন্দা, খারাপ ধারণা, গোপন বিষয় তালাশ করা, গীবত করা, অপবাদ প্রদান করাও হারাম। অথচ বর্তমানে সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নির্দেশেই মূলতঃ অবলিলাক্রমে এই কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠনে বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, মুসলিম ভাইদের সম্মান-মর্যাদা বিনষ্ট হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এইগুলো থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'হে মুমিনগণ! কোন সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হ'তে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরা যেন অন্য নারীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হ'তে পারে তারা বিদ্রূপকারিনীদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না, একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর (ঈমানের আগে কৃত অপরাধকে যা মনে করিয়ে দেয় সেই) মন্দ নাম কতই না মন্দ! (এ সব হ'তে) যারা তওবা না করে তারাই যালিম'। 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। কতক ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা অন্যের দোষ খোজাখুঁজি করো না, একে অন্যের অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করবে? তোমরা তো সেটাকে ঘৃণাই করে থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশি তওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১১-১২)*।

মূলনীতি-৪ : মতামত প্রকাশ করে বীরত্ব-বাহাদুরী এবং যিদ ও অহংকার জাহির না করা :

ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করে বীরত্ব, বাহাদুরী ও অন্যকে হীন প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালানো যাবে না। আবার নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কোন রকম যিদ-হটকারী বা অহংকার

৮২. বুখারী হা/৩৮২৬ (তাঃ প্রঃ হা/৪১৪১)।

৮৩. বুখারী হা/৩৮২৬ (তাঃ প্রঃ হা/৪১৪১)।

করা যাবে না। আধুনিক সভ্যতার শতাব্দীতে বাক-স্বাধীনতার বাগাড়ম্বরের পিছনে থাকে নিকৃষ্ট মানুসিকতা, থাকে বীরবর ও পৌরুষ প্রকাশের অপচেষ্টা। যেমনটা ছিল জাহেলী সমাজের মানুষদের মধ্যে। তারা যখন কথা বলত বীরত্ব প্রকাশ করাই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। আর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অহংকারে স্ফীত হয়ে জনসাধারণের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দিত। উদাহরণস্বরূপ :

(এক) ইয়ামান থেকে গণীমতের মাল আসলে রাসূল (ছাঃ) তা বণ্টন করতে থাকেন। এমতাবস্থায় বনী তামীম গোত্রের যুল খুওয়াইছিরা নামে এক ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলে, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন, আপনি ইনছাফ করুন! রাসূল (ছাঃ) বলেন, ধিক তোমাকে! আমিই যদি ইনছাফ না করি তবে কে ইনছাফ করবে'?[৮৪]

(দুই) উচ্চ কণ্ঠস্বরে কথা বলা মানব চরিত্রের অপ্রীতিকর আচরণের পরিচায়ক। এটি প্রথমতঃ শিষ্টাচার বিরোধী, উপরন্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বনু তামীমের এক প্রতিনিধিদল রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মদিনায় এসেছিল। উক্ত দলে কিছু মূর্খ লোক ছিল। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর হুজরার পিছন থেকে ডাকাডাকি শুরু করল, হে মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ (يا محمد، يا محمد)।[৮৫] মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে এভাবে অমার্জিত ভাষায় ডাকাডাকি করা পসন্দ করেননি। সম্মানি মানুষদের সাথে কথা বলার সময় কিভাবে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে হয়, তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উচ্চ করো না। তোমরা নিজেরা পরস্পরে যেমন উচ্চ আওয়াজে কথা বল, তাঁর সঙ্গে সে রকম উচ্চ আওয়াজে কথা বলো না। তা করলে তোমাদের (যাবতীয়) কাজকর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে, আর তোমরা একটু টেরও পাবে না। যারা তোমাকে হুজরার বাইরে থেকে (উচ্চৈঃস্বরে) ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ' *(হুজুরাত ৪৯/২-৪)*।

মূলনীতি-৫ : মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সৎ ইচ্ছা ও কল্যাণ কামনা উদ্দেশ্য থাকা :

মতামতের মূলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা এবং কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এ অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। দ্বীনী সিদ্ধান্ত ব্যতীত বৈষয়িক ক্ষেত্রে যা কল্যাণকর এবং সামাজিক শান্তি আনয়ন করবে, সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। সমাজ-রাষ্ট্রের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত কোন সিদ্ধান্তে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে ইসলাম এই শিক্ষা কখনো প্রদান করেনি। স্বার্থের বশবর্তী হয়ে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অকল্যাণের অভিলাষ করি এবং সেই মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করি, যার ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে সংস্কার করার জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত পরামর্শ ভিত্তিক হ'তে হবে এবং কল্যাণকর মতামত পোষণকারীর উপর সহিষ্ণু মনোভাব পোষণ করতে হবে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ (ছাঃ) বৈষয়িক ক্ষেত্রে মানবতার কল্যাণের জন্য, সমাজের শান্তির জন্য নিজের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে লজ্জাবোধ ও অপমানবোধ করেননি। মদীনায় হিজরত করার পরে লোকদের যখন দেখলেন যে, তারা পুং খেজুর গাছের কেশর মাদী খেজুর গাছের কেশরে লাগাচ্ছে, তখন তিনি এটাকে অপসন্দ করলেন। তখন লোকেরা এটা পরিত্যাগ করল। ফলে খেজুরের ফলন কমে গেল। তখন লোকেরা রাসূলের নিকটে অভিযোগ পেশ করলে তিনি বললে, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْىٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ 'আমি তোমাদের মত একজন মানুষ। আমি যখন দ্বীনী বিষয়ে তোমাদের কোন নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা গ্রহণ কর। আর যখন (বৈষয়িক ব্যাপারে) আমার নিজের মত অনুযায়ী কোন নির্দেশ দেই, তখন আমি একজন মানুষ মাত্র (অতএব তাতে আমার ভুল হ'তে পারে)'।[৮৬]

বাক-স্বেচ্ছাচারীর পরিণাম :

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে মতপোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। পাশাপাশি বাক-স্বাধীনতার চৌহদ্দি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রতিটি জিনিসের একটি প্রান্তভাগ থাকে, যদি কেউ সেই প্রান্তসীমা অতিক্রম করে তাহ'লে তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ পরিণাম। তাই কেউ যদি বাক-স্বাধীনতার নামে ইসলামী মূলনীতির বাইরে বাক-স্বৈরচারী বা যথেচ্ছাচার হয় তাহ'লে তাদের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। দুনিয়াতে ও আখেরাতে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে। ক্বিয়ামত দিবসে তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসে তাদের মুখে সীল মোহর লাগিয়ে দিবেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এই সম্পর্কে বার বার সর্তক করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'আজ আমি তাদের মুখে সীল মোহর লাগিয়ে দেব, তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে, আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তাদের পাগুলো সাক্ষ্য দিবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*।

৮৪. বুখারী হা/৭৪৩২।
৮৫. তাফসীর ইবন কাছীর ৭/৩৬৯; তুহফাতুল আহওয়াযী ৯/১০৯ পৃঃ।
৮৬. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪০, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ‘আর তোমরা অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত আছ যেমন তারা অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত ছিল। এরাই হ’ল তারা দুনিয়া ও আখেরাতে যাদের কাজ-কর্ম নিস্ফল হয়ে গেছে, আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত’ *(তওবা ৯/৬৯)*। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ‘সেদিন যখন আসবে তখন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ মুখ খুলতে পারবে না, তাদের কেউ হবে হতভাগা, আর কেউ হবে সৌভাগ্যবান’ *(হূদ ১১/১০৫)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ

‘নিশ্চয় বান্দা কখনও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোন কথা বলে অথচ সে কথা সম্পর্কে তার চেতনা নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা কখনও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কথা বলে যার পরিণতি সম্পর্কে তার ধারণা নেই, অথচ উক্ত কথার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে’।[৮৭] রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, নিশ্চয় বান্দা পরিণাম চিন্তা ব্যতিরেকেই এমন কথা বলে, যে কথার কারণে সে ঢুকে যাবে জাহান্নামের এমন গভীরে, যার দূরত্ব পূর্ব (পশ্চিম)-এর দূরত্বের চেয়েও বেশি’।[৮৮]

আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় :

মতপোষণ ও প্রকাশ (লেখনী, বক্তব্য ও পারস্পরিক কথাবার্তার মাধ্যমে) করার সময় আমাদেরকে উপরিউক্ত মূলনীতিসমূহের অনুসরণ করতে হবে। পাশাপাশি আমাদেরকে দু’টি কাজ অবশ্যই পালন করতে হবে।

(১) অনর্থক কথা এবং বাক-স্বেচ্ছাচারীদের বর্জন করা : এটা মুমিনদের অন্যতম গুণাবলী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ‘যারা অসার (অনর্থক) কথাবার্তা এড়িয়ে চলে’ *(মুমিনূন ২৩/৩)*। তিনি আরও বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ‘তারা যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫)*। তাছারা রাসূল (ছাঃ) অনর্থক কথা বলতে নিষেধ করে বলেন।[৮৯]

(২) ভাল বা ন্যায়সঙ্গত কথা বলা : আমরা যখন কথা বলব তখন আমাদেরকে অবশ্যই ভাল বা ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে হবে অথবা চুপ থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে নতুবা চুপ থাকে’।[৯০] তবে ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত মতপোষণ ও প্রকাশের মাঝে প্রবল মনোবল, সৎসাহস বর্তমান থাকা আবশ্যক। অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শাসক বা নেতৃত্বস্থানীয়দের ব্যাপারে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নির্ভীক হ’তে হবে। ছাহাবীরা হক্ব কথা বলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভীক ছিলেন। যেমন :

(এক) মু‘আবিয়াহ (রাঃ) যখন এক ছা‘ খেজুরের পরিবর্তে অর্ধ ছা‘ গম (ফিতরার জন্য) নির্ধারণ করেন, তখন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বিরোধিতা করেন এবং বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সময় যেভাবে এক ছা‘ খেজুর বা শুকনা আঙ্গুর বা যব বা পনির দিতাম, এখনো আমি সে পরিমাণই দিব’।[৯১]

(দুই) মারওয়ান ঈদের দিন (মারওয়ানের খেলাফতের সময়) ছালাতের পূর্বে খুৎবা দেয়ার (বিদ‘আতী) প্রথা প্রচলন করলে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) প্রতিবাদ করেন এবং ঈদের মাঠ ত্যাগ করেন।[৯২] তাছাড়া ভয়, ত্রাস ও শংকা মানুষকে তার স্বাধীন মত প্রকাশ থেকে বিরত রাখে, সুযোগ হ’লেও কোন কথাই বলতে দেয় না। কিন্তু ইসলামে এই সুযোগ নেই। এমনকি প্রজার সামনে সামান্য ত্রুটি পরিলক্ষিত হ’লে সে ব্যাপারে সে মতপোষণ ও প্রকাশ করতে পারে ভুল সংশোধন করার জন্য। তবে বিদ্রোহের জন্য নয়। ওমর (রাঃ)-এর জামা লম্বার ব্যাপারে প্রজার মতামত ব্যক্ত করা যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

উপসংহার :

অতএব আমাদের উচিত বাক-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাক-স্বেচ্ছাচারীতা না করা। যদি আমরা ইসলামী মূলনীতির আলোকে মতপ্রকাশ করি তাহ’লে আমাদের থাকার স্থান হবে জান্নাত, যার দায়িত্বভার রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং নিজে গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ‘যে ব্যক্তি তার দু’চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দু’রানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হেফাযত করবে, আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার’।[৯৩] আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!!

[লেখক : এম.এ; ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী]

৮৭. বুখারী হা/৫৯৯৭ (তাঃ প্রঃ হা/৬৪৭৩); মুসলিম হা/২৯৮৮।
৮৮. বুখারী হা/৫৯৯৬ (তাঃ প্রঃ হা/ /৬৪৭৭)।
৮৯. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ -বুখারী হা/৫৯৯২ (তাঃ প্রঃ হা/৬৪৭৩)।
৯০. বুখারী হা/৫৯৯৪ (তাঃ প্রঃ হা/৬৪৭৫)।
৯১. মুসলিম হা/১৬৪৪।
৯২. মুসলিম হা/৭০।
৯৩. বুখারী হা/৫৯৯৩ (তাঃ প্রঃ হা/৬৪৭৪)।

সাতক্ষীরা যেলার কিছু মাযার ও খানকা

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

*['তাওহীদের ডাক'-এর 'সরেযমীন প্রতিবেদন' কলামে বাংলাদেশের সামাজিক পরিমণ্ডলে জেঁকে বসা নানা ইসলামবিরোধী কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ, বিশেষ করে মাযার-খানকা-দরবারে সংঘটিত শিরকী কর্মতৎপরতার উপর প্রামাণ্য প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ। পর্যায়ক্রমে খৃষ্টান মিশনারী কার্যক্রম, শী'আ ও কাদিয়ানীদের সম্পর্কেও প্রতিবেদন উপস্থাপিত হবে। যাতে এসবের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে ওঠে। এবারের প্রতিবেদনে দক্ষিণাঞ্চলের সাতক্ষীরা যেলার কিছু মাযার ও খানকা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কিছু অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা হ'ল। প্রতিবেদনটি তৈরী করেছেন **'তাওহীদের ডাক'**-এর সহকারী সম্পাদক বযলুর রহমান ও সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান]*

প্রসঙ্গকথা :

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এদেশের মোট জনসংখ্যার ৯০ ভাগ জনগণ মুসলিম। তাছাড়া বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের এক সম্ভাবনাময়, উন্নয়নশীল ও মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র। ভৌগলিক দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান আরব দেশ হতে অনেক দূরে হলেও ইসলামের প্রথম যুগেই এদেশে ইসলামের আগমন ঘটে।[৯৪] প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামের স্বচ্ছ জীবনধারা, নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক ধর্মীয় বিশ্বাস, আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত নীতিমালার পূর্ণ রূপ ছিল ইসলাম ধর্মের মৌলিকত্ব। কিন্তু কালের আবর্তে একশ্রেণীর ভণ্ড লোকেরা, প্রতারনাকারী ছূফী বিশ্বাসীদের হিংস্রতা, সাধারণ জনগণের জ্ঞানের স্বল্পতা, ইহূদী-খ্রীষ্টান চক্রের থিওরি, ভ্রান্ত আক্বীদার ভয়াবহতা, কতিপয় মুসলিম রাজন্যবর্গের বিলাসিতা ও আপোষকামিতা এবং কুচক্রি শী'আদের অতি চালাকির কারণে বিশ্বব্যাপী ইসলাম নানারূপে উপস্থাপিত হতে থাকে। ফলে বিপাকে পড়ে যায় দেশের হিন্দু ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্যাতিত অশিক্ষিত জনগণ। যার নিকট যেভাবে পেয়েছে তারা সেভাবেই ইসলামকে গ্রহণ করেছে। কেউ পেয়েছে মাযহাবী ইসলাম, কেউ পেয়েছে পীর-মুরীদীর ভ্রান্ত তরীকা, কেউ পেয়েছে মীলাদ-ক্বিয়াম, শবেবরাত, শবে মে'রাজ, ঈদে মীলাদুন্নবী, ফরয ছালাতের পর দলবদ্ধ মুনাজাত প্রভৃতির মত জঘন্য বিদ'আতী ইসলাম, কেউ পেয়েছে শী'আ ইসলাম, কেউ মাযার ও খানকা ভিত্তিক ইসলাম, কেউ পেয়েছে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ইসলাম, কেউ পেয়েছে চরমপন্থী ইসলাম। আবার কেউ পেয়েছে পিওর ইসলাম। নানারূপ ও নানা আক্বীদার মানুষ কর্তৃক প্রচারিত 'চূর্ণ-বিচূর্ণ ইসলাম' পেয়ে হিন্দু রাজাদের অক্টোপাস থেকে রক্ষার জন্য যাচাই-বাছাই না করে মানুষেরা অকপটচিত্তে তা গ্রহণ করে। অতঃপর কূটচাল ও শয়তানী চেতনার খোরাকে পরিণত হয় সাধারণ জনগণ। তাদের নিকট যা উপস্থাপন করা হয় তাই তারা গোগ্রাসে গিলে নেয়। এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করে ইহূদী-খ্রীষ্টান চক্র ও ভ্রান্ত আক্বীদাপুষ্ট তথাকথিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ। ফলে দেশের যেলায় যেলায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন শিরকী স্থাপনা ও বিদ'আতী কারখানা। গড়ে ওঠে পাগলা বাবার আস্তানা, ন্যাংটা বাবার দরগা নামে নানাবিধ শিরকের উৎপাদনক্ষেত্র। মাযার-খানকা-দরবার প্রভৃতি নামে গড়ে ওঠে জমজমাট ব্যবসাকেন্দ্র। যেখানে রোগমুক্তির নামে, মনের আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে, পাপ মোচনের আশায়, পরকালে মুক্তির জন্য পীরের অসীলার ভরসায় মানুষ লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি টাকা প্রদান করে। বড় বড় মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী, ডিম, ডাব, ব্যবসায়ের প্রথম মাল প্রভৃতি মানত হিসাবে প্রদান করে থাকে। মৃত পীরের কবরে সেজদায় লুটে পড়ে, দু'হাত তোলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পাপ মোচনের আশায়, মাযারের কোন স্থানের মাটি, পানি প্রভৃতি নিয়ে সারা শরীরে মালিশ করে বরকত মনে করে ইত্যাদি। অথচ ইসলামে এগুলো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এটি জঘন্যতম শিরকীকর্ম। যার পরিণাম নিশ্চিত জাহান্নাম।

আমরা সাতক্ষীরা যেলার কিছু শিরকী আড্ডাখানায় গিয়ে স্বচক্ষে মানুষের আপত্তিকর কর্মকাণ্ড দেখেছি। বোঝার চেষ্টা করেছি কীভাবে ও কেন তারা নিজেদেরকে এমন পথভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করছে এবং কীভাবে তাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনা যায়।

সাতক্ষীরা যেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ও পশ্চিমবঙ্গের সাথে একমাত্র সীমান্তবর্তী যেলা। খুলনা বিভাগের অন্যতম যেলা হ'ল সাতক্ষীরা। এই যেলার আয়তন ৩৮১৭.২৯ কি.মি। এটি বঙ্গোপসাগরের উত্তরে অবস্থিত। ২০১৩ সালের তথ্যানুযায়ী এই যেলার জনসংখ্যা ২০,৭৯,৮৮৪ জন। যার মধ্যে পুরুষ ১০,০৪,৪১৫ জন, আর মহিলা ৯,০৪৫,২৩৪ জন। মোট জনসংখ্যার ৭৮.০৮% মুসলিম, ২১.৪৫% হিন্দু, ০.০২৮% খ্রীষ্টান, ০.০১% বৌদ্ধ এবং ০.১৮% অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।[৯৫]

৯৪. আজিজুল হক বান্না, বরিশালে ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৪ খ্রিঃ), পৃঃ ৭১।

৯৫. উইকিপিডিয়া/সাতক্ষীরা।

Contents

প্রায় ৮০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত যেলা হওয়া সত্ত্বেও কালের আবর্তনে সাতক্ষীরা যেলায় অসংখ্য মাযার, খানকা ও দরগা গড়ে উঠেছে। যেখানে মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণার্থে গমন করে থাকে। এমনকি সেখানে অন্য ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে হিন্দুরাও যায় পূজা করতে। নিম্নে সাতক্ষীরা যেলায় গড়ে ওঠা গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক মানুষের যাতায়াত রয়েছে এমন কিছু মাযার, খানকা ও দরগার উপর সরেযমীন প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হল :

নলতা মাযার শরীফ

গত ৩০ সেপ্টেম্বর, রোজ বুধবার সকাল ৮ টায় মোটর সাইকেলযোগে আমরা 'নলতা মাযার শরীফ'-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে উঁচু-নীচু ভাঙ্গা রাস্তা মাড়িয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা যাত্রার পর আমরা সেখানে পৌঁছাই। তবে পাঠকদের সুবিধার জন্য প্রারম্ভেই 'নলতা মাযার শরীফ'-এর পরিচয় প্রদান সমীচীন বলে মনে করি।

'নলতা মাযার শরীফ'-এর পরিচয় :

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ থানা সাতক্ষীরা যেলার কালীগঞ্জ উপযেলার 'নলতা' একটি প্রসিদ্ধ এলাকা। সাতক্ষীরা-কালীগঞ্জ সড়কের পার্শ্ববর্তী নলতা বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত 'নলতা মাযার শরীফ'। দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের সাবেক সহকারী পরিচালক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও সমাজ সংস্কারক খানবাহাদুর আহছানুল্লাহ-এর মাযার এখানে অবস্থিত। মূলতঃ এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী খানবাহাদুর আহছানুল্লাহ (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর তার কবর কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে 'নলতা মাযার শরীফ'। অথচ মাযারের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁর পথভ্রষ্ট ভক্তদের কল্যাণে তিনি আজ পরিণত হয়েছেন পীরে কেবলা সুলতানুল আওলিয়া কুতুবুল আকত্বাব গওছে যামান আরেফ বিল্লাহ হযরত শাহ সুফী আলহাজ্জ খানবাহাদুর আহছানুল্লা (এম.এ; এম.আর.এস.এ; আই.ই.এস)! নলতা মাযার শরীফে যে সমস্ত কার্যক্রম হয়ে থাকে নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হ'ল :

(ক) ওরস শরীফ : ওরস শরীফ উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাযার হাযার ভক্ত, মুরীদ, গুণগ্রাহীগণ সেখানে উপস্থিত হন। বিগত দিনের যাবতীয় পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য যদি পীর ছাহেবের একটু সুপারিশ পাওয়া যায়। মনের কাকুতি-মিনতি পেশ করা যায়। উপাসনার নৈবেদ্য উপস্থাপন করা যায়। উক্ত মাযারে প্রতি বছর বাংলা ২৬ শে মাঘ অর্থাৎ ৯ই ফেব্রুয়ারী (পীর ছাহেবের মৃত্যুদিনে) তিনদিন ব্যাপী 'ওরছ শরীফ' অনুষ্ঠিত হয়। ওরছ শুরু হওয়ার পূর্বের দিন থেকে শেষ হওয়ার পরের দু'দিন পর্যন্ত সর্বদা সেখানে ১২ থেকে ১৫ হাযার মানুষ অবস্থান করে থাকে। ওরছ চলাকালীন সেখানে বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পন্ন হয়। সকালে কুরআন খতম করা হয়, মীলাদ, ক্বিয়াম হয়ে থাকে। পর্যায়ক্রমে গযল, পীর ছাহেবের গ্রন্থ পাঠ, বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য, পীর ছাহেবের জীবনী ও কেরামতের উপর আলোচনা, নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর আলোচনা ও সবশেষে মুনাজাত করা হয়। এভাবেই শেষ হয় তিনদিনের ওরছ শরীফ। ওরছ অবস্থায় আগত ভক্তদের জন্য ফ্রি খাবার পরিবেশন করা হয়।

পীর ছাহেবের ভাতিজা জনাব রফীকুল ইসলাম, যিনি প্রায় ২০ বছর যাবৎ সেখানে অবস্থান করছেন এবং তাবীয বিক্রি করেন। তিনি বলেন, ওরছ শরীফ উপলক্ষে আগত হাযার হাযার মানুষের ফ্রি খাবাবের ব্যবস্থা করা হয়। খাবার জন্য ৩০ মন তেল ব্যবহার করা হয়। ২০-৫০টি গরু এবং ২০০-৫০০ টি ছাগল যবেহ করা হয়। খাবার হিসাবে বিরিয়ানীর তবারক প্রদান করা হয়। যা অত্যন্ত বরকত মনে করে আগত ভক্তবৃন্দ সানন্দে গ্রহণ করে। তবারক গ্রহণের জন্য প্রায় প্রতিযোগিতার মত পর্যায় চলে যায়। উল্লেখ্য যে, উক্ত গরু ও ছাগল সবগুলোই মানুষের বিভিন্ন আশা পূরণার্থে কৃত মানত।

নলতা মাযার পরিচালনা কমিটির সাবেক এ্যাকাউন্ট ম্যানেজার ও বর্তমানে জেনারেল কমিটির সদস্য জনাব আবুল কাশেম বলেন, রামাযান মাসে প্রতিদিন এখানে ৪২০০-৪৩০০ জনের ফ্রি ইফতার করানো হয়। যেখানে খাবার হিসাবে থাকে খেজুর, সুজি, কলা, শিংগাড়া, চিঁড়া প্রভৃতি। তাছাড়া এখানে একটি মেহমানখানা রয়েছে। যেখানে যেকোন ধরনের মেহমান তিনদিন ফ্রি থাকা-খাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রায় ১২০০ জন মানুষ একত্রে সেখানে অবস্থান করতে পারে।

(খ) সেবামূলক প্রতিষ্ঠান : নলতা মাযার শরীফ কেন্দ্রিক কয়েকটি সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে প্রতি শনি ও সোমবার ২০০-২৫০ জন রোগীর ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। সেখানে ৫০ জনের একটি ইয়াতীমখানা রয়েছে। একটি হাফেযী মাদরাসা রয়েছে, যেখানে ১২-১৪ জন ছাত্র, লিল্লাহ বোর্ডিং ৫০ জন ছাত্র, কর্মচারী ৫০ এবং শিক্ষক রয়েছেন প্রায় ১৮ জনের মত। সকলেরই বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা 'আহছানিয়া মিশন' কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।

(গ) সাপ্তাহিক কার্যক্রম : নলতা মাযারে সাপ্তাহিক কিছু কার্যক্রম হয়। যেমন দো'আ, মীলাদ, ক্বিয়াম ইত্যাদি। সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার মাযারের মধ্যে বাদ মাগরিব ১৩০০ এর অধিক মীলাদ হয়ে থাকে। আর সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার বাদ জুম'আ মসজিদে ৭০০ মীলাদ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে প্রত্যেক অনুষ্ঠানে মীলাদ-ক্বীয়ামের মত বিদ'আতী অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

(ঘ) **প্রাত্যহিক কার্যক্রম :** প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও পূর্বগগনে সূর্যের আলো ঝলমলিয়ে উঠেছিল। ভোরের শীতল আবহাওয়ায় পাখিরা কিচির মিচির শব্দ ডেকেছিল। সকলের

Contents

মাঝে কর্মচঞ্চলতা ছিল স্বাভাবিক। এরই মধ্যে আমরা যেভাবে 'নলতা মাযার' পরিদর্শনে বাড়ী থেকে বের হয়েছিলাম, ঠিক এমনি করে অনেকেই বের হয়েছিল। তবে উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেউ এসেছিল বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য, কেউবা অসুস্থ থেকে সুস্থ হওয়ার আশায়, কেউবা স্বপ্ন পূরণের কাঙ্ক্ষিত বাসনা নিয়ে। পীর ছাহেবের ভাতিজা রফীকুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, দৈনিক কত যে তাবীয বিক্রয় হয় তার সঠিক হিসাব তিনি দিতে পারবেন না। তবে তাবীযের মূল্য সাইজ মত ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু বখশীশ গ্রাহকের ইচ্ছামত। উল্লেখ্য, তাবীয ক্রয়ের টাকা রসিদের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু বখশীশের টাকার কথা কিছু বলেননি।

জেনারেল কমিটির সদস্য জনাব আবুল কশেম ছাহেব তিনি আমাদের পীর ছাহেব খানবাহাদুর আহছানুল্লাহ স্মৃতি জাদুঘর প্রদর্শন করান। যেটা 'অন্তরে অম্লান' নামে পরিচিত। সেখানে ঢুকে তো রীতিমত চক্ষু চড়কগাছ। পীর ছাহেবের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসন-কোসন, আসবাবপত্র, ব্যক্তিগত লাইব্রেরী, তার ব্যবহৃত খাট-পালঙ্ক, লেপ-তোষক, গ্লাস-মগ প্রভৃতি। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হ'ল, ১২-১৩ ফিটের রুমটিতে পীর ছাহেবের ছবিতে ভরপুর। এছাড়া তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, পিতা-মাতাসহ তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সময়ের ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে। মনে হয় যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ মাযারে মনের চাওয়া নিবেদন করে মনের খায়েশ মিটাতে পারে না, তারা চলে যায় টাটকা ছবির সম্মুখে। যেখানে পীর কেবলার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি রয়েছে। ফলে ভক্তির আতিশয্যে পীরের অন্তলীন হয়ে যায়। উল্লেখ্য, উক্ত রুমেই পীর ছাহেব খানবাহাদুর আহাছানুল্লাহ জীবন-যাপন করতেন।

পীর পরিবারের কারামত : পীর পরিবারের কারামত সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনাব আবুল কাশেম বলেন,

(ক) পীর ছাহেবের দাদা ছিলেন গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত মান্যবর ব্যক্তি। নাম তাঁর মুন্সী দানেশ। তিনি জমিদারী সংক্রান্ত কার্যে ও সামাজিক বিষয়ে সুদক্ষ ছিলন। তাঁর উপর জনৈক দরবেশ (যিনি কাছেম শাহ নামে পরিচিত ছিলেন) ছাহেবের নেকদৃষ্টি পতিত হয়। বাল্যকালে তিনি একদিন কঠিন রোগে শয্যাগত হন, তখন এক শুভ মুহূর্তে শাহ ছাহেবের পদার্পণ হয়। তিনি মুমূর্ষ বালককে ঘাড়ের উপর নিয়ে ছুটে যান ও পথিমধ্যে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে তাঁরই পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয়ে আসতে আদেশ দেন। বালক রোগমুক্ত হয়ে ছুটে স্বগৃহে দরবেশ ছাহেবের সাথে ফিরে আসেন। তদবধি তিনি সুস্থ শরীরে অশীতিবর্ষ পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। এছাড়া তার পরিবারের মধ্যে কোন আপদ-বিপদ দেখা দিলে অমনি কাছেমশাহের হাজির দেখা যেত।

(খ) পীর ছাহেব বলেন, একদা মুন্সী দানেশ আমাদের বাড়ীতে জনৈক বুযুর্গ মেহমানকে দুপুরের খাবার পরিবেশন করছিলেন। হঠাৎ তিনি চোখের অন্তরালে চলে যান, পুনরায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসেন এবং খাবারে অংশগ্রহণ করেন। হঠাৎ অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নিকটবর্তী গ্রাম পারুলিয়ার কোন এক ব্যক্তি ব্রীজ পার হ'তে গিয়ে নীচে পানির মধ্যে পড়ে যায়। তাকে উদ্ধার করতে তিনি ছুটে যান। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, আমার দাদার মৃত্যুকালে জনৈক কামেল ব্যক্তি উপস্থিত হবেন। সত্যি যখন আমার দাদা ইন্তেকাল করেন তখন ইরান হতে মাওলানা ছুফী মুহাম্মাদ আলী শাহ অপ্রত্যাশিতভাবে ইরানী একটি গ্রীন বোটে আমাদের বাড়ীর নিকট দিয়ে বয়ে যাওয়া ইছামতি নদীর শাখা নদীর আমাদেরই ঘাটে উপস্থিত হন। অতঃপর তার জানাযার ছালাত পড়েন। পরবর্তীতে যশোর যেলার নওয়াপাড়ায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং সমাহিত হন। উল্লেখ্য যে, তিনি সেখানে 'ইরানী পীর' ছাহেব নামে পরিচিত।

(গ) পীর ছাহেব বলেন, আমার দাদার মৃত্যুর বহু পূর্বে তিনি একদা স্বপ্নে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পেয়েছিলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানিয়েছিলেন। আমি অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম, স্বপ্নের পূর্ণ মর্ম উপলব্ধি করতে পারিনি। কিন্তু এখনও আমার অন্তরে তা জাজ্বল্যমানরূপে ভাসমান আছে। যা সত্য, তা চিরদিন পরিস্ফুট থাকে-সমভাবে সত্যিকার রূপে!

(ঘ) জনাব আবুল কাশেম বলেন, নলতা মাযার শরীফ, যা 'পাক রওজা শরীফ' নামে আখ্যায়িত। উক্ত মাযারের উত্তর দিকে মাযার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। সেই মসজিদের সামনে তথা উত্তর দিকে একটি বৃহৎ পুকুর রয়েছে। একদিন পীর ছাহেব সকলের সাথে গোসলের জন্য ঐ পুকুরে নামেন। সেখানে তিনি আনন্দ করে বললেন, কে কতক্ষণ পানির নীচে ডুব দিয়ে থাকতে পারে। অতঃপর সবাই ডুব দিল। যার যা ক্ষমতা ছিল সেটা প্রয়োগ করে সবাই পানির নীচ থেকে উঠল। কিন্তু পীর ছাহেব উঠলেন না। সবাই মনে মনে ভাবছেন এই বুঝি পীর ছাহেব উঠবেন। কিন্তু ওঠেনই না। সবাই তখন চিন্তায় পড়ে গেল। অতঃপর সকলেই পুনরায় পানিতে নামল তাকে খুঁজার জন্য। কিন্তু সারা পুকুর তন্নতন্ন করে খুঁজে তার কোন সন্ধান পেল না। সবার মধ্যে একটা ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে। হঠাৎ করে তিনি যেখানে ডুব দিয়েছিলেন সেখান থেকেই ১৮ কেজি ওযনের বিরাট একটি কাতলা মাছ নিয়ে ওঠে আসেন। আশ্চর্য বিষয় হ'ল, তখন ঐ পুকুরে কোন মাছ ছিল না। এটিই পীরে কেবলা খানবাহাদুর আহছানুল্লাহ-এর অন্যতম কেরামতি।

শিরক-বিদ'আতের আড্ডাখানা :

ইসলামে সবচেয়ে বড় গুনাহ হ'ল শিরক। যার মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে অপমান করা হয়। আর ইসলামের সবচেয়ে বড় শয়তানী কাজ হ'ল বিদ'আত। যার মাধ্যমে স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অপমান করা হয়। অথচ ইসলামের নামে সহজ-সরল মুসলিম জনসাধারণকে ঐ জঘন্য পাপকর্ম শিরক-বিদ'আতের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া দেখে মনটা বিষিয়ে ওঠে। শিরকের কারখানা খুলে মানুষকে ঈমানের দিকে

Contents

আহ্বান করা যায় না। অথচ এই কাজটিই করে যাচ্ছে বাংলাদেশের যেলায় যেলায় গড়ে ওঠা মাযার-খানকা-দরবার ভিত্তিক কিছু মূর্খ, ভণ্ড ও প্রতারকরা। নিম্নে স্বচক্ষে দেখা কিছু অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা হ'ল :

দৃশ্য-১ : মোটর সাইকেল থেকে নামা মাত্রই এক জাহেলী ও শিরকী প্রথার অবতারনা। প্যান্ট, শার্ট, সু পায়ে অত্যন্ত পরিপাটি জনৈক এক পীর ভক্তের আগমন ঘটল। তথাকথিত 'পাক রওযা শরীফ' মূলত সমতল থেকে প্রায় ২৫ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। যেখানে উঠার জন্য দু'পার্শ্বে সুদৃশ্য মূল্যবান মার্বেল পাথরের সিঁড়ি করা আছে। ভক্ত লোকটি উপরে ওঠার সময় তার দু'পায়ের জুতা খুলে ফেললেন। পরমুহূর্তে দু'তিনটা সিঁড়ি পার হয়ে সিঁড়িতেই ডান হাত মেরে সেই হাত মুখে ও কপালে এবং হিন্দুদের ন্যায় চোয়ালের দুই দিকে ঘুরিয়ে নিলেন এবং মুখে কি যেন বিড়বিড় করলেন। অতঃপর ওপরে উঠে গেলেন। হয়তো বেচারী অফিসে যাওয়ার পূর্বে হিন্দুদের ঠাকুরের প্রসাদ নেওয়ার মত তিনিও পীরে কেবলার মাযারের বরকত হাছিল করে নিতে চান। যাতে কাজে বরকত হয় এবং কোন সমস্যায় পতিত না হতে হয়। সাথে সাথে সঙ্গীকে বললাম, দেখুন! নলতা মাযারের শিরকের প্রথম দৃশ্য। হয়তো এরচেয়ে আরো খোলাখুলি দৃশ্য সামনে অপেক্ষমান।

দৃশ্য-২ : সিঁড়ি মাড়িয়ে যখন আমরা উপরে উঠলাম, তখন নিজেদেরকে আবিষ্কার করলাম এক সুদৃশ্য স্থাপনার মাঝে। মনে হচ্ছিল বাংলার প্রাচীন শৈল্পিক স্থাপত্যে সুশোভিত কোন জমিদার বাড়ীর খাস কামরা। সুসজ্জিত বিল্ডিং, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও রুচিশীল টাইলস দিয়ে সমস্ত মেঝে সজ্জায়ন করা। মূল্যবান মখমল কাপড় দিয়ে মাযারটি আচ্ছাদিত। তার উপর বিভিন্ন নামিদামী তাজা ও শুকনা ফুলের পাপড়ি চতুর্দিকে সুন্দর করে সাজানো। গোলাপ জল ও আগরবাতীর ঝাঁঝালো গন্ধতো আছেই। মাযারের উপর থেকে তাবীয বিক্রেতা ফুলের পাপড়ি নিচ্ছে আর তাবীযের মধ্যে ঢুকিয়ে খাদেমের নিকট পাঠাচ্ছে। সেগুলোকে খুবই বরকতমণ্ডিত মনে করা হয়ে থাকে। পীর ছাহেবের মাযারের উপরে রাখা ফুলের পাপড়ি বলে কথা! মাযারের চতুর্দিকে এক বিঘত পরিমাণ স্থান উঁচু করে টাইলস বসানো আছে। যেখানে মানুষ প্রথমে ছালাতের কায়দায় বসে সম্মানের সাথে দু'হাত রেখে চুমু খেয়ে মনের আশা ব্যক্ত করে থাকে।

মাযারে প্রবেশের মোট চারটি দরজা। তিনটি পুরুষের জন্য, একটি মহিলাদের জন্য। মহিলাদের জন্য সেখানে পর্দার ব্যবস্থাও রয়েছে। যাইহোক, দেখলাম দু'জন যুবক ছেলে। দু'জনের মাথায় মাযারের ময়লাযুক্ত টুপি পরিধান করা। একজন দু'হাত সেই বিঘত পরিমাণ স্থানে রেখে মাথা নীচু করে বসে আছে। অপরজন দু'হাত সম্মানের সাথে রেখে চুম্বন করে মুনাজাত করতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর দু'জনের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। তাদের বিশ্বাস যে, আমার সমস্ত পাপ হয়তো ক্ষমা হয়ে যাচ্ছে। পীর আমাকে পাপগুলোকে ধুয়ে মুছে ছাপ করে দিচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে মুনাজাত ও কান্নাকাটি করে অবশেষে পীরের আদবের শানে পিঠ পিছনে রেখে সালাম দিয়ে চলে গেল। ঐ রুমের এক কোনায় দেখলাম এক নোংরা পোশাকধারী বাবরীওয়ালা খুব ভদ্রোচিত ভঙ্গিতে কুরআন তেলাওয়াত করছে। বয়স আনুমানিক ২৪-২৫ হবে। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, তার পরিধেয় পাজামাটি টাখনুর নীচে মাটির সাথে গড়াগড়ি খাচ্ছে। হায়রে অবুঝ মানুষ! আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের কোন বালাই নেই অথচ তথাকথিত কল্পিত যিকির, মুনাজাত, মীলাদ-ক্বিয়াম, হুযুরের শানে আদব ও কুরআন তেলাওয়াত করে আখেরাতে পীরের সুফারিশ পেতে চাই!

দৃশ্য-৩ : জনৈক স্বামী ও তার স্ত্রীর ঘটনা। পশ্চিম গেট দিয়ে প্রবেশ করে মাযারে ঢোকার সময় দরজার ঠিক পূর্বে স্ত্রী লোকটির স্বামী সিজদা করল অতঃপর দরজার পর্দা নিয়ে একবার ডান চোখে একবার বাম চোখে স্পর্শ করল। তারপর ভক্তির সাথে মাথা প্রায় কোমর পর্যন্ত বাঁকা করে গম্বুজাকৃতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। আমরা সেটা অবাক নেত্রে তাকিয়ে দেখলাম আর যতটুকু সম্ভব মোবাইলের মাধ্যমে ভিডিও করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ভিডিওতে ঠিকমত ঐ দৃশ্যটি আসেনি। আফসোস! ইট-মাটি-সিমেন্ট দিয়ে তৈরী কবরকে কি কখনো সিজদা করা যায়। তাছাড়া পীর ছাহেবের কবর তো ঐ স্থান থেকে প্রায় ২৫ ফুট মাটির নীচে। হায়রে মূর্খ মুসলিম! কবে ফিরবে তোমাদের চেতনা।

দৃশ্য-৪ : দক্ষিণ গেট দিয়ে মাযারের দিকে হঠাৎ নযর পড়ল। দেখি এক অভাবনীয় দৃশ্য! দৃশ্য অবলোকন করে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করল। কখনো এরকম অচিন্তনীয় দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই সম্বিত ফিরে পেয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলাম। প্রথমতঃ আমাদের প্রতিবেদনটি তৈরীর জন্য যে সব তথ্য দরকার, সেগুলো একের পর এক সবই আমাদের সামনে ঘটছে। দ্বিতীয়তঃ এরকম শিরকী পরিবেশে ও পরিবারে আল্লাহ আমাদের জন্মগ্রহণ করাননি। যাইহোক, আড়াই অথবা তিন বছরের ছোট্ট সোনামণিকে তার পীর ভক্ত পিতা কিভাবে শিরক করতে হয় তা তাকে হাতে-কলম প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। পিতা তার দু'হাত বিঘত পরিমাণ জায়গায় রেখে তার শিশু পুত্রকে বলছে এভাবে রাখতে হয়। সেখানে চুম্বন করে ছেলেটিকে চুম্বন করতে বলছে। আগে পিতা সবই করে দেখাচ্ছে, যাতে বাচ্চাটি সহজেই তা করে। কিন্তু আনন্দের বিষয় হ'ল সে কিছুতেই সেখানে হাত রাখা বা চুম্বন দেওয়া কোনটাই করছে না। সে সময় মূর্খ পিতা জোর করে বাচ্চাটির ঐ স্থানে হাত রেখে চুম্বন করিয়ে দিল। তারপরের দৃশ্য তো আরো শোচনীয়। সেটা হ'ল, পিতা সন্তানকে সেখানে সিজদা করার জন্য বলে নিজে আগে সিজদা দিল। কিন্তু বাচ্চা সোনামণিটি কোনরকম সিজদা দিতে নারাজ। এবারও তার পিতা ঘাড় ধরে তাকে সিজদা করাল। দৃশ্য দেখে তো রীতিমত হতবাক হলাম আর মনে

মনে আওড়াতে লাগলাম রূহ জগতে মহান আল্লাহ্র নিকট দেওয়া সেই প্রতশ্রুতির কথা। ছোট্ট সোনামণি, সে কবরে সিজদা দেওয়ার জন্য তো পৃথিবীতে আগমন করেনি। নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তো দুনিয়ায় তার আগমন। কিন্তু রাসূলের হাদীছ তো আর মিথ্যা হতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ 'প্রত্যেক সন্তান ফিৎরাত তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাদের পিতা-মাতার কারণে সে হয় ইহূদী, খ্রীষ্টান এবং অগ্নি উপাসক' *(বুখারী হা/১৩৫৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০)*। উল্লেখ্য যে, পূর্বে শিশুটির পিতাকে এককভাবে সিজদা করতে দেখেছিলাম।

দৃশ্য-৫ : মাযারের চতুর্দিকে সুদৃশ্য টাইলস বসানো বারান্দা রয়েছে। সেই বারান্দা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাযারের ভিতরে গিয়ে ভিডিও করছিলাম। হঠাৎ দেখলাম পীর ছাহেবের ভাতিজা রফীকুল ইসলাম একটি কাগজ এনে মাযারের উত্তর-দক্ষিণের উপর থাকা সেই বিভিন্ন নামী-দামী শুকনা ফুলের পাপড়ি নিয়ে গেল, যা দিয়ে তিনি আগত বিভিন্ন মুরীদ, ভক্ত ও অসুস্থ মানুষের মাঝে টাকার বিনিময়ে বিতরণ করছেন। হায়রে বিবেকসম্পন্ন মানুষ! বিবেক কী জাগ্রত আছে না-কি মৃত। মাযারের উপরে রাখা ফুলের পাপড়ির কি অলৌকিক কোন ক্ষমতা আছে, যে তাকে আরোগ্য দান করবে?

দৃশ্য-৬ : উত্তর গেটের সামনে দিয়ে হাঁটছি। একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম জনৈকা এক মধ্যবয়সী মহিলা মাযারের পার্শ্বে ছালাত আদায় করছে, এক মহিলা ১০-১১ বছরের একটি বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে দু'হাত তুলে মুনাজাত করছে, একজন মহিলা মাযারের দিকে ফিরে কুরআন তেলাওয়াত করছে। সময় যত যাচ্ছে দেখলাম মানুষের ভীড় ততই বাড়ছে। বিশেষ করে মহিলারা। শিশু-কিশোর, তরুণী, মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধা মহিলার আগমন সবচেয় বেশী। তাদের কারো হাতে তাবীয, কারো হাতে পানি ভর্তি বোতল, কারো হাতে বোটা সহ বড় বড় বাতাবী লেবু শোভা পাচ্ছে। যেগুলো তারা পীরের রেযামন্দী প্রাপ্ত ও নিয়োগকৃত খাদেমের নিকট থেকে ঝাঁড়-ফুক করার জন্য যাচ্ছে আবার কেউ সেগুলো নিয়ে বিদায় হচ্ছে।

দৃশ্য-৭ : মাযারে আগত জনৈক এক মধ্য বয়সী পুরুষ মানুষকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি এখানে কেন এসেছেন? তিনি বললেন, তাবীয কিনতে। বললাম, আপনার কি সমস্যা? বললেন, হার্ট দুর্বল ও কোমরে ব্যাথা। আবার বললাম, এর আগে কি কখনো এখানে এসেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'না; এই প্রথম। বিভিন্ন ডাক্তার, কবিরাজ দেখিয়েছি, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এক ভাই আমাকে বলল নলতা পীরের মাযারের তাবীয নিলে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। তাই এখানে আসা'। লোকটি শ্যামনগর উপযেলার সুন্দরবনের নিটকবর্তী কোন একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসেছিলেন।

'কবরে সেজদা করবেন না, এখানে সেজদা করা নিষেধ' :

'নলতা মাযার শরীফ'-এর দেওয়ালে লেখা আছে উপরোক্ত কথাটি। বিষয়টি হাস্যকর বৈকি। খোসা তুলে মৌমাছিকে যদি বলা হয় আমের উপর বস না, তাহলে মৌমাছি কি শুনবে? অনুরূপভাবে বিষয়টি পাগলকে সাঁকো নাড়া দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত নয় কি? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, শিরক-বিদ'আতের উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করে বলা হচ্ছে ওখানে শিরক-বিদ'আত কর না। হায়রে হতভাগা মুসলিম!

খানপুর দরগা শরীফ

সাতক্ষীরা সদর থানাধীন খানপুর এলাকায় 'খানপুর দরগা শরীফ' টি অবস্থিত। পীরের নাম মুহাম্মাদ মহসিন আল-মঞ্জুর আবুল হাসান খানপুরী। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা তিনি কামেল পাশ। তার মৃত্যুর পর প্রতি বছর ১৯ শে ভাদ্র সেখানে 'ওরস' হয়ে থাকে। যেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে হাযার হাযার মানুষ আগমন করে।

আমরা যোহরের আযানের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গিয়েছিলাম। ফলে দরগার কোন দায়িত্বশীলের সাথে কোন কথা হয়নি। তবে সেখানে কয়েকজন ভক্ত ও মুরীদ উপস্থিত ছিলেন। তারাই বললেন, খানপুরী পীর ছাহেব ফুরফুরা ও ছারছিনা তরীকার অনুসারী। প্রতি বছর সেখানে তারা যাতায়াত করে থাকে। সেখানে কয়েকজন মহিলা ও কয়েকজন পুরুষ ছাড়া কেউ ছিল না। তাদের নিকট থেকে জানা যায় যে, সেখানে তারা তাবীয নেওয়ার জন্য এসেছেন, কেউ এসেছেন অসুস্থ শরীর নিয়ে প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, খানপুর মাযারে হিন্দু-মুসলিম সহ সকল শ্রেণীর মানুষের আগমন ঘটে থাকে।

পীর হয়ে উঠার কাহিনী :

কথিত আছে যে, পীর ছাহেব জনাব আবুল হাসান একজন বক্তা ছিলেন। সাধারণ জনগণের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। একদিন তাঁর পার্শ্ববর্তী গ্রামে ইসলামী সম্মেলন হচ্ছিল। সেখানে যাওয়ার আগে বাড়ীর সদস্যদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে তাদের খড়ের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বলে গেলেন। তিনি বক্তব্য দেওয়ার জন্য উঠলেন। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলেই তিনি বললেন, 'আমার বাড়ীর খড়ের স্তূপে আগুন ধরে গেছে'। বলা মাত্রই সকলেই ছুটে গিয়ে দেখল, সত্যি তো খড়ের স্তূপে আগুন ধরেছে। মূলত তিনি ভেবেছিলেন মানুষের নিকট যদি পীর ছাহেবের কেরামতী ধরা পড়ে তাহলে সহজেই পীর হওয়া যাবে। এই জন্যই তিনি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। ফলে মানুষরা ভাবল, যদি তিনি পীর নাই হবেন, তাহলে আগুন ধরার কথা কিভাবে বললেন। শুরু হল তার বিনা পূঁজির লাভবান ব্যবসার অগ্রযাত্রা এবং শিরক-বিদ'আতের উৎপাদন কারখানা। কতদিন তা বজায় থাকবে আল্লাহই ভাল জানেন। *(ক্রমশঃ)*

সাক্ষাৎকার

['বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের এই স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন 'তাওহীদের ডাক'-এর পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহিল কাফী]

তাওহীদের ডাক : ***দেশে আপনার মূল্যবান থিসিসের উপাত্ত সংগ্রহে আপনাকে কিরূপ বেগ পেতে হয়েছে, সে বিষয়ে জানালে বাধিত হব।***

মুহতারাম আমীরে জামা'আত : যেকোন গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে বেগ পেতে হয়, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল একেবারে নতুন। এর উপরে কোন বিধিবদ্ধ গবেষণা এদেশে বা কোন দেশেই হয়নি। ফলে এর সংগ্রহের জন্য লিখিত তথ্যাদি ছাড়াও মৌখিক সাক্ষাৎকার এবং প্রবীণদের নিকট রক্ষিত প্রমাণাদি সংগ্রহকেই মূল উপাদান হিসাবে নিয়েছিলাম। আর সেজন্যেই দেশে ও বিদেশে ব্যাপক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছিল। ইতিপূর্বে এক সাক্ষাৎকারে (২০১২ সালের ৯, ১০ ও ১১ সংখ্যা) বিদেশে স্টাডি ট্যুরের কথা বলেছি। ঐসব দেশের স্কলারদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি ও বই পেয়েছি। বর্তমানে মৃত দিল্লীর মাওলানা আব্দুল হামীদ রহমানী সহ অনেকের মৌখিক বক্তব্য টেপ করে নিয়েছি এবং অনেকের বক্তব্য লিখে সই করে নিয়েছি। পরে দেশে ফিরে সেগুলি এডিট করে থিসিসে যোগ করেছি। এভাবে বিদেশী অভিজ্ঞতা ছিল চমকপ্রদ।

১৯৮৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ৫২ দিনের পাকিস্তান, ভারত ও নেপাল সফর শেষে দেশে ফিরে এবার নিজ দেশে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে নেমে পড়ি। এজন্য আমি ৭ টা পলিসি গ্রহণ করি। ১- একটা প্রোফর্মা টাইপ করে সংগঠনের সব যেলায় পাঠিয়ে দেই। যাতে দায়িত্বশীলরা সেগুলি পূরণ করে পাঠিয়ে দেন। ২- বিভিন্ন প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ, মাদরাসা ও লাইব্রেরীর ছবি তুলে আনা। ৩- বিভিন্ন পুরানো লাইব্রেরীতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। ৪- আহলেহাদীছের পুরানো মারকাযগুলিতে সফর করা এবং সেখানকার প্রবীণ নেতৃবৃন্দ, আলেম-ওলামা ও সমাজ নেতাদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া। ৫- আহলেহাদীছ অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে ব্যাপকভাবে সফর করা এবং তারা কেন আহলেহাদীছ, কিভাবে এখানে এলেন, পূর্ব পুরুষদের পরিচয় ইত্যাদি নানা প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা। ৬- মসজিদ, মাদরাসা, মারকায, ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ইত্যাদি পুরানো স্মৃতিসমূহ সন্ধান করা। ৭- পুরানো বই ও পত্রিকা বা হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা। তবে বিদেশে যেভাবে ব্যস্ত আলেমদের কাছ থেকে তাদের বক্তব্য প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে টেপ করে এনেছিলাম, দেশে সেটা লাগেনি। এখানে তাদের বক্তব্য লিখে পড়িয়ে শুনিয়ে নীচে বক্তার সই বা টিপসই নিয়েছি। সঙ্গে সাক্ষী হিসাবে অন্যের স্বাক্ষর নিয়েছি। যার সবগুলিই আমাদের থিসিস ফাইলে আজও রক্ষিত আছে।

আলহামদুলিল্লাহ প্রতিটিতে আমরা কমবেশী সফলতা লাভ করি। এখনকার মত ভিডিও-মোবাইল থাকলে সে সময়কার সব রেকর্ড আজ জীবন্ত দেখাতে পারতাম। যা আমার স্মৃতিপটে আজও ভাস্বর হয়ে আছে। নিম্নে সংক্ষেপে তা থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।-

(১) লেটার টাইপে মুদ্রিত 'জীবন বৃত্তান্ত' শিরোনামের প্রোফর্মায় আমরা ৯টি পয়েন্ট দিয়ে দেশের বিভিন্ন যেলায় বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিদের নিকট পাঠাই। সংগঠনের কর্মীরা তাদের কাছে গিয়ে উত্তর লিখে নীচে তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। উক্ত পয়েন্টগুলি ছিল যথাক্রমে- নাম, পিতার নাম, জন্ম তারিখ, বর্তমান বয়স, সর্বোচ্চ ডিগ্রী ও প্রতিষ্ঠানের নাম, বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান পেশা, শিক্ষা জীবন, (৬) আহলেহাদীছ আন্দোলনে আপনার অবদান ও তৎপরতা, (৭) কয় পুরুষ বা কত বৎসর পূর্ব হ'তে আপনার বংশ আহলেহাদীছ, (৮) কিভাবে বা কার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপনার বংশ আহলেহাদীছ হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, (৯) আপনার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে আহলেহাদীছ আলেমদের নাম লিখুন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদান হিসাবে তাঁদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের তৎপরতা উল্লেখ করুন। সবশেষে .... আপনার পূর্ণ বাংলা স্বাক্ষর ও তারিখ।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীদের প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তারা নিষ্ঠার সাথে উক্ত দায়িত্ব পালন করে থিসিস-এর উপাত্ত সংগ্রহে প্রাথমিক ভূমিকা রাখেন। (২) সেই সাথে বিভিন্ন প্রাচীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মাদরাসা, ব্যক্তিগত লাইব্রেরী এবং স্মৃতিচিহ্ন সমূহের ছবি তুলে আনা হয়। যার কিছু কিছু থিসিসের পরিশিষ্টে আছে। বাকীগুলি ব্যক্তিগত এ্যালবামে আছে। নেগেটিভগুলিও রয়েছে। (৩) এরূপ এক সফরে ৩১.১২.১৯৯০ ইং তারিখে আমি জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপযেলার বালীজুড়ী মাদরাসার জালসায় যাই। সেখানে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়ায় একজন ভাইয়ের সন্ধান

Contents

পাই। পরের দিন সকালে তার বাড়ীতে যাই এবং তার নিকটে অমূল্য তথ্য পাই। আমি তাঁর কাছে মাওলানা কাফী (১৯০০-১৯৬০ খৃ.) কর্তৃক ১৯৩২ সালের ১১ই জানুয়ারীতে স্বহস্তে লিখিত তারতাপাড়া মোহাম্মাদী জামায়াতের মসজিদের শালিশনামা পেলাম। যেটা তিনি এযাবত কাউকে দেননি *(দ্রঃ থিসিস পৃঃ ৪৭৭)*। যার ফটোকপি আজও আমাদের ফাইলে রক্ষিত আছে। সেই সঙ্গে শালিশনামাটি ওয়াদামত যথাসময়ে ফেরৎ পাঠানোয় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাড়ীওয়ালা জনাব খন্দকার আব্দুল হালিম (বাণীকুঞ্জ)-এর লিখিত পত্র আজও রক্ষিত আছে। এদিন যুবসংঘের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ রফীক আমার সাথে ছিল। তার হোন্ডার পিছনে চড়ে আমি রাজশাহী থেকে যাই ও আসি। সারিয়াকান্দি ঘাট থেকে হোন্ডা নৌকায় পার করা হয়।

(৪) অমনি এক সফরে ১৩.১০.১৯৮৯ তারিখ শুক্রবার যুবসংঘের তৎকালীন সভাপতি আব্দুর রশীদের হোন্ডায় করে গাইবান্ধার শিমুলবাড়ী মারকায এলাকায় তথ্য সন্ধানে যাওয়ার পথে সাঘাটা থানাধীন ঝাড়াবর্ষা গ্রামের জামে মসজিদের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ মসজিদের গায়ে 'সীরাতুন্নবী'-র পোষ্টার লাগানো দেখে হোন্ডা থামাতে বললাম। অতঃপর হোন্ডা থেকে নেমে লোকদের বললাম, এ মসজিদটা কাদের? তারা বলল, আহলেহাদীছের। শোনামাত্র তাকে বললাম, আহলেহাদীছ মসজিদের দেওয়ালে বিদ'আতীদের পোষ্টার কেন? ধমক শুনে লোকটা সব পোস্টার ছিঁড়ে ফেলল। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মুছল্লী জমা হয়ে গেল। বললাম, আপনাদের গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ লোকদের ডাকুন। তখন কাযী আফসারুদ্দীন (৭৪) নামের এক মুরব্বী এলেন। তাঁকে বললাম, আপনারা আহলেহাদীছ কবে থেকে এবং পূর্বপুরুষদের কোন তথ্য জানেন কি? তখন তিনি যা বললেন তা রীতিমত হতবাক হবার মত। তিনি বললেন, আমার তিন দাদা তাদের ৮০ বিঘা জমির ৪২ বিঘা বিক্রি করে জিহাদ ফাণ্ডে দান করেন। অতঃপর জিহাদে গিয়ে নিজেরা শহীদ হন। তাদের স্মরণে তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র আমার পিতা মৃত আব্দুল বারী কাযী পুঁথি আকারে যে শোকগাথা রচনা করেন, তা আমার ঘরের দেওয়ালের মাথায় এখনও আছে। বলার সাথে সাথে আমি সেটা নিতে চাইলাম এবং তিনি খুশী মনে তখুনি একটা ছেলে পাঠিয়ে আমাকে তা এনে দিলেন। যা আজও সংরক্ষিত আছে *(দ্রঃ থিসিস পৃঃ ৪২৪, ছবি পৃঃ ৫১৩)*। অথচ এই অমূল্য সংগ্রহটি পাওয়ার উৎস হ'ল ঐ বিদ'আতী পোষ্টার এবং আমার ভিতরকার প্রতিবাদী মেযাজ। নিঃসন্দেহে এর পিছনে আল্লাহর অদৃশ্য রহমত ছিল। তা না হলে আমরা গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতাম না। পোষ্টারটাও নযরে পড়ত না।

(৫) জানতে পারলাম যে, গাইবান্ধা শহরের খোলাহাটি ব্রীজ রোডে কিছু সম্ভ্রান্ত প্রাচীন আহলেহাদীছ বসবাস করেন। গেলাম সেখানে ২৪.১১.১৯৮৯ ইং তারিখে। পেলাম আজীব তথ্য। মূল বাড়ীওয়ালা এফাযুদ্দীন হক্কানী এদেশী নন। তিনি বর্তমান পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা থেকে এখানে হিজরত করে এসেছিলেন এবং ১১৩ বছর বয়সে মারা গেছেন ১৯৮৩ সালে। তাঁর ব্যবহৃত জিহাদের তরবারি ও ব্যাজ তাঁর বাড়ীতে আছে। ছেলেরা খুশী হয়ে বললেন, এর প্রকৃত হকদার এখন আপনি। অতএব আপনাকে এগুলি আমরা হাদিয়া দিলাম *(দ্রঃ থিসিস ৪২৫ পৃঃ ও ছবি ৫১৪ পৃঃ)*। (৬) হান্টারের বইয়ে বাংলাদেশের রফীক মণ্ডলের কথা পড়েছিলাম। পদ্মার তীরে কোথায় হতে পারে তার বাড়ী? অবশেষে সন্ধান পেলাম। গেলাম চাঁপাই থেকে কিছু মহিষের গাড়ী, কিছু পায়ে হেঁটে, কিছু নৌকায় চড়ে একেবারে চর এলাকায় পাকা নারায়ণপুর গ্রামে ১৯৮৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। যা তখনকার হিসাবে রাজশাহী থেকে পুরা একদিনের পথ। ভক্ত আফতাব চেয়ারম্যানের মাধ্যমে রফীক মণ্ডলের উত্তরসুরীদের সাথে দীর্ঘ বৈঠক হ'ল। জানতে পারলাম তাদের বংশের একটি শাখা ভারতের উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার থানার শ্রীমন্তপুরে বসবাস করেন। তাদের শ্রেষ্ঠ আলেম হলেন মাওলানা আহমাদ হোসায়েন শ্রীমন্তপুরী। পরে ভারতে স্টাডি ট্যুরের সময় ২৮.১.১৯৮৯ ইং তারিখে সেখানে গিয়েছি। তার ও তার অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের নিকট থেকে তথ্য নিয়েছি কয়েকবার। ফলে এই মুজাহিদ পরিবারের সঠিক ইতিহাস থিসিসে সন্নিবেশিত হয়েছে *(থিসিস, পৃঃ ৪৫৭-৫৮)*। (৭) পাকা নারায়ণপুরে একাধিকবার গিয়েছি। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালের ২৭ ও ২৮শে নভেম্বর আফতাব চেয়ারম্যানের ছোট ভাই কামালুদ্দীন চেয়ারম্যানের হোন্ডায় চড়ে চরের কালাই ক্ষেত মাড়িয়ে পদ্মাতীরের আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলি সফর করেছি। অতঃপর শহর পার হয়ে আলীনগর, বাঙ্গাবাড়ী, পোল্লাডাঙ্গা, রহনপুর, মুশুরীভূজা, বীরেশ্বরপুর, চোরাপাড়া মাদরাসা পর্যন্ত অজ সীমান্ত এলাকায় ছুটেছি। বিস্তীর্ণ আহলেহাদীছ এলাকায় গিয়ে মাওলানা মাহদী হাসান সহ প্রবীণতম আলেম ও সমাজনেতাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়েছি। সবাই অত্যন্ত খুশী মনে তথ্য দিয়েছেন ও আহলেহাদীছদের হারানো ইতিহাস সংগ্রহে আমাদের আকুল আগ্রহের প্রতি ব্যাপক অভিনন্দন জানিয়েছেন। তথ্য নিতে যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই সংস্কারমূলক বক্তব্য রেখেছি এবং আহলেহাদীছের মূল আদর্শ স্মরণ করিয়ে সেদিকে সকলকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছি। তাতে ঈমানদার মানুষের ব্যাপক সাড়া পেয়েছি।

উল্লেখ্য যে, পাকা বা সূর্যনারায়ণপুর ছিল ১৮৪০ সালের দিকে রফীক মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লোক ও রসদ

সরবরাহ কেন্দ্র। নদী ভাঙ্গনে সেখানকার মসজিদটাও বিলীন হয়ে গেছে। তবে তার আগেই আমি রাজশাহী থেকে আমার ভাগিনা মু'তাছিম বিল্লাহ (সাতক্ষীরা) ও ছাত্র কাবীলকে হোন্ডা ও ক্যামেরা দিয়ে পাঠিয়ে ৭.১.১৯৯২ ইং তারিখে মসজিদটির ছবি তুলে আনি *(ছবি দ্রঃ থিসিস ৫০৯ পৃঃ)*।

উত্তরবঙ্গে আহলেহাদীছের জনসংখ্যা বেশী হওয়ায় এতদঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ছুটেছি। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাংগঠনিক দায়িত্ব থাকায় এরূপ ব্যাপক সফর করা আমার জন্য সহজ হয়েছে। ঐ সময় আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর আগুনঝরা ভাষণ শুনতে হাযার হাযার শ্রোতা জমা হ'ত। তখন ৩ ঘণ্টার নীচে খুব কমই ভাষণ হ'ত। আর এমন কোন ভাষণ হ'তো না যেখানে আমরা থিসিসের তথ্য প্রদানে লোকদের প্রতি আহ্বান জানাতাম না। ফলে ব্যাপক প্রচার ও সাংগঠনিক তৎপরতা আমাদের গবেষণা কর্মে খুবই সহায়ক হয়। একটা সহজ পন্থা ছিল এই যে, যার নামের শেষে আখন্দ, আখুঞ্জী, মুজাহিদ, কাবুলী, ফারায়েযী, গাড়া ফারাযী, মুহাম্মাদী, সালাফী, খোরাসানী ইত্যাদি পেতাম তাকেই ধরে বসিয়ে গল্প শুরু করতাম। এভাবে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী পেয়ে যেতাম। এইসব লকবের সূত্র ধরেই আমি পাবনা কাবুলীপাড়া, বগুড়ার সোন্দাবাড়ী, গাইবান্ধার ধনারুহা, সাতক্ষীরার গরালী, কলিমাখালী, সুন্দরবনের সুতার খালি, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার ও করটিয়া জমিদারবাড়ী, ময়মনসিংহের ধানীখোলা, চকপাঁচপাড়া, বাগরেহাটের মোল্লাহাট, কুমিল্লার কোরপাই, বুড়িচং এবং দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করি। বর্তমানে হবিগঞ্জের লাখাই, দিনাজপুরের খানসামা ও সিলেটের জাফলংয়ে এবং অন্যান্য অঞ্চলে আরও বহু প্রাচীন আহলেহাদীছ তথ্যের সন্ধান পেয়েছি।

(৮) ধানীখোলাতে এক মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বড় বক্তা শেষে বলেন। ফলে গভীর রাতে বক্তৃতা শেষে এসে দেখি আমাদের থাকার জায়গা অন্যেরা দখল করে নিয়েছে। সাথী যুবসংঘের আব্দুল হাফীযকে বললাম, কাউকে ডিস্টার্ব করো না। দেখ কিছু পল-বিচালী পাও কি-না। প্যান্ডেল থেকে কুড়িয়ে আনল। বললাম, দেখ দু'চারটি ইট পাও কি-না। কিছুক্ষণ পর নিয়ে এল। এবার ইটের উপর বিচালী দিয়ে বালিশ বানিয়ে দু'জনে স্কুলের বারান্দায় শুয়ে গেলাম। ঘুমে কোন সমস্যা হয়নি। (৯) আরেকটি ঘটনা, সুলতান মাহমূদ হানাফী থেকে শাফেঈ হয়েছিলেন এ কথাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমি মানতে পারিনি। সব জায়গায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে গিয়ে ফার্সী তারীখে ফিরিশতায় পেলাম ১ম খণ্ড ২৩ পৃষ্ঠায় গিয়ে যে, তিনি আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের মধ্যে গণ্য হতেন *(থিসিস ২৪১ পৃঃ)*। সেদিন আব্বার শুকরিয়া আদায় করলাম। তিনি যদি আমাকে শৈশবে ফার্সী না শেখাতেন, তাহ'লে আজ এই অমূল্য তথ্য থেকে আমি বঞ্চিত হ'তাম। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

(১০) বগুড়ার নশীপুরের গোলাম রব্বানীর ইয়ামাহা হোন্ডার পিছনে বসে ঘুরেছি নানা গ্রামে। গিয়েছি সোন্দাবাড়ী মারকাযে। যেখানে নয় জন মুজাহিদের কবর পাশাপাশি রয়েছে। অতঃপর গিয়েছি তাদের উত্তরসুরী ও অনুসারী মুরব্বীদের কাছে। জেনেছি যে, জিহাদ আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল এখান থেকে অর্ধ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মেঘাগাছা সরকারবাড়ী জামে মসজিদ। পরে গেলাম সেখানে। পেলাম কালের সাক্ষী হিসাবে গাছ-গাছালীতে ভরা প্রাচীন মসজিদটি। বুঝলাম যেকোন দিন এটি বিলীন হয়ে যাবে। ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলে নিলাম *(দ্রঃ থিসিস ৪২১ ও ৪৫৩ পৃঃ, ছবি ৫১১ পৃঃ)*। এখানকার পুরা তথ্য জানতে আমাকে তিনবার যেতে হয়েছে। প্রথমে ২৬.১১.৮৮ইং তারিখে বাইগুণীর মুনশী খলীল (৮২)-এর বাড়ীতে। এই বয়োবৃদ্ধ মানুষটির কাছে তার স্বহস্তে লিখিত একটা পুরানো ডায়েরী পাওয়া গেল। যেখানে সোন্দাবাড়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সন-তারিখ সহ অন্যান্য তথ্যাবলী ছিল। তাঁর লাইব্রেরীতে বহু পুরানো উর্দূ বই ও বাংলা পুঁথি ছিল। তার এক বছর পর ২৬.১১.৮৯ইং তারিখে গিয়েছি সোন্দাবাড়ী জামা'আতে মুজাহেদীনের সর্দার আনছারুর রহমান সরকার (৮০)-এর কাছে। তারপরের বছর ২৬.১০.৯১ ইং তারিখে গেছি মেঘাগাছা সরকারবাড়ীর মহবূবুর রহমান সরকার (৮০)-এর কাছে।

(১১) একইভাবে গিয়েছি ১৩.১০.৮৯ইং তারিখে গাইবান্ধা শিমুলবাড়ী মারকায সম্পর্কে জানতে আব্দুস সুবহান আখন্দ (শিমুলবাড়ী), সগুনা-ভরতখালীর ইমাযুদ্দীন আখন্দ ফারাযী (৮০), চিনিরপটলের আব্দুল সালাম আখন্দ, হলদিয়ার রহীমুল্লাহ আখন্দ, ধনারুহার আব্দুল হামীদ সরকার (৮০), নযীর হোসায়েন ও লুৎফর রহমান আখন্দ প্রমুখদের নিকট। ঐ সময় এসব অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল খুবই সঙ্গীন। উঁচু-নীচু মাটির রাস্তা। শুকনার সময় বাই সাইকেল, রিকশা ও হুন্ডা ভরসা। বর্ষাকালে খালি পায়ে নিশ্চিতভাবে কাদায় হাঁটা। (১২) আমরা বগুড়া থেকে ট্রেনে বোনারপাড়া নেমে বাকী কয়েক মাইল রাস্তা প্রায় হেটেই যেতাম। যদিও বোনারপাড়া থেকে রিকশা ভাড়া পাওয়া যেত। কিন্তু রিকশাওয়ালা প্রায় হেঁটেই চলত। মনে পড়ে ৭.৫.৮৯ইং তারিখে বারকোনা সম্মেলনে যাওয়ার সময় বোনারপাড়া থেকে আমি ও আব্দুল মতীন সালাফী একটা রিকশা নেই। রাস্তা হোঁটরা। মাঝে-মধ্যে হাবড়। এরূপ রাস্তায় রিকশায় বসে থাকাও দায়। মাইল দু'য়েক বাকী থাকতে পড়ল এক হাবড়। দেখলাম সবাই সাইকেল ঘাড়ে করে হাঁটুকাদা ঠেলে পার হচ্ছে। আব্দুল মতীন আর যাবে না। বললাম, ভাই এখানেইতো ঈমানের

Contents

পরীক্ষা। আপনি সঊদী মাবঊছ। ঢাকায় বসে এমব্যাসেডর আপনাকে দেখবে না। কিন্তু আল্লাহ দেখছেন। আমরা যুবক মানুষ। চলুন না তিনজনে মিলে রিকশাটা উঁচু করে পার করি। শেষে সেটাই হ'ল। হাবড় পার হয়ে হাত-পা ধুয়ে ও কাপড়ে লাগা কাদা ছাফ করে পুনরায় রিকশায় উঠলাম। কিন্তু এলো বৃষ্টি। এঁটেল মাটি। রিকশা পিছলে যাচ্ছে ও কাদা জড়াচ্ছে। শেষে হেঁটেই গেলাম বাকী পথ। (১৩) একবার রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপযেলার ঝিনা থেকে মহিষের গাড়ীতে এলাম গভীর রাতে। উদ্দেশ্য কাকনহাট থেকে ভোর ৫-টার মেইল ট্রেন ধরা। শীতের রাতে কষ্টকর পথ অতিক্রম করে কাকনহাট বাজারে পৌঁছেই গাড়ী পড়ল গভীর হাবড়ে। মহিষ আর উঠতে পারে না। চালক ব্যর্থ হল। আমরাও কাদায় নামতে পারলাম না। ইতিমধ্যে ট্রেন এসে গেল এবং চলেও গেল। অতঃপর বেলা উঠলে লোকজন এসে গাড়ী টেনে উঠালো। আমরাও নামলাম। পরে বেলা ১০-টার লোকাল ট্রেন ধরে রাজশাহী এলাম।

(১৪) এভাবেই গিয়েছি পাবনার চর এলাকার কাবুলী পাড়ায়। এখানকার আহলেহাদীছদের কাবুলী ও ফারাযী বলা হয়। গেলাম চর প্রতাপপুর গ্রামে। পেলাম আব্দুর রশীদ ওরফে মধু মৌলবীর সন্ধান। যিনি দীর্ঘ ২৮ বছর বর্তমান পাকিস্তান সীমান্তের জিহাদ এলাকায় ছিলেন। এখানে যেতে গিয়ে আমাদের গাড়ী ধূলায় আটকে অচল হয়ে পড়ে থাকে বহুক্ষণ। আমরা নিরাশ হয়ে পড়ি। অবশেষে আল্লাহ্র রহম হয়। এ ঘটনার অনেক পরে ৫.১১.৯৪ ইং তারিখে যখন আমরা হড়গ্রাম থাকতাম। তখন একদিন রাজশাহী শহরের এক নামযাদা ডাক্তারের কাছে এসেছি চিকিৎসা নেওয়ার জন্য। অপেক্ষমাণ রোগীদের মধ্যে একজনকে পেলাম ঘাড়ে সার্ভিক্যাল কলার দিয়ে বসা অবস্থায়। পরিচয় নিয়ে জানলাম উনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ম্যানেজার। বাড়ী পাবনা কাবুলীপাড়া। মধু মৌলবীর ছেলে। আমি খুশী হয়ে তার সাথে তাঁর বাসায় গেলাম। সঙ্গে আমার মেজ ছেলে নাজীব ছিল। সেখানে গিয়ে পেলাম তার বাপের রেখে যাওয়া এমন একটি উর্দু বই, যা নেপাল সফরের সময় স্বয়ং লেখকের কাছেও পাইনি। আরও পেলাম ১৩২৩ বাংলা সালের কলিকাতার আহলেহাদিস ১ম বর্ষের বাঁধাই কপি। এভাবেই আল্লাহ আমাকে গায়েবী মদদ করেছেন এই থিসিসটি করার জন্য। এমনকি ৭৫০ পৃষ্ঠার হস্তলিখিত বিরাট সংগ্রহ সহ দামী ব্রিফকেসটি আল্লাহ ডাকাতের হাত থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, যা ইতিপূর্বের সাক্ষাৎকারে বলেছি। কিন্তু এই মহান আন্দোলনের বিরোধী ডাকাতদের হামলা থেকে বাঁচতে পেরেছি কি? বাঁচতে পারিনি ঘরের ও বাইরের হিংসা ও দুশমনী থেকে। যেকোন সৃষ্টির পথে এগুলিই হ'ল অনাসৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী ও দৃঢ়প্রত্যয়ীদের কেউ দমাতে পারে কি?

দু'টি ঘটনা : সাধুর মোড়ে টুইন বাসার তৃতীয় তলায় পূর্বপার্শ্বে ৮০০ টাকার দুই কক্ষের ভাড়া বাসায় ছিলাম ১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত। বই-পত্রে ভরা ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে তার উপর বসে থিসিস লিখতাম। হঠাৎ একদিন বিকালে দরজায় নক করায় খুলে দেখি উপশহরের পূর্বপরিচিত মুখলেছুর রহমানের সাথে বিশাল দেহী সঊদী যুবক আব্দুল্লাহ আব্দুল করীম আল-উলা'ঈ দাঁড়িয়ে। উনি সঊদী রিলিজিয়াস এটাশে। কিন্তু বসাবো কোথায়? সোফা তো নেই। অবশেষে খালি মাদুরেই। চারিদিকে আলমারি ভরা কিতাব ও আমার চারপাশে ছড়ানো বই-পত্র দেখে প্রথমেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'আলেম কাবীর'। তারপর যা বললেন, তার সারকথা এই যে, একটা বড় প্রজেক্ট আমাদের হাতে আছে। আব্দুছ ছামাদ বললেন, রাজশাহীতে জায়গা আছে। তাই এ্যামবাসেডর আপনার কাছে পাঠালেন। আপনি সম্মত হলে এবং একাউন্টে থাকলে প্রজেক্ট দেওয়া হবে। নইলে নয়। ঝামেলা হবে ভেবে আমি প্রথমে রাযী হইনি। পরে বিদ'আতীরা নিয়ে যাবে ভেবে রাযী হই। উনি ধন্যবাদ দিয়ে খুশীমনে হোটেলে চলে গেলেন। হ্যাঁ সেই প্রজেক্টই হ'ল আজকের নওদাপাড়া মারকাযের পূর্বপার্শ্বের নীচতলা। পরের তলাগুলি এবং পশ্চিমপার্শ্বের মাটি ও বিল্ডিংগুলি অন্য সংস্থার সাহায্যে করা হয়েছে।

(খ) রাত ১০-টা বাজে। আমি লেখাপড়ায় ব্যস্ত। হঠাৎ দরজায় নক ও আব্দুল ওয়াহেদ ভাইয়ের পরিচিত কণ্ঠ। দরজা খুলতেই মদের গন্ধ মুখে ঘরে ঢুকল এলাকার এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। দু'লাখ টাকা দেন, নয় চলে যান এক সপ্তাহের মধ্যে। সেটাই হ'ল। মাসের শেষে বাসা পাওয়া যায় না। তবুও এক সপ্তাহের মধ্যে চলে যেতে হ'ল শহরের অন্য প্রান্তে হড়গ্রামের এক ভাড়া বাসায়। পরে সেখানেও উৎপাত হয়। ফলে আমার মসজিদে যাওয়া বন্ধ হ'ল। এমনকি চারদিন বাজারে অপদস্ত হই। যাতে শান্তমনে থিসিস করতে না পারি এবং যাতে আহলেহাদীছ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে ১৯৯৬ সালের ২৬ শে এপ্রিল নওদাপাড়া মারকাযে চলে আসি। এখনকার বিপদ সবারই জানা।

থিসিসটি এভাবেই করা এবং এর অধিকাংশ তথ্য অত্যন্ত কষ্টকরভাবেই সংগ্রহ করা। যা উভয় বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। যারা থিসিসটির টীকাগুলি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, তারা বহু কিছু তথ্য সেখানে পাবেন। আর সেকারণেই থিসিসটির সম্মানিত সুপারভাইজর (বর্তমানে প্রফেসর এমিরেটাস, রাবি) খুশীমনে বলেছিলেন, আমার জানা মতে কেবল রাজশাহী নয়, বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এত মূল্যবান ডক্টরেট থিসিস একটিও লিখিত হয়নি। ফালিল্লাহিল হাম্দ। *(চলবে)*

শরণার্থী সংকট : চিন্তিত বিশ্ব নেতৃবৃন্দ!

-মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

ভূমিকা :

যুদ্ধের দামামা শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই নয়, ছড়িয়ে পড়েছে যেন সারা বিশ্বে। বিধ্বস্ত মানুষ কোন্ গন্তব্য ছুটছে তারা জানে না। এক অচেনা স্বপ্নময় দেশের সন্ধানে। এদের যাত্রা প্রতিদিন প্রলম্বিত হচ্ছে। শরণার্থীতে ভরপুর ইউরোপের রাজপথ। হাযার হাযার মাইল পাড়ি দিতে হচ্ছে। কখনো অথৈ সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায়, কখনো সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার সঙ্গে, কখনো যুদ্ধ করে হাযারো মানুষ মরছে সমুদ্রের বিশালতার কাছে। তুরস্ক থেকে গ্রিস, এরপর মেসিডোনিয়া, সার্বিয়া, হাঙ্গেরি এবং অস্ট্রিয়া হয়ে জার্মানি পৌঁছাচ্ছে ইরাক, সিরিয়ার শরণার্থীরা। প্রায় আড়াই হাযার মাইল পথ কেউ পাড়ি দিচ্ছে পায়ে হেঁটে, কেউ সাইকেলে চড়ে, কেউবা পৌঁছাচ্ছে নৌকায় আরোহণ করে। লাখ লাখ মানুষ আশ্রয়হীন, খাদ্যের অভাবে শিশুরা নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। উঠতি বয়সের বালিকারা বিক্রি হচ্ছে, তবুও মানুষের যাত্রা থেমে নেই। থামবার যেন কোন জো নেই। একটি সুন্দর আশ্রয় খোঁজার চেষ্টারত হাযার হাযার শরণার্থী এখন এক দেশের সীমান্ত থেকে অন্য দেশের সীমান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। সত্যিই মানবতা আজ লাঞ্ছিত, লজ্জিত ও অপমানিত।

শরণার্থীদের পরিচয় :

‘সশস্ত্র সহিংসতা ও নিপীড়ন থেকে দূরে কোথায় পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চায় যারা, তারাই শরণার্থী’। ২০১৪ সালের শেষ হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ১৯.৫ মিলিয়ন লোক শরণার্থী। তন্মধ্যে ৫.১ মিলিয়ন ফিলিস্তীনী, ৩.৯ মিলিয়ন সিরিয়ান, ২.৬ মিলিয়ন আফগান, ০.২৫ মিলিয়ন লেবানন, ০.১১ মিলিয়ন জর্ডান, দুই থেকে পাঁচ লক্ষ রোহিঙ্গা এবং ৩২,৩৫৫ জন বাংলাদেশী।[৯৬]

২০১৪ সালে শরণার্থীদের আশ্রয়দানে শীর্ষে তুরস্ক, পাকিস্তান, লেবানন, ইরান, ইথিওপিয়া, জর্ডান। ২০১৫ সালে শরণার্থী সংখ্যার শীর্ষে সিরিয়া ৩৮%, ইরিত্রিয়া ১২%, আফগানিস্তান ১১%, নাইজেরিয়া ৫%, সোমালিয়া ৪%।[৯৭] তাদের বর্তমান পরিস্থিতি এতই বিপদসংকূল ও অসহনীয় যে, তারা নিজ দেশের সীমান্ত ডিঙিয়ে আশেপাশের দেশগুলোতে জীবনের নিরাপত্তা খোঁজে বেড়ায়। এভাবেই তারা শরণার্থী হিসাবে স্বীকৃতি পায়। শরণার্থীদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে। ১৯৫১ সালের শরণার্থী সম্মেলন এবং ১৯৬৭ সালের শরণার্থী সম্মেলনে গৃহীত আইনই আধুনিক শরণার্থীদের নিরাপত্তার মূলনীতি।

৯৬. Encyclopedia।
৯৭. দৈনিক আমাদের সময়, শনিবার, ৮ আগস্ট ২০১৫, পৃঃ ৫।

Wikipedia এবং Encyclopedia Britannica-তে শরণার্থীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে, ‘অভিবাসীর সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে- জেনেভা কনভেনশন অনুসারে যে ব্যক্তি জাতীয়তার দিক থেকে অন্য দেশের, কিন্তু সেদেশে তার অত্যাচার-নির্যাতনের ভয় অত্যন্ত প্রবল ও সুসজ্জিত। কারণ তার জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা বিশেষ সমাজের, রাজনৈতিকভাবে এবং নিজ দেশে বাসস্থান বা আশ্রয়স্থল অর্জন করতে অক্ষম। ভয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত, তার নিজ দেশের সরকার তার উপকারে অনিচ্ছুক। এ কারণে তার জাতীয়তার অস্তিত্ব নেই; পূর্বের কোন ঘটনার জের ধরে নিজ দেশের বাহিরে অবস্থান করা অভ্যাসগত বাসস্থান, তবে নিজ দেশে ফিরতে অনিচ্ছুক; কারণ জীবন সংকট ও ভয়ের কারণে নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত। আর এ রকম আশ্রয় অন্বেষা ব্যক্তিই ‘শরণার্থী’ হিসাবে বিবেচিত’।[৯৮]

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ‘ইউএনএইচসিআর’-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছর জুলাই পর্যন্ত এক লাখ ৮৮ হাযার শরণার্থী জার্মানিতে আশ্রয় চেয়েছেন। গ্রিস ও পশ্চিম বলকান হয়ে সড়ক পথে ইউরোপে ঢোকার পথ কম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এ বছর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আবেদন জমা পড়েছে হাঙ্গেরিতে। সংখ্যার হিসাবে জার্মানি সবচেয়ে বেশি আশ্রয়প্রার্থীর আবেদন পেলেও জনসংখ্যার অনুপাতে তুলনা করলে এ তালিকার শীর্ষে থাকবে সুইডেন। সেখানে প্রতি এক হাযার মানুষের বিপরীতে আটজন আশ্রয়পার্থীর আবেদন জমা পড়েছে। এরপর রয়েছে হাঙ্গেরি (৫ হাযার) ও জার্মানি (৩ হাযার)। আনুপাতিকহারে বিবেচনা করলে আশ্রয়পার্থীদের পসন্দের তালিকায় সবচেয়ে নীচের সারিতে আছে যুক্তরাজ্য। সেখানে প্রতি ২০ হাযার মানুষের বিপরীতে একজন আশ্রয় চেয়েছেন।

৯৮. A **refugee**, in contrast to amigrant, is according to the Geneva Convention on Refugees applied to a person who is outside their home country of citizenship because they have well-founded grounds for fear of persecution because of their race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, and is unable to obtain sanctuary from their home country or, owing to such fear, is unwilling to avail themselves of the protection of that country; or in the case of not having a nationality and being outside their country of former habitual residence as a result of such event, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to their country of former habitual residence. Such a person may be called an "**asylum seeker**" until considered with the status of "refugee".

সুধী পাঠক! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে বড় এই শরণার্থী সংকটের মূলে রয়েছে 'সিরিয়ার যুদ্ধ'। এ ছাড়া আফগানিস্তানের অস্থিরতা, ইরিত্রিয়ার দমন-পীড়ন এবং কসোভর দারিদ্র্যতাও বহু মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে ইউরোপের পথে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী চলতি বছর আগস্ট পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমান্তে পৌঁছেছে অন্তত সাড়ে তিন লাখ শরণার্থী। ২০১৪ সালের পুরো বছরে এই সংখ্যা ছিল দুই লাখ ৮০ হাযার।[৯৯] জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে, চলতি বছরে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ভিন দেশের তীরে পৌঁছানো শরণার্থী ও অভিবাসীর সংখ্যা তিন লাখ ছাড়িয়েছে। এদিকে অস্ট্রিয়ার সীমান্তে একটি লরি থেকে অন্তত ৭১ শরণার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আফ্রিকা, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ থেকে ভূমধ্যসাগর হয়ে অবৈধভাবে ইউরোপে প্রবেশ করছে শরণার্থীরা। সাগরপথে প্রবেশ করতে গিয়ে প্রতিবছরই অনেক শরণার্থীর মৃত্যু হয়। চলতি বছর সাগর পাড়ি দিয়ে গ্রীসে পৌঁছেছে প্রায় ২ লাখ শরণার্থী। এছাড়া ইতালিতে পৌঁছেছে প্রায় ১ লাখ ১০ হাযার মানুষ। গত বছরের তুলনায় এ সংখ্যাটা ছিল অনেক বেশি। ২০১৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ২ লাখ ১৯ হাযার। উত্তাল সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাযার মানুষ মৃত্যু বা নিখোঁজ হয়েছে। ২০১৪ সালে এ সংখ্য প্রায় সাড়ে তিন হাযার ছিল বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ।[১০০]

শরণার্থী ও অভিবাসী :

গোষ্ঠীগত যুদ্ধে বিধ্বস্ত বিশ্বের প্রায় ৬ লাখ মানুষ ঘরছাড়া। জীবন বাঁচাতে ছোট্ট নৌকায় উত্তাল ভূ-মধ্যসাগরে ভেসে আশ্রয়ের তীর খুঁজছেন তারা। অনেকে কূলে ভিড়ছেন, কেউ কেউ সাগরের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্ব গণমাধ্যমে এটি প্রতিদিনের শিরোনাম। খবরে এদের শরণার্থী ও অভিবাসী বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু দু'টি শব্দের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের তা মাথায় রাখা আবশ্যক। রয়েছে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন পরিচয়, যা জানা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর।

সরাসরি মৃত্যু বা নিপীড়নের হুমকির কারণে নয়, বরং উন্নত জীবনের জন্য কাজের সন্ধানে কিংবা শিক্ষাগ্রহণ, পারিবারিক পুনর্মিলন কিংবা এরকম অন্যান্য কারণে যারা যায়, তারা অভিবাসী। শরণার্থীদের মত এদের নিরাপদে বাড়ি ফিরতে কিন্তু কোন বাধা-বিপত্তি নেই। যদি তারা নিজ ভূমিতে ফিরতে চায়, তাহ'লে নিজ সরকারের কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবে।[১০১]

শরণার্থী সমস্যার কারণসমূহ :

সমৃদ্ধ জনপদ সিরিয়া জ্বলছে, এক সময় হয়তো বিরানভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। যেমন নিঃস্ব হয়ে গেছে ইরাক-লিবিয়া। তেমনি এক সময় সমৃদ্ধ জনপদে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ইসলামিক স্টেট কিংবা সরকারবিরোধী প্রতিপক্ষের হাতে সাধারণ মানুষগুলো আজ অসহায়। পশ্চিমা বিশ্ব যা চেয়েছিল, সেটায় বাস্তবে ঘটছে। তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো চলে যাচ্ছে একে একে তাদের হাতে। মুসলিম দেশগুলো চেয়ে চেয়ে দেখছে সভ্যতার এই প্রহসন। সিরিয়া যখন জ্বলছে, মুসলিম বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ তখন খুঁজছে তাদের বাঁচার আকুতি। সিরিয়া ও আফগানিস্তান এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর মানুষ দলে দলে কেন ভিটেছাড়া হচ্ছে, ইউরোপ অভিমুখে কেন বাড়ছে অসহায় অভিবাসীদের জনস্রোত? শরণার্থী সংকটের এ বিস্ফোরণের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন বিবিসির প্রধান আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি লিস দাউচেট। 'মাইগ্রান্ট ক্রাইসিস : হোয়াই ইজ ইট ইরাপ্টিং নাও'? শীর্ষক তার বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনের নির্বাচিত অংশের মূল কথা হ'ল, 'পুরনো যুদ্ধ শেষ হয় না। নতুন একটি যুদ্ধ এসে যোগ হয়'।

পশ্চিমা শক্তিগুলো বিমান হামলা পরিচালানায় মত্ত। যুদ্ধরতপক্ষগুলোকে সমঝোতায় পৌছাতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে 'শান্তিসূচী' নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা করছে জাতিসংঘ। এই রাজনৈতিক পরিকল্পনা নতুন ও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু সিরীয়রা তো চিন্তিত। ত্রাণ ফুরিয়ে আসছে। তাছাড়া তথাকথিত ইসলামিক স্টেটের মত চরমপন্থী বাহিনীগুলো থেকে প্রাণনাশের হুমকিতো আছেই। তারা এ আশাও ছেড়ে দিয়েছে যে, যুদ্ধ থেমে যাবে। বরং তারা নিজেরাই ছক কষেছে, বানিয়েছে নিজেদের দল। ইন্টারনেট থেকে গুগল ম্যাপ ঘেঁটে ইউরোপ যাত্রার পথ বের করছে তারা। আর ফেসবুক গ্রুপ থেকে পরামর্শ নিচ্ছে, যারা আগে সেখানে পৌঁছেছেন তাদের থেকে এবং অন্যান্য দেশ থেকে তাদের সঙ্গে যাত্রা করছে আরও অনেকে।[১০২]

সুধী পাঠক! শিশু আয়নালের নিথর দেহ একটা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। সে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালায় নিজের জীবন দিয়ে বিশ্বের কাছে শরণার্থীদের জন্য আপাতত এক শান্তির আশ্বাস রেখে গেছে। লাখ লাখ মানুষকে বাসযোগ্য করে গেছে এক শিশু আয়লান। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, আগামীর পৃথিবী আসলেই কি শংঙ্কামুক্ত হবে? কারণ যুগ যুগ ধরেই তো যুদ্ধ বাধানোর খলনায়করা দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে গেছে। তাছাড়া যুদ্ধ মানেই তো বিরান হওয়া জনপদ, শিশুর বুকফাটা ক্রন্দন, ধর্ষিতা মেয়েদের আর্তনাদ, দেশান্তরী মানুষের আহাজারী। আজকের সিরিয়ার লাখ লাখ শরণার্থী যেমন আলোচিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী, ঠিক তেমনি আলোচিত হয়েছিল নব্বয়ের দশকের ইউরোপের বলকান যুদ্ধের ১.২

---

৯৯. দৈনিক আমাদের সময়, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃঃ ৪।
১০০. দৈনিক আমাদের সময়, ২৯ আগস্ট ২০১৫, পৃঃ ৫।
১০১. দৈনিক আমাদের সময়, ২৯ আগস্ট ২০১৫, পৃঃ ৫।
১০২. দৈনিক আমাদের সময়, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃঃ ৫।

মিলিয়ন শরণার্থীর কথা। ঠিক সেভাবেই উচ্চারিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অন্তত ১৫ মিলিয়ন শরণার্থীর কথা। আর এভাবেই মরু পর্বত আর অথৈ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫৯.৫ মিলিয়ন মানুষ হয়েছে দেশান্তরী।[১০৩]

লিবিয়া, ইরাক এবং সম্প্রতি সিরিয়া থেকে দলে দলে মানুষ কেন দেশত্যাগ করছে তার মূল কারণ খুঁজতে গেলে কোন্ চেহারাগুলো ভেসে উঠবে, তা যেন ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ বুঝতেই পারছেন না। ব্রিটেন ওদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অনুদার মনোভাব নিয়েছে। উত্তর পশ্চিমের সুইডেন দুয়ার খুলতেই নারাজ। ফ্রান্সও দুয়ার এঁটে বসে থাকতে চাইছে। জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সরকার ঔদার্য অবাধ ছিল না। উদ্বাস্তুর সংখ্যা লাখ ছোঁয়ার আগেই তটস্থ হয়ে ওরা সীমানা বন্ধ করে দিয়েছে। মনের কথা খুলে বলেছেন, হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী মুসলিম উদ্বাস্তু নিতে তার আপত্তি আছে। তার মনোভাব হচ্ছে তারই মত পুরো ইউরোপেরও আপত্তি থাকা উচিত।

লিবিয়া, ইরাক, সিরিয়া থেকে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত তারা পুত্র পরিবারসহ মানুষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দেশ ছাড়তে চাইছে কেন? আর কেউ না বুঝলেও ইউরোপ কে তো জানার কথা। তিনটি দেশে যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে কারা? এসব অঞ্চলে যে 'আইএস' ও 'আইএসএল' নামে মুসলিম জঙ্গি সংগঠন সৃষ্টি হয়ে মানবতা ও সভ্যতার বিরুদ্ধে যে তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে তাদের এই সুযোগ কারা তৈরি করে দিয়েছে? কারাই বা তৈরি করেছিল 'আল-কায়েদা', 'তালেবান'-এর মত জঙ্গীগোষ্ঠী? আন্ডারওয়ার্ল্ডে কারা ছিল ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা ওমর কিংবা জাওয়াহিরি বকরদের উত্থানের পেছনে? একটু খবরাবর রাখেন যারা তারা অবশ্যই জানেন। কোন্ দেশগুলোর অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি অস্ত্রব্যবসা? মানুষ এও জানে ডব্লিউএমডি বা গণবিধ্বংসী অস্ত্র মওজুদের অজুহাত তুলে স্থিতিশীল দেশ ইরাকে আক্রমণ চালিয়ে সাদ্দামকে হত্যা করে সেখানে গৃহযুদ্ধের নৈরাজ্য সৃষ্টি কারা করেছিল? মানুষ আরো জানে, গণতন্ত্রের নামে লিবিয়া আফগানিস্তানে উপজাতীয় বিবাদ উসকে দিয়ে গৃহযুদ্ধের অবস্থা তৈরি করেছে কোন্ মিত্রশক্তি। আজ সিরিয়ায় আসাদ সরকারকে হটানোর নামে কারা সে দেশের স্থিতিশীলতা ভেঙে দিয়ে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে? তা কি কারও অজানা?

আজকের ইউরোপ অভিমুখী পরিবারগুলো তো এসব গৃহযুদ্ধেরই অসহায় বলি? অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রই এই মারাত্মক মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টির মূল কারিগর। ব্রিটেন-ফ্রান্স-জার্মানি মৈত্রি সূত্রে গণতন্ত্রের নামে এসব আগ্রাসনে অংশ নিয়েছে। সুইডেন খুচরা অস্ত্রের ব্যবসায় শীর্ষদের অন্যতম। কে না জানে গৃহযুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এ রকম অস্ত্রই। আইএসের কাছ থেকে কিংবা দস্যুতায় লিপ্ত গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে তেল কিনছে যেসব বহুজাতিক কোম্পানি তাদের মালিকানা কাদের সে সবও সবার জানা। তাছাড়া ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরো জানা যাবে কিভাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগাল ছাড়াও হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের মত ছোট ছোট ইউরোপীয় দেশও একসময় এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য হামলে পড়েছিল। আমরা জানি, কেমন নৃশংসতার পাশবিকতায় তারা সব লুটে নিয়েছে উপনিবেশগুলোর। প্রশ্ন হ'ল, আজ পর্যন্ত সেসব বহুজাতিক কোম্পানির আড়ালে তেল ও অন্যান্য বাণিজ্যের ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখছে কারা? মানুষ তো সব জানে। ইউরোপের বিত্ত-বৈভব, ঐশ্বর্য আর নাগরিকদের উচ্চমান জীবনের পেছনে বিপুল পুঁজির জয়গান এসেছে কীভাবে, সে ইতিহাস আজ কারও অজানা নয়।

উত্তর আফ্রিকা ও মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আধুনিক জীবনব্যবস্থায় অগ্রগামী ছিল লিবিয়া ও ইরাক। তদুপরি এ দু'টি দেশের সরকারপ্রধান সাদ্দাম হোসেন ও মুয়াম্মার গাদ্দাফী ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। তাই এসব দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো অস্থির হয়ে পড়েছিল। সরাসরি হস্তক্ষেপ করে দেশ দু'টি তছনছ করে দিয়েছে। ইরান আর সিরিয়াকে বাগে আনতে না পেরে বড়ই পেরেশান আছে পশ্চিমা গ্রুপ। অবশেষে সিরিয়ার ব্যাপারে ধৈর্য রক্ষা করা গেল না। আক্রমণে এগিয়ে এলো আইএস, স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে পশ্চিমা গ্রুপের। আর এরই খেসারত হিসাবে এত মানুষের ঢল ইউরোপ অভিমুখে। যুক্তরাষ্ট্র জানে উত্তর আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে তার দেশে ঢোকা সম্ভব নয়। যদি যায় তো ভূমধ্যসাগর অথবা তুরস্ক হয়ে ইজিয়ান সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাবে মানুষ। ফলে তার গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না।

গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির ধুয়া তুলে একমেরু বিশ্বের নেতারা তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশকেই শক্ত স্বাধীন অবস্থানে থাকতে দিচ্ছে না। এভাবেই ভেঙে গেছে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে আফ্রো-এশীয় সংহতি পরিষদের, শক্তিহীন ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, আরব লিগ, ওআইসির মত সংগঠনগুলো। বরং ডব্লিউটিও এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গুলোর ভূমিকা জোরদার করে পশ্চিমা বিশ্বই এককভাবে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় চলে এসেছে। ওরা বারবার ধর্মের কার্ড খেলে চলেছে আর উত্তরোত্তর কট্টর জঙ্গিপন্থীদের ভরসা করছে ও উসকে দিচ্ছে। মুখে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের বুলি আওড়ালেও এসব কি কোথাও বাস্তবায়ন করেছে বা করতে পেরেছে? যেসব দেশে হাযার হাযার মানুষ খুন হয়েছে, লাখ লাখ মানুষ মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য হয়েছে এর খেসারত হিসাবে?

১০৩. ফারুক যোশি, আগামীর অনিশ্চয়তা, দৈনিক আমাদের সময়, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃঃ।

মূলতঃ মানুষের আর্থিক বাস্তবতা, সমাজনীতি, ধর্ম ও জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে অনেক কিছু। কিছু তার লিখিত, কিছু অলিখিত। বর্তমান দুনিয়ায় এখন যে শরণার্থী সমস্যা তার মৌলিক নাম আশ্রয় বা অভিবাসন। সমস্যা বিষয়টাকেও এখন নানা নামে অভিহিত করা হয়। যাই হোক আপাতত আমাদের দেশসহ সারা দুনিয়ায় সাড়া জাগিয়েছে এক শিশু। নির্মম বাস্তবতার শিকার শিশুটির দেশে গণতন্ত্র ছিল না বটে তবে মানুষকে এভাবে জান নিয়ে পালাতে দেখা যেত না। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কোনকালেও গণতন্ত্র ছিল না। সে কথা পশ্চিমা দেশগুলো জানত না? খুব জানত আর জানার পরও তাদের প্রধান দোস্ত ছিল ইরানের শাহ, লিবিয়ার গাদ্দাফি, ইরাকের সাদ্দাম হোসেন বা সিরিয়ার আসাদ। এখন যে শরণার্থী স্রোত ও মানবিকতার আহ্বান তার উভয় প্রান্তেও শক্তি পশ্চিমাবিশ্ব। এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের ধনী তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর নীরবতা অভাবনীয়।

শরণার্থী নিয়ে ইউরোপ ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি :

যেখানে লাখ লাখ মানুষ আশ্রয়হীন, খাদ্যের অভাবে শিশুরা কাতরাচ্ছে, বালিকারা বিক্রি হচ্ছে, মুসলিম সভ্যতায় পড়ছে আঁচড়। কোন দেশই যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষগুলোর দায় নিতে স্বেচ্ছায় চাইছে না, সেখানে হাঙ্গেরি প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ওরভানসহ কয়েকটি ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রের মুখপাত্ররা বলেছেন, মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তারা স্বাগত জানাতে পারছে না। কারণ এতে তারা তাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি হারাতে পারে। শরণার্থী ও অবৈধ অভিবাসীদের ঠেকাতে সীমান্তে হাঙ্গেরির পুলিশ কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করছে। বার্তা সংস্থা এএফপি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, রোসজকি শিবির থেকে যে ভিডিও করেন নারী স্বেচ্ছাসেবী মিশেলা তাতে দেখা গেছে, হেলমেট ও জীবাণু নিরোধক মাস্ক পরিহিত হাঙ্গেরি পুলিশ সদস্যের সামনে স্যান্ডউইচের ব্যাগের জন্য জড়ো হয়েছেন প্রায় ১৫০ জন শরণার্থী। এ সময় তাদের উদ্দেশ্যে পশুকে ছুড়ে দেওয়ার মত করে খাবার ছুড়ে দেওয়া হয়। ক্ষুধায় কান্নারত নারী ও শিশুরাও ওই খাবার ধরার চেষ্টা করছেন। অনেক শরণার্থীকে খাঁচার মত বেষ্টনীবিশিষ্ট কক্ষে শুয়ে থাকতে দেখা গেছে। অনেকে বেষ্টনীর ওপর উঠে চিৎকার করছে। মিশেলার স্বামী স্পিৎজেন্দরফর বলেন, এটি খাঁচাবদ্ধ পশুদের খাবার দেওয়ার মত। এদিকে লিবীয় উপকূলের সাগরপথে, গ্রিসের দ্বীপ মাড়িয়ে এরপর বলকানের সমতলভূমি হয়ে যাত্রা করেছেন আশ্রয়প্রার্থীরা। প্রতিটি পথেই বাধাগ্রস্ত হয়েছেন তারা। যে শহর দিয়ে নরওয়েতে শরণার্থীরা প্রবেশ করছেন, এর নাম কারকিনস। সেখানকার তাপমাত্রা শূন্যেরও নীচে। শহরটি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক থেকে চার হাযার কিলোমিটার উত্তরে। রাশিয়ার কারগাড়িতে চড়ে এই শহরে পৌঁছায় শরণার্থীরা। কেউ কেউ এতটা পথ না-কি সাইকেলে চড়েই পাড়ি দেন।[১০৪]

১০৪. দৈনিক আমাদের সময়, মঙ্গলবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃঃ ৫।

সুধী পাঠক! লাখ লাখ মানুষ আজ আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন। আয়লানের মত শিশুরা মরছে, ওদের জায়গা দিচ্ছে না তারা। ওদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য নেই কোন উদ্যোগ। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোয় শরণার্থী ও অভিবাসনপ্রত্যাশীদের অবাধ প্রবাহ ঠেকাতে রাজধানী বুদাপেস্টের প্রধান রেলগেটটি বন্ধ করে দিয়েছে হাঙ্গেরি। রেলস্টেশনের প্রধান ফটকের সামনে শতাধিক পুলিশ অবস্থান নেয়। রেলস্টেশন বন্ধের কারণ হিসাবে ভিসা সংক্রান্ত ইইউ আইনের দোহাই দিচ্ছে হাঙ্গেরি। অথচ আগের দিন ওই রেলস্টেশন থেকেই ট্রেনে চড়ে বিনা পাসপোর্ট ভিসাই তিন হাযারের বেশি শরণার্থী অস্ট্রিয়ায় পৌঁছেছে।[১০৫]

শরণার্থী ইস্যুতে বিশ্ব নেতাদের ধৃষ্টতা :

ক্রমবর্ধমান শরণার্থী সংকট নিরসনে ১৪ সেপ্টেম্বর বৈঠকে বসেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে তারা এ বৈঠক করেন। ইইউ প্রেসিডেন্টের কার্যালয় জানায়, ১৪ সেপ্টেম্বরের বিশেষ বৈঠকে বসেন জোটভুক্ত ২৮টি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা। কিন্তু তারা কোন সমাধানে আসতে পারেননি। জাতিসংঘ মনে করে, সিরিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সংঘাতই ইউরোপ অভিমুখে শরণার্থীদের ঢল নামিয়েছে। ইউরোপের কয়েকটি দেশের সরকার আর কোন শরণার্থী গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় আশ্রয়ের আশায় ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টারত হাযার হাযার শরণার্থী এখন এক দেশের সীমান্ত থেকে অন্য দেশের সীমান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। ক্রোয়েশিয়া জানায়, বুধবার থেকে প্রায় ১৭ হাযারেরও বেশী শরনার্থী প্রবেশের কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় তারা এমনটি করতে বাধ্য হচ্ছে। ক্রোয়েশিয়া সীমান্তের ঝুঁকিপূর্ণ ৪১ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতার বসিয়েছে হাঙ্গেরি। ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইউরোপে অভিবাসন প্রত্যাশী হাযার হাযার শরণার্থীর জীবনে কী ঘটতে চলেছে, তা নিয়ে বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে। ক্রোয়েশিয়া থেকে সীমান্ত পাড়ি দেওয়া চেষ্টাকারী একদল শরনার্থীকে ছত্রভঙ্গ করতে শুক্রবার রাতে পেপার স্প্রে ব্যবহার করে স্লোভেনিয়া পুলিশ। বলকান হয়ে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের দেশগুলোতে যাওয়ার চেষ্টাকারী হাযার হাযার অভিবাসন প্রত্যাশী রেলস্টেশন ও রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছেন।[১০৬] ক্রোয়েশিয়া এখন হাযার হাযার শরণার্থীকে স্লোভেনিয়া আর হাঙ্গেরির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অন্যদিকে হাঙ্গেরি তাদের ঠেলে দিচ্ছে অস্ট্রিয়ার দিকে। ক্রোয়েশিয়া তাদের দেশে প্রবেশ করা শরণার্থীদের বাস ও ট্রেনে করে হাঙ্গেরির উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া শুরু করেছে।[১০৭]

১০৫. বিবিসি, রয়টার্স; দৈনিক আমাদের সময়- বুধবার, ০২-০৯-২০১৫, পৃঃ ৫।
১০৬. দৈনিক আমাদের সময়- রোববার, ২০-০৯-২০১৫, পৃঃ ৫।
১০৭. বিবিসি, এএফপি।

Contents

এদিকে ১২ সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের রাজপথে হয়ে গেল এক বিশাল র‍্যালি। শরণার্থীদের সহযোগিতা দিতে এবং সারা ইউরোপের নেতাদের প্রতি চাপ প্রয়োগ করতে মূলতঃ এই র‍্যালি। লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিনসহ প্রায় সব বিরোধীদলীয় নেতারা এ র‍্যালিতে অংশ নেন। শুধু ব্রিটেনের সরকারই নয়, সারা ইউরোপের নেতাদের প্রতি শান্তির অন্বেষণে বার্তা পৌঁছেছে এ র‍্যালি। যারা সত্যিকার অর্থে নির্যাতিত অসহায়-আশ্রয়হীন, সারা পৃথিবীর মাঝে যারা এক টুকরা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে, এই সমাজে যারা কিছুটা হ'লেও দিতে চায়, এরা আমার আপনার মতই মানুষ। আসুন! আমরা একত্রে এদের নিয়ে শান্তি, ন্যায়বিচার আর মানবতার পথে অগ্রসর হই। এভাবেই নেতা হওয়ার প্রথম দু'ঘণ্টার মধ্যেই দশ সহস্রাধিক মানুষের সমাবেশে বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন তাদের সামনে চলার ভাবনা।

মৃত ছবির আহ্বানে মিলল শরণার্থীদের আশ্রয় :

গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার নৌকাডুবিতে প্রাণ হারায় তিন বছর বয়সী সিরীয় শিশু আয়লান কুর্দি। গ্রিক উপকূলে তুরস্কের বোডরাম সৈকতে শরণার্থীবাহী নৌডুবির ঘটনায় তিন বছরের শিশু আয়লান, তার ভাই গালিপ ও মা রেহানসহ ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বোডরাম সৈকতে পড়ে থাকা তার নিথর দেহের ছবি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। আর এতেই তোলপাড় শুরু হয়। ইউরোপের উন্নত দেশগুলোই শুধু নয়, বিশ্বের সব দেশের সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রনেতারা অসহায় শরণার্থীদের আশ্রয়দানের ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে ওঠে। প্রায় চার লাখের মত শরণার্থী গত ছয় মাসে ইউরোপে প্রবেশ করেছে। ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান আলোচ্য এখন রিফিউজি কিংবা শরণার্থী সমস্যা। ফলে জার্মান আট লাখ যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষদের জায়গা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ভূমধ্যসাগরের উত্তাল জলরাশিতে কিংবা বলকান সমতলে আটকে পড়া শরণার্থীদের বাঁচাতে সোচ্চার হয়ে ওঠে তথাকথিত মানবতাবাদী বিশ্ব। সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে জার্মানি। দেশটির চ্যান্সেলর ঘোষণা দিয়েছেন, যত দরকার তত শরণার্থী আশ্রয় দিতে তৈরি আছে জার্মানি। এ ঘোষণার পর পরই হাঙ্গেরি আটকে রাখা শরণার্থীদের বাসযোগে পৌঁছে দেয় অস্ট্রিয়া সীমান্তে। বেশিরভাগ শরণার্থীর গন্তব্যই জার্মানি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১০ হাযার শরণার্থী পৌঁছেছে মিউনিখে। শুধু জার্মানি বা অস্ট্রিয়া নয়, যুক্তরাজ্য, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ আরও অনেক দেশ শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস গতকাল বলেছেন, ভ্যাটিকানও শরণার্থীদের আশ্রয় দেবে। মিসরীয় এক ধনকুবের গ্রিস বা ইতালি একটি দ্বীপ কিনতে চেয়েছেন শুধু শরণার্থীদের জন্য। 'সেভ দ্যা চিলড্রেনে'র আহ্বানে ব্রিটিশ এক শিশু সাহিত্যিক মাত্র তিন দিনে পাঁচ লাখ পাউন্ড অনুদান সংগ্রহ করেছেন। এসবই সম্ভব হয়েছে, আয়লানের ওই হৃদয় বিদারক ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা জানিয়েছে, চলতি বছর ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছেছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ অভিবাসন প্রত্যাশী। সাগরের বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে প্রায় তিন হাযারের মত মানুষের। জার্মানি ছাড়া জর্ডান, লেবানন ও তুরস্কে বহুসংখ্যক সিরীয় আশ্রয় নিচ্ছে। সঊদী আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে সঊদী বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, সঊদী আরব চার বছর আগে শুরু হওয়া যুদ্ধে বিধ্বস্ত সিরিয়ার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে আত্মপ্রচার বা লড়াই করতে চায়নি। সিরীয় সংকট মোকাবিলায় সঊদী পদক্ষেপ সংক্রান্ত 'মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর' খবরের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সঊদী আরব বলেছে, তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার ২৫ লাখ লোককে আশ্রয় দিয়েছে। এছাড়া প্রায় ৭০ কোটি মার্কিন ডলার মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে বলেও দাবি করেছে সঊদী কতৃপক্ষ।[১০৮]

ইতালি-গ্রিস তাদের দেশের অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে। এর ওপর শরণার্থীদের স্রোত। তবুও তারা জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে তাদের দেশে। ব্রিটেন যেখানে অভিবাসন ইস্যুতে কঠোরনীতি গ্রহণ করেছে, সেখানেও যেন শিশু আয়লানের নিষ্পাপ দেহটি বদলে দিয়েছে সব। আপাতত ২০ হাযার শরণার্থী নেওয়ার প্রত্যয় আছে ব্রিটেনের। এদিকে গৃহবিধ্বস্ত সিরিয়ার অন্তত আরও ১০ হাযার শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সরকারকে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। গত বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউস থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জোস আর্নেস্ট তার দৈনন্দিন সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন।[১০৯]

এদিকে গৃহযুদ্ধ কবলিত সিরিয়ার নাগরিকদের যে ঢল নেমেছে ইউরোপের দেশগুলোয় শরণার্থী প্রত্যাশায়, সে ঢলে বাংলাদেশীও আছেন বলে জানিয়েছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস। অস্ট্রিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মাদ আবু জাফর এ খবর জানিয়েছেন। তবে শরণার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশীর সংখ্যা কত, তা স্পষ্ট করে বলেননি তিনি। এদিকে নতুন করে আরও অভিবাসনপ্রত্যাশী নেওয়ার ব্যাপারে অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর। ব্রিটিশ শিশুসাহিত্যিক প্যাট্রিক নেস সিরীয় শরণার্থীদের জন্য তহবিল গঠন করেছেন। মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে জমা পড়েছে ৫ লাখ ব্রিটিশ পাউন্ড। সেভ দ্যা চিলড্রেন ১০ লাখ পাউন্ড অনুদানের যে প্রাথমিক আহ্বান জানিয়েছে, তারই সমর্থনে বৃহস্পতিবার অনুদান সংগ্রহ শুরু করেন নেস।[১১০]

---

১০৮. দৈনিক আমাদের সময়- রোববার, ১৩-০৯-২০১৫, পৃঃ ৫।
১০৯. দৈনিক আমাদের সময়, শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃঃ ৫।
১১০. দৈনিক আমাদের সময়- সোমবার, ০৭-০৯-২০১৫, পৃঃ ৫।

Contents

সংকট উত্তরণে করণীয় :

শরণার্থীদের সংখ্যা নয়, বরং তাদের ব্যাপারে ইউরোপের সমন্বয়হীনতাই এই সংকট আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। বৈধ পথ নেই বলেই তারা জীবন বাজি রেখে অবৈধ পথে পাড়ি জমাচ্ছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচআর এমন মন্তব্য করেছে। সংস্থার পরিসংখ্যান মতে, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে ২ লাখ ২৪ হাযারেরও বেশি শরণার্থী ইউরোপে পৌঁছেছে। গত বছর প্রবেশ করেছিল ২ লাখ ১৯ হাযার শরণার্থী। সংস্থাটির মুখপাত্র উইলিয়াম স্পিন্ডলার বলেছেন, এ বিষয়টিতে ইউরোপীয় দেশগুলোকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় শরণার্থীদের প্রবেশে ইউরোপকে আরও বৈধ উপায় বের করতে হবে। তিনি বলেন, ইউরোপীয় দেশগুলোকে শরণার্থীদের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প, পারিবারিক পুনর্মিলন, বেসরকারি স্পন্সরশিপ প্রকল্প, চাকরি ও শিক্ষা ভিসার মাধ্যমে জায়গা দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে শরণার্থী সংস্থা। স্পিন্ডলার বলেন, ইউরোপে চলতি বছর সমুদ্র দিয়ে লোক প্রবেশের সংখ্যা বাড়া সত্ত্বেও ইউরোপীয় দেশগুলো স্বল্প সংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে, শরণার্থী সংস্থার অধীনে বিশ্বব্যাপী মোট শরণার্থীর ৮৬ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবস্থান করছে। যুদ্ধ, সহিংসতাসহ বিভিন্ন কারণে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশ থেকে লোকজন পালিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা মনে করি, যুদ্ধের দামামা থামাতে হবে, নীতি নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিতে হবে, তবেই থামবে শরণার্থী সংকট।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ‘তোমাদের কি হ’ল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করছ না অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা প্রার্থনা করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই অত্যাচারী জনপদ হ’তে মুক্ত কর এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হ’তে সাহায্যকারী প্রেরণ কর’ *(নিসা ৪/৭৫)* । অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‘অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং যমীনে বিদ্রোহ করে বেড়াই তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ *(শূরা ৪২/৩২)*।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, আমরা চাই নিরাপদ একটি বাসযোগ্য শান্তিময় বিশ্ব। মানচিত্রে কিছু জায়গা উজবুকের মত সবুজ করে রেখে আমাদের বিশ্ব বলে নাম দেওয়া দেশগুলোর মানুষরা কি করছে এই ক্রাইসিসে? আজ পুরো বিশ্বে ক্রান্তিকাল চলছে। সভ্যতার শীর্ষে থাকা দেশগুলোর আচরণ হয়ে উঠছে বেপরোয়া। যুদ্ধ-বিগ্রহ দাঙ্গা বা ঘরের শত্রু কেউ কাউকে মানছে না। কেউ নেই থামানোর। এটা ব্যর্থ হলে দলে দলে মানুষ শরণার্থী হয়। ফলে ধর্ম-বর্ণ-জাত নির্বিশেষে এ পৃথিবী এ মানব জাতি সভ্য ও সুন্দর হয়ে উঠুক এ কামনা ও এই কাজে আত্মনিয়োগের বিকল্প নেই। অভিবাসন একটি প্রক্রিয়া মাত্র। সে কিছু মানুষকে বাঁচাতে পারে, গোটা জাতিকে বাঁচাতে হ’লে চাই সার্বিক আত্মশক্তি। মহান আল্লাহ সকল শরণার্থীকে মুক্ত করুন-আমীন!!

[লেখক : সম্পাদক, মাসিক হারাবতী, জয়পুরহাট]

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় (খ)

জিহাদ আন্দোলন (২য় পর্যায়)

৬. আমীর নে'মাতুল্লাহ বিন মুতীউল্লাহ বিন আমীর আব্দুল্লাহ (১৩৩৩-৩৯/১৯১৫-২১) :

আমীর নে'মাতুল্লাহ্র সময়ে মুজাহিদ আন্দোলনের শতবর্ষব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গিতে এক দুর্ভাগ্যজনক পরিবর্তনের সূচনা হয়। যার পরিণতিতে স্বয়ং আমীর নে'মাতুল্লাহ্কে স্বদলীয়দের হাতে জীবন দিতে হয়। তিনটি প্রধান কারণে আমীর নে'মাতুল্লাহ (১২৯৪-১৩৩৯/১৮৭৭-১৯২১) ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন বলে জানা যায়। তার মধ্যে দু'টি ছিল ইংরেজ রেভিনিউ কমিশনারের কুঠি লুট করা ও পরবর্তীতে দু'জন ইংরেজ সেনা-অফিসারকে গুলি করে হত্যা করা। এ দু'টি বিষয় জিহাদের দৃষ্টিকোণ হ'তে সঠিক হ'লেও ইংরেজ তোষণকারী আম্ব-এর সর্দার ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং লুট করা অর্থসহ হত্যাকারী দু'জন মুজাহিদকে ইংরেজের হাতে সোপর্দ করে দেন। তৃতীয় কারণটি ছিল ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে দু'জন বাংগালী মুজাহিদ, যারা ঘাঁটিতে আসার পথে দশ হাযার টাকাসহ ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন।[১১১]

উপরের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে আমীর নে'মাতুল্লাহ হয়তবা সন্ধির চিন্তা করে থাকবেন। জিহাদের ঘটনাবলীর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত লেখক সাইয়িদ আবদুল জাব্বার সিত্তানবী বলেন, আমি নিজে এবং আরও অনেকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত দু'জন মুজাহিদ ও দশ হাযার টাকা ফেরতদানের জন্য চিঠি লিখি। আমাদের এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ উক্ত টাকা ফেরত দানের সাথে সাথে সম্ভবতঃ বার্ষিক দশ হাযার টাকা অনুদান হিসাবে আমীর ছাহেবের হাতে অর্পণ করে থাকবে।[১১২]

এই ব্যবস্থার ফলে মুজাহিদগণের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এলেও তাদের উদ্যমে ভাটা পড়ে। কারাকোরাম হ'তে রাসকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড় ও জংগলবেষ্টিত এই বিরাট স্বাধীন ভূমিতে কোটি কোটি জনগণের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু মুজাহিদ, যাদের সংখ্যা কখনোই ১২/১৪ শ'য়ের বেশী ছিল না, তাদের সংগঠিত এই জিহাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজশক্তি সর্বদা ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। শুধু একটি কারণে যে, তারা কোন অবস্থাতেই কুফরী ও বাতিল শক্তির সঙ্গে আপোষ করবে না। যদি আপোষ করাই তাদের উদ্দেশ্য থাক্ত, তবে হিন্দুস্থানে বসেই তারা অন্যান্যদের মত সুবিধা ভোগ করতে পারত। জানমাল বিসর্জন দিয়ে সুদূর আফগান সীমান্ত এলাকায় এসে পাহাড়ে-জংগলে বেঘোরে প্রাণ দিত না। মাত্র ১২/১৪ শত মুজাহিদ কখনোই একটা প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে পরাস্ত করতে পারে না- একথা যথার্থ হ'লেও ইসলাম যে কখনোই কুফরের সঙ্গে সন্ধি করতে পারে না একথা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য মুজাহিদগণের এই আত্মত্যাগ ইসলামী মর্যাদাবোধের প্রতীক ছিল। আর সেজন্যেই সারা হিন্দুস্থানের আপামর মুসলিম জনসাধারণ মুজাহিদগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। যদিও ইংরেজ তোষণকারী ও মুজাহিদগণের বিরোধী লোকেরা সংখ্যা কখনই কম ছিল না।

যাইহোক আমীর নে'মাতুল্লাহ্র এই পদক্ষেপ মুজাহিদগণের আত্মমর্যাদাবোধে ভীষণ আঘাত হানে। সাথে সাথে হিন্দুস্থানের অনেক সাহায্যকারীও হাত গুটিয়ে নেন। পরিণামে ১৩৩৯ হিজরীর ২৬শে শা'বান মোতাবেক ১৯২১ সালের ৪ঠা মে রবিবার সকালে ঘাঁটির একটি ঘরের ছাদের নির্মাণকাজ তদারকির সময় নিজের বিশ্বস্ত সাথী আব্দুর রশীদ ওরফে মুহাম্মাদ ইউসুফের গুলিতে তিনি নিহত হন।[১১৩] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৫ বছর।

আমীর নে'মাতুল্লাহ্র সময়ে ছোটবড় অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে ইংরেজ ক্যাম্প রুস্তম-এর যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধে মুজাহিদগণ এককভাবে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ইংরেজ পক্ষে ৬০০ শত সৈন্য হতাহত হয় এবং মুজাহিদপক্ষে মাত্র দশজন শহীদ ও ছয়জন আহত হন।[১১৪]

৭. আমীর রহমাতুল্লাহ (১৩৩৯-১৩৬৮/১৯২১-১৯৪৯ খৃঃ) :

আমীর নে'মাতুল্লাহ্র শাহাদাতের পর তদীয় শ্যালক মৌলবী রহমাতুল্লাহ বিন আমানুল্লাহ বিন আমীর আবদুল্লাহ সর্বসম্মতিক্রমে আসমাস্ত কেন্দ্রে আমীর নির্বাচিত হন।[১১৫]

১১১. 'সারগুযাস্ত', পৃঃ ৪৭৯; আবদুল মওদূদ ৮,০০০ হাযার টাকা লিখেছেন। -ওহাবী আন্দোলন, পৃঃ ১০৩।
১১২. 'সারগুযাস্ত', পৃঃ ৪৮১।
১১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৪।
১১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩।
১১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১৪।

ইনি আমীর আব্দুল করীম (১৩২০-৩৩/১৯০২-১৫)-এর নিকট লেখাপড়া শিখেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাক্বওয়া-পরেযগারী, ত্যাগ ও কুরবাণীতে অতুলনীয় ছিলেন। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন। নিরিবিলি ও সাধাসিধা জীবন পসন্দ করতেন। কাশ্মীরের স্বাধীনতাযুদ্ধে মুজাহেদীন জামা‘আত নিয়ে তিনি নিজে শরীক হন।[১১৬] তাঁর সময়ে মৌলবী বরকতুল্লাহ বিন আমীর নে‘মাতুল্লাহ ‘সালারে জামা‘আত’ বা প্রধান সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[১১৭]

আমীর রহমাতুল্লাহ্র সময়ে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় ছিল পত্রিকা প্রকাশ করা। যুগের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী তাবলীগের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে জামা‘আতের নিজস্ব প্রেস হ’তে দু’টি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। ‘আল-মুহার্‌রিয’ (المحـــرض) পত্রিকাটি ১৯৩৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর ১ম সংখ্যা বের হয়। যার শিরোনামে লেখা ছিল يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَـــرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَا ‘হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করুন’ *(আনফাল ৮/৬৫)*। দ্বিতীয়টি ‘আল-মুজাহিদ’ (المجاهـــد) নামে ১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে বের হয়। যার শিরোনামে লেখা ছিল وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِـــدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُـــوَ أَخْبَـــارَكُمْ ‘আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব, যতদিন না জানতে পারব কারা তোমাদের মধ্যে (সত্যিকারের) মুজাহিদ ও ধৈর্যশীল এবং যাচাই করব তোমাদের সার্বিক অবস্থাসমূহ’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩১)*। শেষোক্তটি মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর শহীদ (রহঃ)-এর স্মরণে বের হ’ত। দু’টি পত্রিকাই সাধারণতঃ ফারসী, উর্দূ এবং কখনো কখনো পশতু ভাষায় নিবন্ধ প্রকাশ করত।[১১৮]

চামারকান্দ কেন্দ্র :

আফগানিস্তানের জালালাবাদ শহরের উত্তর-পূর্বে কুনাড় নদীর তীরবর্তী হিন্দুকুশ পর্বতমালার পাদদেশে সুরক্ষিত চামারকান্দ এলাকায় ১৯১৫-১৬ সালে এই মুজাহিদ ঘাঁটি স্থাপিত হয়। জামা‘আতে মুজাহেদীনের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব মৌলবী আব্দুল করীম কান্নৌজী (মৃত্যু সম্ভবতঃ ১৯২২ খৃঃ) আমীর নে‘মাতুল্লাহ্র (১৯১৫-১৯২১ খৃঃ) উপরে নাখোশ হ’য়ে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।[১১৯] পাঁচ-সাতটি ছোট ও কাঁচা ঘরের এই কেন্দ্রটি উপমহাদেশে জিহাদ আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। আমীর নে‘মাতুল্লাহ ও আমীর রহমাতুল্লাহ্র (১৯২১-১৯৪৯) সময়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এই কেন্দ্রের এবং এর পরিচালক মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর (রহঃ)-এর।

(ক) মৌলবী মুহাম্মাদ বাশীর (১৩০৩-১৩৫২/১৮৮৫-১৯৩৪ খৃঃ) :

স্ত্রী, নাবালক চার সন্তান ও সংসারধর্ম ছেড়ে কাউকে কিছু না বলে ১৯১৫ সালের এক শুভ্রসকালে ৩০ বছরের যুবক মৌলবী আবদুর রহীম ওরফে মুহাম্মাদ বশীর জন্মভূমি লাহোর হ’তে একসময় সীমান্তের স্বাধীন মুজাহিদ এলাকায় পৌছে যান।[১২০] ইতিপূর্বে তিনি জিহাদের রসদ ও লোক সংগ্রহ করতেন। এবার তিনি নিজেই সশরীরে অংশগ্রহণ করেন শাহাদাতের অমিয়সুধা পানের নিমিত্তে। এই সময় ইউরোপে ১ম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। মাওলানা বশীর ইংরেজদেরকে সীমান্তযুদ্ধে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে সীমান্তের স্বাধীন সর্দারদের সঙ্গে এবং ইংরেজমিত্র আফগানশাসক আমীর হাবীবুল্লাহ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে সক্ষম হন। আফগান আমীর তাঁর জন্য বার্ষিক বার হাযার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। কিন্তু তিনি মাসিক মাত্র পাঁচ টাকা রেখে বাকী সব জিহাদ ফান্ডে দান করে দিতেন।[১২১] আসমাস্ত মূল কেন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তিনি ও তাঁর পরবর্তীগণ নিজেদেরকে ‘আমীর’ না বলে ‘ছদর’ বলতেন।[১২২] তাঁর আমলেই চামারকান্দের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কমবেশী চৌদ্দ বছর এই কেন্দ্র হ’তে জিহাদ পরিচালনার পর হিংসুকদের চক্রান্তে ১লা রামাযানের রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘাঁটিতে নিজ বিছানায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১২৩] (ক্রমশঃ)

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩০৭-৩১১

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১৭-১৮।
১১৭. ‘শাহযাদা বরকতুল্লাহ বক্তৃতা সংকলন’ পুস্তিকা (এম. এম, শরীফ আর্টিষ্ট, পেশোয়ার, তাবি। বক্তৃতা : ১৯৪৮ ইং), পৃঃ ১০।
১১৮. ‘সারগুযাস্ত’, পৃঃ ৫১৬-১৭।
১১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১৫, ৫৪৭-৪৭।
১২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪২-৪৩, ৫৬১।
১২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬১, ৫৪৫, ৫৪৪।
১২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫১।
১২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫৪।

আহলেহাদীছ পরিচিতি

-আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)

(শেষ কিস্তি)

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)

ইমাম তাক্বীউদ্দীন আহমাদ ইবনু আব্দুল হালীম ইবনু আব্দুস সালাম ইবনু তায়মিয়া হাররানী দামেশক্বী (রহঃ) একজন যুগপ্রবর্তক, ইসলাম জগতের অনন্যসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন মহাবিদ্বান, সমাজ সংস্কারক ও বীর সেনানী। তিন শতেরও অধিক গ্রন্থের প্রণেতা। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ তিন হাযারেরও অধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। আরবী সাহিত্য, তাফসীর, হাদীছ, তাওরাত ও ইনজীল, ন্যায়শাস্ত্র ও তদীয় যুগের গণিত, দর্শন ও বিজ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বিদ্বানগণ সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ যে হাদীছ অবগত নন, তাহা হাদীছ নয়। তিনি তাতারী অভিযানের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে সেনানীর ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনলবর্ষী বাগ্মিতার ফলে মুসলিম রাজন্যবর্গ তাতারী অভিযানের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তি নিয়োজিত করিয়া তাতারী দস্যুদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও ক্ষুরধার লেখনী এবং অনলবর্ষী বাগ্মিতার জন্য তিনি ইসলাম জগতে ‘শায়খুল হাদীছ’ পদবীর গৌরব অর্জন করিয়াছেন। ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলী তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুজাদ্দিদ হইবার জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন ইমাম ও বিদ্বানগণের মধ্যে যাঁহারা মুজাদ্দিদ রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা সেই সকল গুণের দুই চারটির অধিকারী হইলেও একমাত্র ইমাম ইবনু তায়মিয়ার মধ্যেই মুজাদ্দিদ হইবার সমুদয় গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। বিদ‘আতী ছূফীগণের বিরুদ্ধে উত্থান করায় ও মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের কতিপয় সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে না পারায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং কারাগারেই ৭২৮ হিজরীতে ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। ইনি আহলেহাদীছগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমামরূপে সমাদৃত হইয়া থাকেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ লিখিয়াছেন :

(١) من كان له ضبرة بطرق يطيق اهل العلم. لاسيما مذهب اهل الحديث وما عندهم من الروايات الصدقة التي لا ريب فيها عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوي. فان هولاء جعلوا الرسول الذي بعثه الله الي الخلق هو امامهم المعصوم.

(১) ‘যাঁহারা বিদ্বানগণের বিশেষতঃ আহলেহাদীছ বৈশিষ্ট্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহা অবগত আছেন যে, আহলেহাদীছগণ যে সকল দলীলের অনুসরণ করিয়া চলেন সেগুলি সত্য রেওয়াত সমূহের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে এবং সেগুলির মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহাদের রেওয়াতগুলি নিষ্কলংক ও অভ্রান্ত রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হইতে গৃহীত, যে রাসূল (ছাঃ) কোন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উক্তি কদাচ উচ্চারণ করিতেন না, যে রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ জীবজগতের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিই আহলেহাদীছগণের একমাত্র মা‘ছূম বা নিষ্কলুষ ইমাম (امام المعصوم)। তাঁহার নিকট হইতেই আহলেহাদীছগণ তাঁহাদের দ্বীন গ্রহণ করিয়া থাকেন’।

(٢) فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه–والدين ما شرعه وكل قول يخالف قوله فهو مردود عندهم وان كان الذي قاله من خيار المسلمين واعلمهم– وهو مأجور فيه علي اجتهاده– لكنهم لايعارضون قول الله و قول رسوله بشئ اصلا لا نقل عن غيره ولا راي راه غيره.

(২) ‘অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাহা হালাল করিয়াছেন শুধু তাহাই হালাল, আর যাহা তিনি হারাম করিয়াছেন, শুধু তাহাই হারাম এবং তিনি যাহা ব্যবস্থিত (শরী‘আতরূপে নির্ধারিত) করিয়াছেন শুধু তাহাই ধর্ম বা দ্বীন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিকূল যাবতীয় উক্তি ও অভিমত আহলেহাদীছগণের নিকট মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত। এরূপ উক্তি যদি কোন মুসলিম সাধু পুরুষের ও মহা বিদ্বানেরও হয়, তথাপি তাহা প্রত্যাখ্যাত হইবে। অবশ্য উক্ত আলেম তাঁহার গবেষণার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ছাওয়াব পাইবেন। আহলেহাদীছগণ কোন বিষয়কেই আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের উক্তির সমকক্ষতার যোগ্য মনে করেন না। কোন প্রমাণ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রমাণ ছাড়া তাঁহাদের নিকট অবশ্য প্রতিপালনীয় নয়’।

(٣) ومن سواه من أهل العلم فاناهم وسائط في التبليغ عنه إنما للفط حديثه وإنما لمعناه فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قران و حديث وقوم تفقهوا في ذلك عرفوا معناه وما تنازعوا فيه ردوه الي الله و الرسول فلهذا لم يجتمع قط أهل الحديث علي خلاف قوله في كلمة واحدة–والحق لايخرج عنهم قط–وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول وكل من خالفهم من خارجي و رافضي و معتزلي وجهمي و غيرهم من اهل البدع فانما يخالف رسول الله صلي الله عليه و سلم بل من خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالفا للسنة الثابتة وكل من هولاء يوافقهم فيما خالف فيه الاخر.

(৩) 'আহলেহাদীছগণ মনে করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত সমুদয় বিদ্বান তাঁহারই বাণীর প্রচারের মাধ্যম মাত্র, হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র রসনা নিঃসৃত উক্তি যথাযথভাবে তাঁহারা বর্ণনা করিবেন, নয় তাহার অর্থ প্রচার করিবেন। একদল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা প্রচার করিয়াছেন। আর একদল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে যে স্থানে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে তাঁহারা সেই সকল স্থানে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই কারণে আহেলহাদীছগণ রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের প্রতিকূল একটি কথাতেও একমত হন নাই এবং যাহা প্রকৃত সত্য তাহা কখনো তাঁহাদের বাহিরে যাইতে পারে নাই। যে সকল বিষয়ে তাঁহারা একমত হইয়াছেন, তাহা সমস্তই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ। খারেজী, রাফেযী, মু'তাযেলী, জাহামী প্রভৃতি যাহারা আহলেহাদীছগণের বিরোধ করিয়াছেন, এমনকি ব্যবহারিক শাস্ত্রেও যাহারা আহলেহাদীছ পথের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছেন তাঁহারাও ছহীহ ও প্রমাণিত সুন্নাতের বিরোধ করিয়াছেন। ব্যবহারিক সুন্নাতের ব্যাপারগুলিতে যাঁহারা মতভেদ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্যই আহলেহাদীছগণের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একমত হইতে বাধ্য হইয়াছেন'।

(٤) فأهل الأهواء معهم بمثله أهل الملل مع المسلمين.

(৪) 'আহলে সুন্নাতগণের অন্যান্য ফের্কার মুকাবিলায় আহলেহাদীছের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণের সমকক্ষতায় মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্বের অনুরূপ'।

(٥) وإن أهل الحديث لايتفون الأعلي ماجاء عن رسول الله صلي الله عليه و سلم وما هو منقول عن الصحابة. فيكون الاستدلال بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة مغنيا عن دعوي اجماع ينازع في كونه حجة بعض الناس.

(৫) 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর যে সকল উক্তি বা কার্যকলাপ ছাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথায় আহলেহাদীছগণ একমত হইতে পারেন না। সুতরাং কুরআন, হাদীছ ও ছাহাবীগণের ইজমা অর্থাৎ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের সমকক্ষতায় পরবর্তীকালের ইজমার দাবী আহলেহাদীছগণের নিকট যথেষ্ট নয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইজমার দলীল হওয়া সম্বন্ধেই কতিপয় বিদ্বান বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন' *(মিনহাজুন সুন্নাহ ৩/৪০ পৃঃ)*।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)

শায়খ আহমাদ ওলীউল্লাহ বিন আবদুর রহীম আল-উমরী দেহলভী ১১১৪ হিজরীতে (১৭০৩ খ্রীঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়া ১১৭৬/১৭৬৫ সালে পরলোকগমন করেন। তিনি স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ, দার্শনিক ও কুশাগ্রবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ ছিলেন। ইসলামী বিধানসমূহের দার্শনিক ব্যাখ্যা স্বরূপ তিনি **'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'** নামে এক অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার উহা উজ্জ্বলতম নিদর্শন। তিনি মক্কা ও মদীনা শরীফ হইতে কুরআন ও হাদীছের অমৃত আহরণ করিয়া ভারত উপমহাদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। তিনি ছোট বড় ৫০ খানারও অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইসলাম জগতের অন্য কোন অংশে জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি 'ইমাম' ও 'হুজ্জাতুল ইসলাম' নাম অবশ্যই অভিহিত হইতেন। কারণ ইসলামী দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার আসন কোন অংশেই ইমাম গাযযালী অপেক্ষা নিম্ন ছিল না। অথচ হাদীছ, রাজনীতি ও অর্থনীতি শাস্ত্রে তাঁহার সক্রিয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর এই দেশে জাঠ, মারাঠা ও শিখদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের পতন যুগে সমাজ জীবন হইতে অবসাদ ও অনৈসলামিক প্রভাব বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈকিত জীবন ব্যবস্থার প্রোগ্রাম রচনা করিয়াছিলেন। কালমার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩ খৃঃ) জন্মের শতাধিক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ ও উহার সমাধানকল্পে তিনি যে গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ।

হুজ্জাতুল হিন্দ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) আহলেহাদীছ পথের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা'-তে বলিয়াছেন,

(١) و لم يكن عند أهل الحديث من الرأي أن يجمع علي تقليد رجل من مضي.

(১) 'আহলেহাদীছগণ কোন পূর্ববর্তী বিদ্বানের তাক্বলীদ অর্থাৎ বিনা প্রমাণে শুধু গতানুগতিকতার অনুসরণ করিয়া তাঁহার উক্তি মান্য করিয়া লওয়ার রীতি স্বীকার করেন নাই'।

(٢) وكان عندهم إليه إذا وجد في المسئلة قرأن ناطق. فلا يجوز التحول منه الي غيره.

(২) 'তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কুরআনে স্পষ্টভাবে কোন মাসআলা উল্লিখিত থাকিলে উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন অভিমুখী হওয়া কোনক্রমেই বৈধ হইবে না'।

(٣) وإذا كان القران متحملا لوجوه فالسنة قاضية عليه.

(৩) 'কুরআনের কোন কথা যদি দ্ব্যর্থবোধক হয়, তাহা হইলে হাদীছ উহার মীমাংসাকারী হইবে'।

(٤) فإذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا بسنة رسول الله صلي الله عليه و سلم- سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء او يكون مختصا بأهل بلد أو اهل بيت أو بطريقة خاصة.

(৪) 'কুরআনে যে প্রশ্নের মীমাংসা বিদ্যমান নাই তাহার মীমাংসার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ গ্রহণ করিতে হইবে, সে হাদীছ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত থাকুক অথবা নির্দিষ্ট কোন নগর বা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ

থাকুক অথবা শুধু একমাত্র সনদের মধ্য দিয়ে তাহা বর্ণিত থাকুক, সকল অবস্থায় উক্ত হাদীছ অবশ্যই আহলেহাদীছগণের নিকট গৃহীত হইবে'।

(٥) وسواء عمل به الصحابة او الفقهاء او لم يحملوا به.

(৫) 'সে হাদীছের উপর ছাহাবীগণ এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ আমল করিয়া থাকুন অথবা না করিয়া থাকুন, উহা আহলেহাদীছগণের নিকট অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হইবে'।

(٦) ومتي كان في المسئلة حديث فلا يتبع فيها خلافه أثر من الأثار ولا اجتهاد أحد من المجتهدين.

(৬) 'যে মাসআলা সম্পর্কে হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে, উক্ত হাদীছের বিপরীত কোন ছাহাবীর উক্তি এবং মুজতাহিদ ইমামের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না'।

(٧) وإذا فرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث ولم يجدوا في المسئلة حديثا–أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين ولا يتقيدون بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد.

(৭) 'বিশেষভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি কোন মাসআলা সম্পর্কে হাদীছ না পাওয়া যায়, সেরূপ ক্ষেত্রে আহলেহাদীছগণ ছাহাবী বা তাবেঈগণের কোন না কোন দলের উক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু এক দলের পরিবর্তে অন্য কোন নগরের অধিবাসীবর্গের উক্তি তাঁহারা নির্দেশিত ও নির্দিষ্টভাবে অগ্রগণ্য করেন না'।

(٨) فان اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء علي شئي فهو المقنع.

(৮) 'খলীফা চতুষ্টয়ের অধিকাংশ এবং ফক্বীহগণ যে মাসআলায় একমত হইয়াছেন, আহলেহাদীছগণ তাহাকে প্রমাণ হইবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকেন'।

(٩) وان ختلفوا اخذوا بحديث اعلمهم علما وارعهم ورعا واكثرهم ضبطا او مااشتهر عنهم.

(৯) 'কিন্তু খলীফা ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইলে, যিনি তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান, ধর্মপরায়ণ এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য, তাঁহার অভিমত অথবা যে হাদীছ বিদ্বানগণের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে আহলেহাদীছগণ তাহাই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন'।

(١٠) فان وجدوا شيئا يستوي فيه قولان فهي مسئلة ذات قولين.

(১০) 'কোন বিষয় সম্পর্কে সমশ্রেণীভুক্ত দুই প্রকার বিভিন্ন হাদীছ পাওয়া গেলে, তাহাকে এমন একটি মাসআলা বলিয়া আহলেহাদীছগণ বিবেচনা করিয়া থাকেন, যাহার সম্বন্ধে দ্বিবিধ নির্দেশই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে'।

(١١) فان عجزوا عن ذلك ايضا تاملوا في عمومات الكتاب او السنة ايما اتهما واقتضا اتهما وحملوا نظير المسئلة عليها في الجواب– اذا كانتا متقاربين بادي الراي. لايعتمدون في ذلك علي قواعد من الاصول ولكن علي ما يخلص الي الفهم ويثلج به الصدر.

(১১) 'যদি কোনক্রমেই সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে কুরআন ও হাদীছের ইংগিত এবং প্রতিপাদন রীতিকে মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিতে হইবে এবং উক্ত মাসআলা নবীর যাহা আপাত দৃষ্টিতে অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। আহলেহাদীছগণ এ সম্পর্কে উছূলের কোন বাঁধাধরা নিয়মের অনুসরণ করেন না। প্রত্যুত যাহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন এবং যে সমাধান তাঁহাদের অন্তরকে সুশীতল করে, তাহারা সেই রীতিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন'।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) :

মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের অন্যতম, দশ লক্ষ হাদীছের হাফিয, ইসলামী ফিক্বহের বিশিষ্ট স্তম্ভ, আহলেসুন্নাত আহলেহাদীছগণের অন্যতম অধিনায়ক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল শায়বানীর নাম জগতপ্রসিদ্ধ। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মর্যাদা রক্ষাকল্পে উত্থান করায় বিদ'আতী দলের হস্তে তিনি পুনঃপুনঃ নিপীড়িত হন। হাদীছশাস্ত্রে তাঁহার মুসনাদ শ্রেষ্ঠতম বিরাট অবদান। আহলেহাদীছগণের পরিচিতি সম্পর্কে তিনি কয়েকটি প্রকাশ্য লক্ষণের সন্ধান দিয়াছেন। এই লক্ষণগুলি উল্লেখ করিয়া আলোচ্য প্রবন্ধের 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করা হইবে।

ইমাম ছাহেব বলিতেছেন, আহলেহাদীছগণের লক্ষণ :

(١) رفع اليدين في الصلوة زيادة في الحسنات.

(১) 'ছালাতে রাফঊল ইয়াদায়েন বা দুই হস্তোত্তোলন করার কার্যকে পুণ্যবর্ধক বলিয়া মনে করা'।

(٢) والجهر بامين عند قول الامام : ولا الضالين.

(২) 'ইমামের 'ওয়ালায্‌যালীন' বলার পর সকলে উচ্চৈঃস্বরে আমীন উচ্চারণ করা'।

(٣) والصلوة علي من مات من اهل هذه القلة وحسابهم علي الله عز و جل.

(৩) 'প্রত্যেক মৃত আহলে ক্বিবলার জানাযার ছালাত পড়া এবং তাহাদের আচরণের হিসাব আল্লাহ্‌র হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া'।

(٤) والخروج مع كل امام.

(৪) 'ভালমন্দ প্রত্যেক নেতার সঙ্গে ইসলামের শত্রুদলের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য অগ্রসর হওয়া'।

(٥) والصلوه خلف كل بر ة فاجر.

(৫) 'প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ অথবা দুশ্চরিত্র ইমামের পশ্চাতে ছালাত আদায় করা'।

(٦) والوتر ركعة.

(৬) 'বিতরের ছালাত এক রাক'আত পড়া'।

(٧) والاقامة فرادي.

(৭) 'ইক্বামত এক একবার করিয়া উচ্চারণ করা'।

[দ্রষ্টব্য : আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী প্রণীত 'আহলেহাদীছ পরিচিতি' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃঃ ১২৭-১৩৬]

শিশু-কিশোরদের উপর নৃশংস নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নে'মতবাজির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নে'মত আমাদের অতি আদরের প্রাণপ্রিয় সোনামণি তথা শিশু-কিশোরেরা। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ বছরের মত এত নির্মম, নৃশংস ও অভিনব কায়দায় শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। ২৬৭টি সংগঠনের মোট 'বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম'-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত সাড়ে তিন বছরে দেশে ৯৬৮টি শিশুকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। তাদের হিসাব মতে, ২০১২ সালে ২০৯ জন, ২০১৩ সালে ২১৮ জন, ২০১৪ সালে ৩৫০ জন শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আর ২০১৫ সালে সাত মাসে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯৩ জনে। বর্তমানে শিশু হত্যার প্রক্রিয়া এত বীভৎস থেকে বিভৎসতর হচ্ছে বলে জানান বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক।[১২৪] এভাবেই দিনের পর দিন শিশু নির্যাতন ও হত্যার সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

আজকের শিশু আগামী দিনে দেশ ও জাতির কর্ণধার। দেশের সকল শিশু-কিশোরদের পাঁচটি মৌলিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষাসহ তাদের উপযোগী বাসযোগ্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া আমাদের সকলের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। বর্তমানে সারা পৃথিবীসহ বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের শিশু-কিশোরেরা চরমভাবে লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, অবহেলিত এবং নৃশংস নির্যাতন ও হত্যার শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এগুলো যে কতবড় অন্যায়, গর্হিত, নিকৃষ্ট ও পাপের কাজ তা কখনও কল্পনা করা যায় না। জাতির কাছে প্রশ্ন, এই সুজলা-সুফলা স্বাধীন বাংলাদেশ সোনামণিদের জন্য কী নিরাপদ আবাসভূমি নয়? হে অত্যাচারী মানবরূপী হায়েনারা! তোমাদের এই শক্তি, দাপট ও অহংকার একদিন থাকবে না। প্রতিটি সচেতন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্বনেতাদের শিশুদের জন্য করণীয় অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বিশ্বের দারিদ্রতম প্রেসিডেন্ট উরুগুয়ের নেতা হোসে মুজিকা। যিনি সিরীয় ইয়াতীম শিশুদের জন্য তার নিজ বাড়ী ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।[১২৫]

মূলত মুসলিম জাতি আজ গতানুগতিকতা, আদর্শহীনতা, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে চরম চারিত্রিক অবক্ষয়ের কারণে শিশু নির্যাতনের মত এরূপ নিষ্ঠুর ঘটনাগুলো ঘটছে। এসব মর্মস্পর্শী ঘটনার কিছু খণ্ডচিত্র, কারণ, শিশু অধিকার এবং ইসলামের আলোকে সমাধান নিয়ে 'শিশু-কিশোরদের উপর নৃশংস নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার' বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

শিশু-কিশোর নির্যাতন ও হত্যার কয়েকটি লোমহর্ষক ঘটনার খণ্ডচিত্র :

ঘটনা-১ : গত ৮ জুলাই ২০১৫ তারিখে 'ও বাবারে, ও মারে, আমাকে বাঁচাও। ওরা আমাকে মেরে ফেললো, আর মেরো না!' এটি সিলেটের সবজি বিক্রেতা ১৩ বছরের কিশোর সামিউল আলম ওরফে রাজনের আর্তচিৎকার। তাকে চুরির অপবাদ দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে দেড় ঘণ্টা যাবৎ নৃশংসভাবে নির্যাতন করা হয় এবং অত্যন্ত জঘন্যভাবে হত্যা করা হয়। হত্যার পূর্ব মুহূর্তের এই করুণ আর্তনাদ বাংলার তথাকথিত সভ্য সমাজের কোন বিবেকবান মানুষের কর্ণকুহরে পৌঁছাইনি। উল্লাসের সাথে লাঠি দিয়ে পিঠানোর ভিডিও চিত্র ধারণ করে নির্যাতনকারীরাই তা নেটের মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়। হায়রে সভ্য দেশ! হায়রে সভ্য মানুষ!![১২৬]

ঘটনা ০২ : রাজনের গগণ বিদারী করুণ আর্তি শেষ হতে না হতেই গত ০৩ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে খুলনায় নির্মম নির্যাতনের শিকার হয় গ্যারেজ শিশু শ্রমিক সাতক্ষীরার রাসূলপুর গ্রামের ১২ বছরের কিশোর রাকিব। বিভিন্ন সময়ে অত্যাচার-নির্যাতনের কারণে রাকিব গ্যারেজ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ কারণে পূর্বের গ্যারেজ মালিক, তার মা ও এক কর্মচারী তাকে মুখে কসটেপ দিয়ে আটকে ধরে মোটর সাইকেলের চাকায় হাওয়া দেওয়ার কমপ্রেসার মেশিনের নল মলদ্বারে ঢুকিয়ে পেটে ইচ্ছামত বাতাস ভরে দেয়। ফলে শিশুটির পেট ফুলে নাড়িভুঁড়ি ছিড়ে যায় ও ফুসফুস ফেটে মারা যায়। রাজন তবু তার মা বাবাকে ডাকতে পেরেছিল, কিন্তু রাকিব সে সুযোগও পায়নি। বাঁচার আর্তনাদ মনের ভিতরে গুমড়ে সে শিশু মৃত্যুর মিছিলে নাম লেখাতে বাধ্য হয়। বয়স্ক এ তিন পশুর অন্তর একটুও কাঁপেনি। রাকিবের পিতা নূরুল ইসলাম এবং মাতা লাকি বেগম শোকে পাথর হয়ে বিলাপ করছে এই বলে, 'আমার কলিজার টুকরা রাকিবকে আর কোন দিন ফিরে পাব না'। একমাত্র বোন রিমি 'ভাইয়া' 'ভাইয়া' বলে আর্তনাদ করছে।[১২৭]

---

১২৪. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ৯-৮-১৪।
১২৫. মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১৫।
১২৬. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১৫; দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ৬/০৮/১৫।
১২৭. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১৫; দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ০৬/০৮/১৫।

হায় আফসোস! বাতাসের যদি কথা বলার শক্তি থাকত, তাহ'লে বাতাস বাংলাদেশেরে প্রায় ৮ কোটি শিশু কিশোরদের পক্ষে সভ্য সমাজকে বলত, কোন প্রকার অস্ত্র ছাড়া তোমরা শিশু হত্যার চরম নৃশংসতার এ অদ্ভুত চিন্তা কিভাবে করলে, যার ইতিহাস পৃথিবীর কোথাও নেই?

ঘটনা-০৩ : শেরপুরে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ৮ বছরের শিশু রাহাতকে আপন খালু অপহরণ করে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবী করে। অতঃপর তাকে হত্যা করে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেয়। ৮ আগষ্ট দুপুরে নলিতাবাড়ী উপযেলার মদু টিকা ইকোপার্কের কাছে একটি পাহাড় থেকে তার কংকাল উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি ২০১৫ সালের আগস্টের ২ তারিখের।[১২৮]

ঘটনা-০৪ : ২০১৫ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকা থেকে সুটকেসের ভিতরে থাকা ৯ বছরের একটি ছেলের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তার বুকে ও কপালে লোহার ছ্যাঁকার দাগ এবং পিঠে ছিল ৫ ইঞ্চির মত গভীর ক্ষত। সম্ভবতঃ সে গৃহকর্মী ছিল। অতঃপর তার মলদ্বার দিয়ে ধাতব তার ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করে লাশ ফেলে যায়। এই ছোট্ট সোনামণির শরীরে ৫৭টি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। এমনকি চোখের নীচে কালচে দাগ পড়ে গেছে। চোখের দুই কোন্ দিয়ে অশ্রু ঝরার কালো দাগের চিহ্ন দুই গালে এসে ঠেকেছে। কতই না কষ্ট পেয়ে মারা গেছে এই ছোট্ট শিশুটি! কত নিষ্ঠুর এরা![১২৯]

ঘটনা-৫ : আজ আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে শিশুরা মাতৃগর্ভেও নিরাপদ নয়। অথচ মাতৃগর্ভ কিংবা মাতৃক্রোড়ই একটি শিশুর জন্য সবচেয়ে নিরাপদস্থল। গত ২৩ জুলাই ২০১৫ তারিখে মাগুরায় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের সময় গর্ভবতী মা ও তার পেটের ৮ মাসের শিশু গুলিবিদ্ধ হয়। শিশুটির পিঠ ফুঁড়ে বুক দিয়ে বুলেট বেরিয়ে গেছে। অপারেশনের পরেও মা ও বাচ্চাটি আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে। শিশুটি এখন 'বেবী অক্ষ নাজশ' বা বাংলাদেশের একমাত্র 'বুলেট কন্যা' নামে খ্যাতি পেয়েছে।[১৩০]

ঘটনা-৬ : বরগুনার আমতলীর ১০ বছরের শিশু আউয়াল। পড়ালেখা করে স্থানীয় এক মাদরাসায়। গত ০৩ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে গভীর রাতে মাছ চুরির কথিত অভিযোগে স্থানীয় এক পাষণ্ড শাবল দিয়ে তার চোখ উপড়ে ফেলে। অতঃপর মাথার খুলির কিছু অংশ তুলে বীভৎস কায়দায় হত্যা করে। আহ! কি নৃশংস, কি জঘন্য, কি মর্মান্তিক এ ঘটনা। এরা মানুষ, না-কি পশু! বরং পশুর চেয়েও অধম।[১৩১]

ঘটনা-০৭ : কবুতর চুরির অভিযোগে রাজধানীর খিলক্ষেতের মঞ্জল এলাকার ৭-৮ ব্যক্তি মিলে ১৬ বছরের কিশোর নাজিমের উপর বর্বর হামলা চালায়। তারা রশি দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে ফেলে। বেধড়ক পেটানোর পর শিশু নাজিম অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এরপর সে বাঁচার জন্য পানি খেতে চাইলে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয় পার্শ্ববর্তী বালু মিশ্রিত নদীতে। অতঃপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে হামলাকারীরা।[১৩২]

ঘটনা-৮ : সুন্দরগঞ্জ উপযেলার বামনডাঙ্গা সড়কের ব্র্যাক মোড়ের গোপালচরণ এলাকায় গাইবান্ধার অত্র এলাকার আওয়ামীলীগের সংসদ সদস্য মুহাম্মাদ মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন মিশু শাহাদত হোসেন সৌরভ (৮)-কে গুলি করেন। সে গোপালচরণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। তার ডান পায়ে একটি এবং বাম পায়ে ২টি গুলি লাগে। শিশুটির চাচা শাহাজাহন আলী ওরফে সাজা মিয়া ভোরে ভাতিজাকে নিয়ে রাস্তায় হাটছিল। এ সময় এমপি ডেকে গাড়িতে উঠতে বললে সে পালায়। তিনি পিস্তল বের করে গুলি করেন। সৌরভের দু'পায়ে গুলি লাগে। শিশুটি বলে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। দুই পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমি কাঁদতে থাকি। লোকজন আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। তার পিতা-মাতা এর সুষ্ঠু বিচার চায়। একজন আইন প্রণেতা এমপি কিভাবে বিনা কারণে পিস্তল দিয়ে গুলি করতে পারে নিষ্পাপ এই ছোট্ট শিশুকে।[১৩৩]

ঘটনা-৯ : গাইবান্ধায় গরু চুরির অভিযোগে ১৩ বছরের আরিফের পা ভেঙ্গে দেয় সন্ত্রাসীরা। অতঃপর সিগারেটের আগুন দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষত-বিক্ষত করে।[১৩৪]

ঘটনা-১০ : চাঁদপুরের শাহরাতিতে অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ করতে গিয়ে নিজের মেয়ে সুমাইয়া আখতারকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে তার পিতা-মাতা।[১৩৫]

ঘটনা-১১ : নাটোরের বড়াইগ্রামে দোকানে চুরির ঘটনায় সন্দেহ করে আবু শামা ও শাকিল নামের দু'জনকে সুপারী গাছের সাথে বেঁধে নির্মমভাবে পেটানো হয়।[১৩৬]

ঘটনা-১২ : ঢাকার কেরানীগঞ্জে মোবাইল চুরির অপবাদ দিয়ে রাব্বি হাসান (১২) নামের এক শিশুকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। কালিগঞ্জে 'ইমরান গামেন্টস'-এর ভিতর রাতের বেলায় এ ঘটনা ঘটে। বরিশালের কামারীপাড়া উপযেলার লবণছাড়া গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে রাব্বি। সে মৃত্যুর মাত্র ১৫ দিন পূর্বে ঢাকায় এসে ঐ গার্মেন্টসে কাজ নিয়েছিল। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করার পর গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়।[১৩৭]

---

১২৮. দৈনিক ইনকিলাব, তাং ১৪-০৮-১৫।
১২৯. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১৫; দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ৬/৮/১৫।
১৩০. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১৫।
১৩১. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১৫।
১৩২. দৈনিক ইত্তেফাক দ্র.।
১৩৩. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ৩/১০/২০১৫।
১৩৪. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ২৫/৭/১৫।
১৩৫. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ২৫/৭/১৫।
১৩৬. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ২৫/৭/১৫।
১৩৭. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ২৯/০৮/১৫।

ঘটনা-১৩ : সিলেটে রায়নগরের মতীন মিয়ার নয় বছরের শিশু আবু সাঈদ শাহমীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র। স্কুল থেকে ফেরার পথে পুলিশ কনস্টেবল এবাদুরসহ ৪ জন মিলে তাকে অপহরণ করে ৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের দাবী করে। পরে পুলিশের বাসার চিলেকোঠায় ৭টি বস্তায় মোড়ানো অবস্থায় সাঈদের গলিত লাশ উদ্ধার করা হয়।[১৩৮]

ঘটনা-১৪ : কুকুরের মুখ থেকে উদ্ধার হওয়া সেই অসহায় শিশুটির নাম ফাইজা রাখা হয়। রাজধানীর পুরাতন বিমান বন্দরের ঝোপে ফেলে রাখা এই নবজাতকটিকে। একটি কুকুর টানাহেঁচড়া করা অবস্থায় পাশে খেলতে থাকা কয়েকজন শিশু এগিয়ে যায়। কুকুরটি পালিয়ে গেলে নবজাতককে উদ্ধার করে শিশুরা। অতঃপর শিশুদের চিৎকারে জাহানারা বেগম নামে স্থানীয় এক মহিলা বাসিন্দা নবজাতকটিকে দ্রুত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। শিশুটির ঠোঁট দু'টি কামড়ানো ছিল। আর ডান হাতটি কুকুরের গালে থাকাবস্থায় শিশুরা তাকে উদ্ধার করে। অতঃপর প্রায় একমাস চিকিৎসার পর সুস্থ হ'লে তাকে ঢাকার শিশু নিবাসে হস্তান্তর করা হয়। ঘটনাটি ঘটে গত ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুরের পরে। কন্যা শিশু জন্মের জন্য জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার বর্বর নীতির অবসান হবে কী কখনো? সভ্য সমাজের নিকট আবেদন, এ ধরনের করুণ হৃদয়বিদারক ঘটনা যেন আর না ঘটে![১৩৯]

এরকম হাযারো ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে। এর শেষ কোথায়?

সুধী পাঠক! শিশু নির্যাতন ও হত্যার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে প্রবল আকার ধারণ করেছে নারী নির্যাতন, শিশু ধর্ষণ ও গণধর্ষণ। গত ছয় মাসে দেশে ১০ হাযার মামলা হয়েছে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন সম্পর্কে।[১৪০] ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মত অনৈতিক, অমানবিক, বর্বর ও পাপের এ ধরণের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে সামাজিকভাবে নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ভুক্তিভোগীরা। ভিকটিম ও তার পরিবার লোকলজ্জা, সামাজিক ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কেউ কেউ অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। এ বছর জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত দেশে ২৮০ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। আর শুধু জুলাই'১৫ মাসে ৫০ জন শিশুকে ধর্ষণ ও ৩৭ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে।[১৪১] এ রিপোর্টের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আমরা চরম জাহেলিয়াতের মধ্যে বাস করছি। আমরা কিভাবে আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারী হলাম, তা কল্পনাতেও আসে না।

কিশোর ও নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণের কয়েকটি খণ্ডচিত্র :

ঘটনা-১ : গত ১৩ আগষ্ট ২০১৫, মাদারীপুরে ৮ম শ্রেণীর দুই ছাত্রীকে ধর্ষণ ও নির্যাতনের পর মুখে বিষ ঢেলে হত্যা করা হয়েছে।[১৪২]

ঘটনা-০২ : রামেক হাসপাতালের বহির্বিভাগে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন এক নারী রোগী। দুপুরে কনুইয়ের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে মুখের নেকাব খুলতে বলে এবং স্পর্শকারত স্থানে হাত দিয়ে যৌন হয়রানি করে।[১৪৩]

ঘটনা-০৩ : গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ঈদের ছুটিতে বেড়াতে এসে গণধর্ষণের শিকার হয় এক গৃহবধু। টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপযেলার গোড়াই শিল্পাঞ্চলের গোড়াই ক্যাডেট কলেজ হরিদ্রাচালা এলাকায় শাহীন নামক এক যুবক তার স্ত্রীকে নিয়ে রেল লাইনে বেড়ানোর সময় ৪-৫ জন যুবক তাদেরকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্বামীর সামনে স্ত্রীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ধর্ষণকারীরা প্রভাবশালী হওয়ায় ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।[১৪৪] আমরা এমন দেশে বাস করছি এসব ঘটনার বিচার আদৌ হবে কি? আমরা নাকি সভ্য সমাজ?

ঘটনা-০৪ : রাজধানীর রায়ের বাজারে ৭ বছরের এক শিশু এবং মীরপুরে ৯ বছরের এক শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এরা কত বড় নরপশু ও নরপিশাচ!

ঘটনা-০৫ : হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে ব্র্যাক স্কুলে ৫ম শ্রেণীর এক ছাত্রী কাগাপাশা ইউনিয়ন যুবলীগের এক কর্মী কর্তৃক সংখ্যালঘু পরিবারে রাজমিস্ত্রি বিধান দাসের মেয়েকে ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে। মামলা হয়েছে এবং আসামী গ্রেফতার হয়েছে।[১৪৫]

ঘটনা-০৬ : ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানোর লোভ দেখিয়ে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাযার মানব পাচারকারী দলের সদস্যরা আপন দু'বোনকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে ভারতে পাচার করে দেয়। গরীব ও অসহায় আপন দু'বোন সরল বিশ্বাসে ২২ জুলাই প্রথম ধর্ষণের স্বীকার হয়। ইন্দোনেশিয়ায় যাওয়ার মিথ্যা ফ্লাইটের কথা বলে ২৯ জুলাই সাতক্ষীরা শহরের এক বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ৩-৪ জন যুবক তাদেরকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ৩ লক্ষ টাকায় ভারতের মুম্বায়ের এক নিষিদ্ধ পল্লীতে তাদেরকে বিক্রি করে দেয়। অতঃপর প্রায় এক মাস পরে উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরে আসে তারা।[১৪৬]

ঘটনা-৭ : গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ঝালকাঠি লঞ্চ টার্মিনালে অপেক্ষমান সুন্দরবন-২ লঞ্চের একটি কেবিনে গণধর্ষণের এক ঘটনা ঘটে। মেয়েটি ঢাকা থেকে পালিয়ে প্রেমিকের কাছে ঝালকাঠিতে আসে। স্থানীয় বখাটেরা জানতে পেরে

---

১৩৮. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ২৪/০৯/১৫।
১৩৯. বিডি নিউজ, তাং ১২/১০/১৫।
১৪০. দৈনিক ইনকিলাব, তাং ৬/৮/১৫।
১৪১. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১৫; দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ৬/৮/২০১৫।

১৪২. দৈনিক ইত্তেফাক দ্র.।
১৪৩. ১৯/১০/১৫ বিডি নিউজ।
১৪৪. ৩০/০৯/১৫ বিডি নিউজ।
১৪৫. বাংলাদেশ নিউজ ০৭/০৯/১৫।
১৪৬. বাংলাদেশ নিউজ ২৪/৯/১৫।

তাদেরকে লঞ্চের কেবিনে আটকে রাখে। বখাটেরা প্রেমিক শান্তকে মারপিট করে তাড়িয়ে দেয়। তখন ১৬ বছরের এই তরুণীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে তারা। তাদের কাছে থাকা দু'টি মোবাইল সেট ও ২১০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে ধর্ষকরা পালিয়ে যায়। মেয়েটিকে আদালতের মাধ্যমে সেবাশ্রমে পাঠানো হয়।[১৪৭]

ঘটনা-৮ : গাযীপুরের কালিয়াকৈর উপযেলার সুত্রাপুর এলাকার বিজয় সরণী উচ্চ বিদ্যালয়ের ফটকে কবিতা বারী দাস (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় বিক্রম মণি দাস তাকে হত্যা করে। সে এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থী। তখন তার টেষ্ট পরীক্ষা চলছিল। স্কুল গেটে এভাবে হত্যা কত বড় জঘন্য ও অন্যায় কাজ তা কি ভাবা যায়। ঘটনাটি ঘটে ১৩/১০/১৫ তারিখে।[১৪৮]

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে যৌন নির্যাতনের কিছু খণ্ডচিত্র :

দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছরে অর্ধশত ছাত্রী যৌন হয়রানীর শিকার হয়। অধিকাংশ ঘটনায় শিক্ষকদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়। অল্প সংখ্যক ঘটনা নিষ্পত্তি হ'লেও অধিকাংশ ঘটনা ধামাচাপা পড়ে গেছে। ভুক্তভোগী ছাত্রীরা বিভাগীয় সভাপতির কাছে অভিযোগ করে। এর মধ্যে বেশীর ভাগই উভয় পক্ষ বসে একটা সমঝোতায় আসেন। স্কুলে অভিযুক্তরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আর পাচ্ছে না। গত ৫ অক্টোবর রাবি ছাত্রলীগের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে প্রক্টর অফিসে যৌন হয়রানীর লিখিত অভিযোগ করেন দুই ছাত্রী। কিন্তু নিরাপত্তাহীনতার কারণে তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগের সাহস পাচ্ছেন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাইয়ে দেওয়া। নোট বা সাজেশন দেওয়ার প্রলোভনে এ ঘটনাগুলো বেশী ঘটে থাকে। ২০১০ সালে ফোকলোর বিভাগের এক শিক্ষক বেশী নম্বর দেওয়ার প্রলোভনে অনার্স শেষ বর্ষের এক ছাত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ছাত্রীটি অভিযোগ করলেও পরে তা ধামাচাপা পড়ে যায়। ২০১৩ ও ২০১৪ সালেও এমন কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া যায়।

২০১১ সালের আইবিএস-এর তৎকালীন সচিব এসএম গোলাম নবীর বিরুদ্ধে এক ছাত্রী যৌন হয়রানীর অভিযোগ উঠে। ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু এক ছাত্রী মতিহার থানায় মামলাও করেছেন। একই বছর ১৭ জানুয়ারী নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক অমিতাভ চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে যৌন হয়রাণীর অভিযোগ করেন বিভাগের ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষের এক ছাত্রী। পরে অমিতাভকে চাকুরীচ্যুত করেন কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে রাবির 'যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধ কমিটি'র সভাপতি ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা মাহবুবা কানিজ কেয়া বলেন, 'এ পর্যন্ত আমাদের কাছে ৭ টি লিখিত অভিযোগ এসেছে, যার মধ্যে চারটি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৪ জনই শাস্তি পেয়েছে। একজন শিক্ষকসহ দু'জন চাকুরীচ্যুত হয়েছেন। বেনামী যে সব অভিযোগ এসেছে আমরা তা গ্রহণ করি না'।[১৪৯]

সুধী পাঠক! বাংলাদেশে প্রায় তিরিশেরও অধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যার মধ্যে শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডচিত্র আংশিকভাবে এখানে উপস্থাপন করা হ'ল। এভাবে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে এমন সব যৌন নির্যাতনের অভিবন ঘটনা, যার খোঁজ কে রাখে? মূলত চারিত্রিক ও সামাজিক অবক্ষয় এবং ইসলামী মূল্যবোধের অভাবে এই বর্বরতম ঘটনাগুলো ঘটছে। অথচ প্রকৃত ইসলামী অনুশাসন মেনে চললে এগুলো ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে ইনশাআল্লাহ।

কাজের মেয়ে, ছেলে বা বুয়া নির্যাতনের দু'টি খণ্ডচিত্র :

বাংলাদেশের প্রতিটি স্বচ্ছল, মধ্যবৃত্ত ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিবারে নিয়মিত চলছে গৃহকর্মী, কাজের মেয়ে বা ছেলে অথবা বুয়া নির্যাতন। সমাজ সংস্কারের পূর্বে নিজের ও পরিবারের সংস্কার খুবই প্রয়োজন। নিজের কাজ নিজে করার জন্য ইসলামী নির্দেশনা রয়েছে। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পারিবারিক অনেক কাজ নিজে করতেন। ঢাকার হলিক্রসের সিস্টাররা সংসারের সকল কাজ রাত ৮টার পর নিজেদের কাজ নিজেরা সম্পন্ন করেন। গৃহকর্মী বা কাজের মেয়ে থাকলে তখন আমরা সবাই অকাজের মেয়ে বা ছেয়ে হয়ে যায়। ২০১১ সালে 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ডমেস্টিক ওয়ার্কাস কনভেনশন আইন প্রণয়ন করে গৃহকর্মীদের সুবিধার্থে। শুধুমাত্র চট্টগ্রামে ২০ লাখ গৃহকর্মী রয়েছে। তার মধ্যে ৮৩% নারী, শিশু ও তরুণী। এরা প্রায় ২৪ ঘণ্টা ওয়ার্ক ডিউটিতে থাকে। তবে ১২ ঘণ্টা তো কমন। এদের কোন সাপ্তাহিক ছুটি নেই। অতএব বাসায় ভাল কিছু খাবারের সময় যেন আমরা ড্রাইভার চাচা এবং কাজের বুয়াদের কথা ভুলে না যায়। নিম্নে কাজের মেয়ে কিংবা বুয়াদের উপর নৃশংসতার দু'টি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হ'ল।

ঘটনা-১ : রাজধানীর খিলগাঁও এলকায় গুঁড়া দুধ খাওয়ার মিথ্যা অভিযোগে লিয়া নামের ১০ বছরের এক গৃহকর্মীর চারটি দাঁত রুটি বানানোর বেলুন দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। শরীরে গরম খুন্তির ছ্যাকা দিয়ে গৃহকর্ত্রী তিন্নি বেগম প্রায়ই আমনবিক নির্যাতন চলাতো তাকে। অথচ গৃহকর্ত্রীর বড় মেয়ে নিজে গুঁড়া দুধ খেয়ে দোষ চাপায় তার উপর। তার চিৎকারে পাশের বাসার এক মহিলা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে।[১৫০] এরকম হাযারো ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে আমাদের দেশের দেশের সর্বত্র। কোনটা প্রকাশ পায়। অধিকাংশই নীরবে-নিভৃতে চোখের পানিতে জীবন শেষ করে দেয়। এইতো সভ্যতা, এটাইতো আধুনিকতা, তাই না! যেখানে অসহায় মানবতার জীবনের এতটুকু মূল্য নেই?

১৪৭. বাংলাদেশ নিউজ ২৪, তাং ১১/৯/১৫।
১৪৮. বিডি নিউজ ২৪ দ্র.।
১৪৯. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ১১/১০/১৫।
১৫০. বিডি নিউজ, তাং ১৯/১০/১৫।

ঘটনা-২ : বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম ক্রিকেটার ও তার স্ত্রী কর্তৃক তার বাসার গৃহকর্মী চরমভাবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। নিঃসন্দেহে এটা চরম উদ্বেগ ও পরিতাপের বিষয়।

শিশু-কিশোর নির্যাতন ও ধর্ষণের কারণ :

(ক) ইসলামী অনুশাসন যথাযথ অনুসরণ না করা। (খ) পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির অভিশাপ। (গ) আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার (মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুকের মাধ্যমে)। (ঘ) অভিভাবকদের শিথিল শাসন ও সচেতনতার অভাব। (ঙ) স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় শিক্ষক ও অভিভাবকদের নজরদারীর ঘাটতি। (চ) বালক-বালিকাদের সহ-শিক্ষার কুফল (ছ) নেশাজাতীয় দ্রব্য। (জ) পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়। (ঝ) আইনের দুর্বলতা, বিচারহীনতা ও শ্লথ গতির কারণে। (ঞ) দরিদ্র ও দুর্বলতার সুযোগে সবলের অত্যাচার। (ট) অভিযোগের পর সত্যতা পাওয়ার পর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করা। (ঠ) শিশুদের স্মরণশক্তি/বুদ্ধি, প্রতিভা ও মেধার ঘাটতি।

সুধী পাঠক! উপরিউক্ত কারণ ছাড়াও শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তবে বর্তমানে যার দ্বারা নির্যাতনের মাত্রা সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা হ'ল আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার। অর্থাৎ মোবাইল, ইন্টারনেট ও ফেসবুকের ইচ্ছামত ব্যবহার। উক্ত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল।

মোবাইল ফোনের ইন্টারনেট ও ফেসবুকের অপব্যবহার শিশু নির্যাতনের অন্যতম হাতিয়ার :

মোবাইল ফোনের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা, ভিডিও করার নগ্নছবি, এস.এম.এস করা, ব্লুটুথের মাধ্যমে ভিডিও করে দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া এ ধরণের বিব্রতকর ঘটনায় প্রতারিত হচ্ছে আধুনিক মেয়ে ও ছেলেরা। যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া ছাড়াও পর্ণোগ্রাফির মত যৌন অপরাধেও জড়িয়ে পড়ছে তারা। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী নারীরাই এমন পরিস্থিতির শিকার সবচেয়ে বেশী। এসব ঘটনার জের ধরে সমাজে আত্মহত্যার ঘটনা যেমন বাড়ছে। তেমনি বাড়ছে শিশু অপরাধীর সংখ্যাও। সমাজের এ ভয়বাহ চিত্র অবলোকন করে শুধু অভিবাবক নয়, বিবেকবান প্রতিটি মানুষই উদ্বিগ্ন।

সম্প্রতি পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে জানা যায়, কয়েক বছর ধরে কিশোর-কিশোরী ও নারী-পুরুষের একান্ত সম্পর্কের দৃশ্য ভিডিও এবং স্থিরচিত্র আকারে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে অহরহ। পুলিশের অনুসন্ধানে এ রকম ৮৪টি ওয়েব সাইটের সন্ধান মিলেছে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী কর্মকর্তারা বলেছেন, এমন অনেক অভিযোগ আসছে। বর্তমান বিবেকবান অভিভাবকরা বেশী উদ্বিগ্ন উঠতি বয়সের (১৩-১৯)। কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ঘটনা অনেক ঘটলেও চোখ-লজ্জার ভয়ে মামলা হচ্ছে অনেক কম।[১৫১]

১৫১. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ৮/৯/১৫।

শিশুদের উপর উন্নত প্রযুক্তির কুপ্রভাব আজকাল স্মার্ট টেকনোলজিক্যাল ডিভাইসে ভরপুর। উন্নতমানের মোবাইল, পারসোন্যাল কম্পিউটার, টেলিভিশনের সাথে যুক্ত গেমস ডিভাইস ছাড়াও আরও কত কি? বড়রা সারা দিন কাজ, কম্পিউটার আর ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। শিশুদের সময় না দেওয়ায় তারা যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে মানসিকভাবে মারত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমানে অত্যন্ত কমবয়সীদের হাতে ইলেকট্রনিকস ডিভাইস তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারা এতে আসক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবন হচ্ছে বাধাগ্রস্ত এবং পড়াশুনায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলছে।

গবেষণা থেকে জানা যায় যে, দেশে শতকরা ৭৭ ভাগ কিশোরী বিভিন্নভাবে পর্ণোগ্রাফির দর্শক। দরিদ্রের শতকরা ৮০ জনই ১৪ বছরের কম বয়সে যৌন পেশায় প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে পর্ণোগ্রাফির সাথে সংশ্লিষ্টতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করলেও অনেকের নিকটে অগোচরেই থেকে গেছে। কম বয়সী যেসব শিশু-কিশোর পর্ণোগ্রাফি দেখছে ও পর্ণোগ্রাফি তৈরীতে অংশ নিচ্ছে তারা অদূর ভবিষ্যতে সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি ডেকে আনবে।[১৫২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রাশেদা ইশরাত নাসির অবক্ষয়ের কারণ আলোচনা করতে গিয়ে চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন (১) প্রযুক্তির ভাল দিকের সাথে খারাপ দিক যুক্ত হয়েছে। যেমন মোবাইল ও ইন্টারনেট (২) সামাজিক অনুশাসন কমে যাচ্ছে (৩) দরিদ্রতার কারণে পরিবার থেকে সন্তান বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য (৪) উচ্চ-মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে চাকুরী ও ব্যবসায়ের কারণে সন্তানদের সাধ্যমত দেখভাল না করা।[১৫৩]

সুধী পাঠক! আধুনিক প্রযুক্তির কারণে ভিন্ন পদ্ধতিতে অভিনব কায়দায় মেয়েদেরকে শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন করা হচ্ছে। এ সমস্ত সাইবার ক্রাইমের কারণে আত্মহত্যা বাড়ছে ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। শুধু আইন করেও এ সমস্যা সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। বরং পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে এর অপকারিতা, ঘৃন্যতা ও পাপের বিষয়ে কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে ধীরগতিতে হ'লেও সমাজ থেকে এই অপসংস্কৃতির অভিশাপ দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

কাজের মেয়ে বা বুয়াদের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত :

(১) বুয়া বা কাজের মেয়েদের সাথে আমরা সর্বদা খারাপ আচরণ করি। আমাদের এ মানসিকতা পরির্বতন করে পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে তাদের সর্বদা ভাল আচরণ করতে হবে।

১৫২. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং, ১৮/০৯/১৫।
১৫৩. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং, ১৮/০৯/১৫।

Contents

(২) ঈদের দিন তাদেরকে পরিবারের সদস্যদের মত পোশাক এবং টাকা পয়সা উপহার দিবে এবং বেড়ানো অথবা ছুটির ব্যবস্থা করবে।

(৩) ঘৃণা না করে চেয়ারে বা সোফায় বসার সুযোগ দিবে। ঢাকায় অনেক বাসায় তারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

(৪) পিতা-মাতা ও বড়দের আচরণ দেখে সন্তানেরা বুয়াদের সাথে প্রায়ই খারপা আচরণ করে থাকে বা বকাবকি করে থাকে। তাদেরও ভাল আচরণ পাবার অধিকার আছে আমাদের নিকট থেকে।

(৫) তাদের সাথে ভাল আচরণ, আদর করে কথা বললে তারা ভাল মনে সুন্দরভাবে কাজটা সমাধা করে। আর তা না হলে তার উল্টাটা হয় । ছোট বাচ্চাকে কোলে দিলে কাঁদায় এবং ময়লা পানি এনে দেয় অথবা গ্লাস না ধুয়ে পানি খাওয়ায় ইত্যাদি।

(৬) এদেরকে রান্না ঘরের মেঝেতে, বসার ঘরে বা শোবার ঘরের মেঝেতে অথবা স্টোর রুমে ঘুমাতে না দিয়ে সুবিধাজনক ভাল স্থানে সুন্দর বিছানাপত্রে ঘুমাতে দিবে।

(৭) লিফটে উঠা-নামার সুযোগ দিবে। তাহলে তাদের মন ভারী থাকবে।

(৮) এদেরকে ইসলামী জ্ঞানসহ পড়াশুনার সুযোগ দিবে। তখন তারা ভদ্র ও ভাল ব্যবহার শিখবে।

(৯) অনেকে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানি সহ বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। এটা নির্মম ও গর্হিত পাপের কাজ। এটা থেকে আমাদেরক সচেতন ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এমন ঘটনা যেন আর কখনও না ঘটে।

ইসলামের দৃষ্টিতে কাজের মেয়ে বা গৃহকর্মী নির্যাতনের পরিণাম :

কাজের মেয়ে বা ছেলে কিংবা কাজের বুয়া তথা গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতনের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

‘আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। পথিক ও কাজের ছেলে ও মেয়েদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারী দাম্ভিককে পসন্দ করেন না’ *(নিসা ৪/৩৬)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَاللَّه لَا يُؤْمِن وَاللَّه لَا يُؤْمِن وَاللَّه لَا يُؤْمِن قِيلَ يَا رَسُول اللَّه وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَن جَاره بَوَائِقه ‘আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, সে মুমিন নয়, সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ’ল, কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অন্যায় থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না’।[১৫৪] অন্য হাদীছে এসেছে,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

‘এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সুতরাং কেউ কারো প্রতি অন্যায় করবে না। কেউ কাউকে অপদস্ত করবে না। তুচ্ছ ভাববে না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাঁর হাত দিয়ে বুকের দিকে ইশারা দিয়ে তিনবার বলেন, পরহেযগারিতা এখানে আছে। মানুষের অনিষ্ট হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাববে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পরস্পরের রক্ত, অর্থ-সম্পদ ও মর্যাদা খর্ব করা হারাম’।[১৫৫]

সুধী পাঠক! জগতে মানুষ ইয়াতীম হয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। প্রতিটি শিশুর নির্দিষ্ট পিতা-মাতা আছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে অল্প বয়সেই তারা তাদের মা অথবা বাবা কিংবা উভয়কেই হারায়। এই হারানোর পিছনে তাদের কোন হাত নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দরিদ্রতার কারণে এবং বিশেষ করে পিতা ও মাতার বিচ্ছিন্নতার কারণে ছেলে-মেয়েরা হয়ে পড়ে চরমভাবে অসহায়, দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ থাকে না। ফলে বাধ্য হয়ে এ সমস্ত কিশোর-কিশোরী সন্তানেরা শিশুশ্রম দিতে এবং বাসা-বাড়ীতে কাজ করতে বাধ্য হয়। একদিকে তাদের সইতে হয় অভিভাবকহীনতার গঞ্জনা, অন্যদিকে চরম আর্থিক অনটন; লেখাপড়া ও সমাজের মূল শ্রোত থেকে এরা বঞ্চিত। এদের প্রতি নির্যাতন করা যে কত বড় অন্যায়, পাপ ও খারাপ কাজ তা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। অতএব আসুন! আমরা সকলে মিলে তাদের সাথে ভাল আচরণ করি। *(চলবে)*

[লেখক : প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি]

---

১৫৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৬২।

১৫৫. মুসলিম হা/৬৭০৬; মিশকাত হা/৪৯৫৯।

ইসলামের দৃষ্টিতে কাফফারা

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

'কাফফারা' (الكفارة) আরবী শব্দ। মাদ্দাহ كفر। এর আভিধানিক অর্থ হ'ল ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা ইত্যাদি। যেমন বলা হয়, قَدْ كَفَّرْتُ الشَّيْئَ 'আমি বস্তুটি ঢেকে দিয়েছি'। সেকারণ অন্ধকার রাতকে 'কাফির' (كافر) বলা হয়। কেননা তা দিনের আলোকে ঢেকে দেয়। শারঈ পরিভাষায় নেক আমল ও কৃত অপরাধের বদলা দ্বারা পাপ ঢেকে দেওয়াকে কাফফারা বলে।

কাফ্ফারা দু'ধরনের। এক ধরনের কাফ্ফারা হ'ল ঐ সকল সৎকর্ম, যা সম্পাদনের ফলে পাপসমূহ মোচন হয়ে যায়। যেমন- ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। ছালাত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কারু ঘরের সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে তোমাদের দেহে কোন ময়লা বাকী থাকে কি? ছাহাবীগণ বললেন, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের তুলনা ঠিক অনুরূপ। আল্লাহ এর দ্বারা গোনাহ সমূহ বিদূরিত করে দেন'।[১৫৬] অনুরূপভাবে ছিয়াম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত জীবনের গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়'।[১৫৭] এভাবে বিভিন্ন ইবাদতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ জাতীয় নেক আমলগুলোর মাধ্যমে গোনাহ মাফ হওয়ায় ঐ আমলগুলো গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার কাফ্ফারা হ'ল কৃত অপরাধে দণ্ড। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কতিপয় ফরয বা ওয়াজিবের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করলে তার বিনিময়ে বদলা দেওয়া এবং এর মাধ্যমে ঐ অপরাধের শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া। যেমন : যিহার, ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী মিলন, কসম ভঙ্গ করা, মানত পূরণ না করা ইত্যাদি। এ জাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে শরী'আত কাফ্ফারা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যা অনাদায়ে উক্ত ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কেননা কাফ্ফারাই তার পাপ মোচনের মাধ্যম। সেকারণ প্রত্যেক মুসলিমের কাফ্ফারাযোগ্য অপরাধ ও তার কাফ্ফারার বিধান জানা প্রয়োজন। কেননা এতে ঐ ব্যক্তি এ জাতীয় জঘন্য সীমালংঘন থেকে নিজেকে পরহেয করতে সচেষ্ট হবে। আলোচ্য নিবন্ধে কাফ্ফারার দ্বিতীয় প্রকার তথা কৃত অপরাধের কাফ্ফারা বা বদলা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

১৫৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৫।
১৫৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮।

১. ছালাতের কাফফারা :

ছালাতের ক্ষেত্রে সমাজে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। ছালাতের কাফফারা হিসাবে ছুটে যাওয়া ছালাতের জন্য নির্ধারিত হারে টাকা আদায় করা, কুরআন মাজীদ হাদিয়া দেওয়া, চাউল ছাদাক্বা করা ইত্যাদি আমাদের সমাজে নতুন কিছু নয়। একশ্রেণীর ইমাম এভাবে মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফ্ফারা আদায় করে থাকেন। আর এর দ্বারা তার ওয়ারিছদের বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, তার পিতা বা মাতা উক্ত কাফ্ফারার মাধ্যমে ছালাত আদায় না করার অপরাধ থেকে ক্ষমা পেয়ে গেলেন। যেমন- জনৈক ব্যক্তি মাঝে মধ্যে ছালাত আদায় করত। কিন্তু তিন মাস যাবৎ অসুস্থ থাকার কারণে সে ছালাত আদায় করতে পারেনি। ঐ ব্যক্তি মারা গেলে স্থানীয় ইমাম ছাহেব মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছের কাছ থেকে উক্ত তিন মাস সময়ের ছালাত আদায় না করা বাবদ কাফ্ফারা স্বরূপ ৩০০০/= টাকা ও তিনটি কুরআন মাজীদ আদায় করেন। অতঃপর জানাযা পড়ে দাফন করেন *(আত-তাহরীক)*। এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটছে। অথচ শরী'আতে এর কোনই ভিত্তি নেই।

মূলত ছালাতের কোন কাফফারা নেই এবং 'উমরী ক্বাযা' বলেও কিছু নেই। এক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে তওবা করে ছালাত আদায় শুরু করা। এটাই হ'ল ছালাতের প্রকৃত কাফ্ফারা। মহান আল্লাহ বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا- إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا-

'তাদের পরে এলো তাদের অপদার্থ উত্তরসুরীরা। তারা ছালাত বিনষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। ফলে তারা অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না' *(মারিয়াম ৫৯-৬০)*। রাসূল (ছাঃ) ছালাত ভুলে যাওয়া ব্যক্তির জন্য স্মরণ হওয়া মাত্র ছালাত আদায়কেই ভুলে যাওয়ার কাফ্ফারা বলেছেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا-

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি ছালাত আদায় করতে ভুলে যায়

অথবা ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তার কাফ্ফার হচ্ছে যখনই স্মরণ হবে তখনই তা আদায় করে নিবে'।[১৫৮] অন্য বর্ণনায় আছে, لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذَلِكَ 'এটা (ছালাত আদায়) ব্যতীত এর কোন কাফ্ফারা বা প্রতিকার নেই'।[১৫৯]

২. ছিয়াম ভঙ্গের কাফ্ফারা :

ছিয়ামের বিধান তিন ধরনের। যেমন-

(ক) ভুল করে কিছু খেয়ে ফেললে : ভুলবশতঃ কিছু খেয়ে ফেললে বা পান করলে তার কাযা ও কাফ্ফারা কিছুই লাগবে না। ঐ ছিয়ামটি সে পূর্ণ করবে। অর্থাৎ ভুলক্রমে খাওয়ার পরও বাকী দিন ছিয়াম রাখবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَفْطَرَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ —

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসে (ছিয়াম অবস্থায়) ভুলক্রমে কিছু খেয়ে ফেলে, তার কোন কাযা বা কাফ্ফারা নেই'।[১৬০]

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে : ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে শুধু কাযা প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে কাফ্ফারা লাগবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত. রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ 'যে ব্যক্তি মুখ ভরে (অনিচ্ছাকৃতভাবে) বমি করে তার কোন কাযা করতে হবে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তার কাযা আদায় করতে হবে'।[১৬১]

(গ) ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে : ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করলে কাফ্ফারা প্রযোজ্য হবে। এমতাবস্থায় কাফ্ফারা হচ্ছে- ধারাবাহিকভাবে দু'মাস ছিয়াম পালন করা বা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা একজন গোলাম আযাদ করা।[১৬২] এ প্রসঙ্গে ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কি বিষয় তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে বলল, আমি ছিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস পাবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি একাধারে দু'মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন, ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। তারপর সে বসে থাকল। এমন সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এক ঝুড়ি খেজুর পেশ করা হ'ল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এগুলো নিয়ে ছাদাক্বাহ করে দাও। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার চাইতেও বেশী অভাবগ্রস্তকে ছাদাক্বাহ করব? আল্লাহ্র শপথ, মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তখন হাসলেন, এমনকি তাঁর দাঁত দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন, এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও'।[১৬৩]

৩. হজ্জের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য কাফ্ফারা :

হজ্জের ওয়াজিব তরক করলে বা ইহরামের পর নিষিদ্ধ কোন কাজে লিপ্ত হ'লে কাফফারা দিতে হয়। হজ্জের ওয়াজিব সমূহ হচ্ছে : মীকাত হ'তে ইহরাম বাঁধা, 'আরাফা ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা, মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা, আইয়ামে তাশরীক্বের রাত্রিগুলো মিনায় অতিবাহিত করা, ১০ তারিখে জামরাতুল আক্বাবায় ও ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা, মাথা মুণ্ডন করা অথবা সমস্ত মাথার চুল ছোট করা ও বিদায়ী তাওয়াফ করা।

ইহরামের পর নিষিদ্ধ কাজগুলো হচ্ছে : সুগন্ধি ব্যবহার করা, মাথার চুল বা শরীরের যেকোন স্থানের পশম উঠানো, নখ কাটা, প্রাণী শিকার করা, যৌনাচার, বিবাহের প্রস্তাব, বিবাহের আক্বদ বা যৌন আলোচনা করা, পুরুষের জন্য পাগড়ী-টুপী ও রুমাল ব্যবহার করা, সেলাই করা কাপড় পরিধান করা, মহিলাদের জন্য মুখাচ্ছাদন ও হাত মোযা ব্যবহার করা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত কারণে কাফ্ফারা হ'ল ১টি বকরী কুরবানী করা অথবা ৬ জন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করা।[১৬৪] উল্লেখ্য যে, কুরবানী মিনায় দিতে হবে। আর কাফ্ফারা মিনায়ও দেওয়া যায়, মক্কাতেও দেওয়া যায়। তাতে কোন শারঈ বাধা নেই।

৪. শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা :

শপথ বা অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا

---

১৫৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৩ 'শীঘ্র ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ।

১৫৯. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৯৯৩।

১৬০. ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/১৯৯০; দারাকুৎনী হা/২২২৬; মুসতাদরাক হাকেম হা/১৫৬৯; বুলূগুল মারাম হা/৬৭০।

১৬১. হাকেম হা/১৫৫৭; তিরমিযী হা/৭২০; ইবনু মাজাহ হা/১৬৭৬; বুলূগুল মারাম হা/৬৭১ সনদ ছহীহ।

১৬২. সূরা মুজাদালাহ ৩; বুখারী হা/১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪ 'ছওম' অধ্যায়।

১৬৩. মুসলিম হা/১১১১; বুলূগুল মারাম হা/৬৭৭।

১৬৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৮৮, মুওয়াত্ত্বা, বায়হাক্বী ৫/১৯২; ইরওয়া ৪/২৯৯ পৃঃ, হা/১১০০; ক্বাহত্বানী, পৃঃ ৬৪-৬৫।

تَفْعَلُونَ 'আর তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকারের পর তা পূর্ণ কর এবং শপথ পাকাপাকি করার পর তা ভঙ্গ করো না। অথচ তোমরা তোমাদের শপথে আল্লাহকে যামিন করেছ। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন' *(নাহল ১৬/৯১)*।

কসম বা শপথ দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের কসম মানুষ খামখেয়ালী বশতঃ মিথ্যাভাবে অহরহ করে থাকে। যেমন- আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলা, অমুকের সাথে কথা বলব না কিংবা অমুক কাজ করব না। পরে কসমের প্রতি দৃঢ় থাকতে ব্যর্থ হয় এবং তা করে ফেলে। আবার কিছু কসম সত্য ও দৃঢ়তার সাথে করা হয়। প্রথম প্রকারের কসমের কোন কাফ্‌ফারা নেই। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার কসম ভঙ্গ করলে তার জন্য কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়।

আল্লাহ বলেন, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ 'তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমাদের দৃঢ় শপথের জন্য পাকড়াও করবেন' *(মায়েদা ৮৯)*। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন, أُنْزِلَتْ فِى قَوْلِه لاَ وَاللَّه، بَلَى وَاللَّه 'আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের উদ্দেশ্যবিহীন উক্তি لاَ وَاللهِ 'না আল্লাহ্‌র শপথ, بَلَى وَاللهِ 'হ্যাঁ আল্লাহ্‌র শপথ ইত্যাদি উপলক্ষে'।[১৬৫] অনুরূপভাবে মিথ্যা কসম সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّه، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ 'কাবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম হচ্ছে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা'।[১৬৬]

কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ–

'শপথ ভঙ্গের কাফফারা হ'ল, ১০ জন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করা, যা তোমরা সাধারণতঃ খেয়ে থাক, অথবা তাদেরকে অনুরূপ মানের পোষাক প্রদান কর অথবা একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করে। এগুলোর কোনটা না পারলে একটানা তিনদিন ছিয়াম পালন করবে' *(মায়েদা ৮৯)*।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে কসম করা :

অনেককে কুরআন নিয়ে কসম করতে দেখা যায়। আবার অনেককে দেখা যায় মা-বাবার ও চক্ষুর কসম খেতে। কেউবা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মাটি ইত্যাদির নামেও কসম করে থাকে। অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা জায়েয নয়।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِى رَكْبٍ وَهْوَ يَحْلِفُ بِأَبِيه، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَلاَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّه، وَإِلاَّ فَلْيَصْمُتْ–

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতাদের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে'।[১৬৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلاَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّه، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ–

ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'সাবধান! যদি তোমাদের কারো কসম করতে হয় তাহ'লে সে যেন আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে কসম না করে। কুরায়েশরা তাদের বাপ-দাদার নামে কসম করত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বাপ-দাদার নামে কসম কর না'।[১৬৮]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করল, সে শিরক করল'।[১৬৯]

কসমের পর বিপরীতে ভাল প্রকাশ পেলে করণীয় :

কসমের পর এর বিপরীতে ভাল কিছু প্রকাশ পেলে কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে ভাল কাজটি করতে হবে। আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ 'কোন ব্যাপারে যদি শপথ কর আর তা ছাড়া অন্য কিছুর ভিতর কল্যাণ দেখতে পাও, তবে নিজ শপথের কাফ্‌ফারা আদায় করে তা থেকে উত্তমটি গ্রহণ কর'।[১৭০]

---

১৬৫. বুখারী হা/৬৬৬৩; বুলূগুল মারাম হা/১৩৬৭।

১৬৬. বুখারী হা/৬৬৭৫; মিশকাত হা/৫০।

১৬৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪০৭ 'কসম ও মানত' অধ্যায়; বুখারী হা/৬১০৮; বুলূগুল মারাম হা/১৩৬০।

১৬৮. বুখারী হা/৩৮৩৬; মুসলিম হা/১৬৪৬।

১৬৯. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৪১৯ ঐ অধ্যায়; ছহীহ তিরমিযী হা/১২৪১; আবূদাঊদ হা/৩২৫১, সনদ ছহীহ।

১৭০. বুখারী হা/৬৭২২; মিশকাত হা/৩৪১২; বুলূগুল মারাম হা/১৩৬৩।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه– ‘যে ব্যক্তি শপথ করল, অতঃপর এর বিপরীতে অন্য বিষয়ে কল্যাণ দেখতে পেল, সে যেন উত্তমটি গ্রহণ করে এবং তার কৃত শপথের কাফ্ফারা আদায় করে’।[১৭১]

৫. মানত ভঙ্গের কাফ্ফারা :

মানত ভঙ্গের কাফ্ফারা কসম ভঙ্গের কাফ্ফারার ন্যায় ১০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো বা একজন গোলাম আযাদ করা অথবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা।[১৭২]

নেক কাজের মানত করলে তা পালন করা যরূরী। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِه– ‘কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মানত করে, তাহ'লে সে যেন তা পূরণ করে। আর কোন ব্যক্তি যদি নাফরমানীর মানত করে, সে যেন তা পূরণ না করে’।[১৭৩]

মানতকারীর পক্ষে যদি মানত পূরণ করা সম্ভব না হয় তাহ'লে তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর মানতের কাফ্ফারা হচ্ছে শপথের কাফ্ফারা ন্যায়।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ–

উক্ববা বিন ‘আমের হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, মানতের কাফ্ফারা শপথের কাফ্ফারার ন্যায়’।[১৭৪]

৬. যিহারের কাফ্ফারা :

‘যিহার’ হ'ল স্ত্রীর কোন অঙ্গকে মায়ের পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা।[১৭৫] তবে স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে যে, আমি তোমার নিকটে তোমার মায়ের ন্যায় তাহ'লে তা যিহার হবে না। কেননা ‘যিহার’ করার অধিকার কেবলমাত্র স্বামীর, স্ত্রী নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।-

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ–

‘তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদেরকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদের জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলছে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল’ *(মুজাদালাহ ৫৮/২)*।

অবশ্য যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে যে, ‘তুমি আমার মা, বোন, খালা বা অনুরূপ কোন মাহরাম মহিলার পিঠের ন্যায়’ তাহ'লে তা ‘যিহার’ হবে। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী তার উপরে হারাম থাকবে, যতক্ষণ না স্বামী ‘কাফ্ফারা’ আদায় করবে।

‘যিহার’-এর কাফ্ফারা হচ্ছে- ধারাবাহিকভাবে দু'মাস ছিয়াম পালন করা বা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা একজন গোলাম আযাদ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ– فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ–

‘যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, অতঃপর তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, (তাদের কাফ্ফারা হচ্ছে) একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একজন দাস মুক্ত করা। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ। তোমরা যা কর আল্লাহ খবর রাখেন । কিন্তু যার এ সামর্থ্য নেই, সে স্পর্শ করার পূর্বে পরপর দুই মাস ছিয়াম পালন করবে। এতেও যে অসমর্থ হবে, সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এ জন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান, আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’।[১৭৬]

৭. হত্যার কাফ্ফারা :

কোন মুমিন অপর কোন মুমিনকে হত্যা করতে পারে না। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ এই অপরাধে লিপ্ত হ'লে তার পরিণাম জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হ'ল জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাৎ করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন’ *(নিসা ৪/৯৩)*। ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য ক্বিছাছ প্রযোজ্য। যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের।

অপরদিকে ভুলবশতঃ কেউ কাউকে হত্যা করে ফেললে এর কাফ্ফারা হচ্ছে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং নিহত

---

১৭১. মুসলিম হা/১৬৫০; মিশকাত হা/৩৪১৩।
১৭২. মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৭২।
১৭৩. বুখারী হা/৬৬৯৬ ‘আনুগত্যে মানত’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩৪২৭।
১৭৪. মুসলিম হা/১৬৪৫; মিশকাত হা/৩৪২৯।
১৭৫. নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১০৯১ ‘যিহার’ অনুচ্ছেদ।
১৭৬. মুজাদালাহ ৫৮/৩-৪; বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৬৬০।

Contents

ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের নিকট উক্ত হত্যার বিনিময়ে তথা রক্তমূল্য পরিশোধ করা। অথবা দু'মাস ক্রমাগত ছিয়াম পালন করা। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا-

'যদি কোন মুমিন কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তবে সে একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে এবং তার পরিবারকে রক্তমূল্য প্রদান করবে। তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয় সেকথা স্বতন্ত্র। যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু দলের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ঐ ব্যক্তি মুমিন হয়, তাহ'লে একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে। আর যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহ'লে তার পরিবারকে রক্তমূল্য দিবে এবং একটি মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে। কিন্তু যদি সে তা না পায় তাহ'লে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন করবে। আল্লাহ মহাবিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/৯২)*।

৮. ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সহবাসের কাফ্ফারা :

ঋতু অবস্থায় স্ত্রীসহবাস সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ-

'আর লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে। তুমি বল, ওটা হল কষ্টদায়ক বস্তু। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ হ'তে বিরত থাক। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা ভালভাবে পবিত্র হয়, তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। ঋতু অবস্থায় কেউ উক্ত সীমালংঘন করলে তাকে কাফ্ফারা হিসাবে অর্ধ দীনার ছাদাক্বা করতে হবে।

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ-

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে হায়েয অবস্থায় মিলিত হয়, সে যেন অর্ধ দীনার ছাদাক্বাহ করে'।[১৭৭]

উল্লেখ্য যে, ১ ভরী সমান ১১.৬৬ গ্রাম। হাদীছে বর্ণিত ১ দীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। অতএব হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে ৪.২৫ গ্রাম অথবা এর অর্ধেক স্বর্ণের মূল্য ছাদাক্বা করতে হবে।। এ হিসাবে অর্ধ দীনার ছাদাক্বা করতে চাইলে ১ ভরী স্বর্ণের বর্তমান বাজার মূল্যকে ৫.৫০ দিয়ে ভাগ করে যত টাকা আসবে তা ছাদাক্বা করবে। তবে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, নির্দেশটি 'মানদূব' পর্যায়ের। ওয়াজিব পর্যায়ের নয়'।[১৭৮] অতএব কঠিনভাবে তওবা করাই কর্তব্য।

উপসংহার :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইসলামী শরী'আতের কতিপয় অপরাধ ও এর কাফ্ফারা তথা প্রতিকার সম্পর্কে বিধৃত উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সঠিক জ্ঞান হাছিল করা এবং এ জাতীয় সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য। অনেকে বিধান না জানার কারণে খামখেয়ালী বশতঃ এই অন্যায় কর্মগুলো করে থাকে। তাদের অজ্ঞতা দূরীভূত করা এবং বিশুদ্ধ জীবন পরিচালনাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর খালেছ বান্দা হিসাবে কবুল করে নিন-আমীন!

লেখক : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক; কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ]

---

১৭৭. তিরমিযী, আবুদাঊদ ও অন্যান্য; মিশকাত হা/৫৫৩ 'হায়েয' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।

১৭৮. মির'আত ৩/২৫১।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'- এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।

সকল বিধান বাতিল কর
অহি-র বিধান কায়েম কর

জাতিসংঘ মানবাধিকার ও ইসলাম

প্রসঙ্গ : বিবাহের অধিকার

-শামসুল আলম

ভূমিকা : ইতিপূর্বে 'মানবাধিকার ও ইসলাম' শিরোনামে 'মাসিক আত-তাহরীক' পত্রিকায় জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১৩ ধারা পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকায় ১৬ ধারা থেকে আলোচনা করা হল।

Article-16 : (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion have the right to marry and found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

'পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষ ধর্ম-বর্ণ-জাতীয়তা নির্বিশেষে একে অপরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে সংসারী হ'তে পারবে। দাম্পত্য জীবনে ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও প্রতিটি নারী-পুরুষ সমঅধিকারের অধিকারী বা অধিকারিনী হবেন'।

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending pouses.

'বর ও কনে উভয়ের পূর্ণ সম্মতিক্রমেই কেবলমাত্র বিবাহ অনুষ্ঠিত হ'তে পারবে'।

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state.

'পরিবার সমাজের একটি মৌলিক ও স্বাভাবিক অঙ্গ। তাই প্রতিটি পরিবারেই সমাজ এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবার অধিকারী'।[১৭৯]

বিশ্লেষণ :

জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১৬ (১) ধারায় বলা হয়েছে, পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক পুরুষ ও নারী ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে পরস্পরে এক অপরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার করতে পারবে। এখানে আরও বলা হয়েছে, দাম্পত্য জীবনে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের পরও প্রত্যেক নারী-পুরুষ তাদের সমঅধিকার ভোগ করতে পারবে। অর্থাৎ এই ধারাতে বিশ্বের মানব সম্প্রদায়কে বুঝানো হচ্ছে যে, প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক মানব-মানবী বিয়ে করে সংসারী হ'তে পারবে এবং মানুষ আনন্দ উপভোগের সাথে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। কারণ এই ধারাতে কয়েকটি অস্পষ্ট দিক রয়েছে; তা হ'ল যে, এখানে প্রত্যেক নর-নারীকে বিয়ে করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। এখানে কেউ বিয়ে করে সংসারী হ'তেও পারে আবার নাও পারে। আর যদি কেউ বিয়ে না করে তাতে কারো কিছু যায় আসে না। বিবাহ বহির্ভূত কোন নর-নারী একত্রে জীবন-যাপনের মাধ্যমে অথবা কখনও বন্ধু-বান্ধবী সেজে যথেচ্ছা ভোগ-বিহার করলেও তাতে দোষের কিছু নেই। যে বাধা আছে কিন্তু ইসলামে।

এখানে আরো একটি জিনিস লক্ষণীয় যে, 'পূর্ণ বয়স্ক' শব্দটির ব্যাখ্যা নেই। একজন নর-নারী কত বছর হ'লে পূর্ণ বয়স্ক হ'তে পারে তার কোন হিসাব এখানে অনুপস্থিত। বিভিন্ন দেশভেদে উল্লেখ রয়েছে, কোন দেশে ছেলের ন্যূনতম বয়স ১৮ কোথাও ২০ কোথাও ২১ কোথাওবা ২৫ ইত্যাদি এবং মেয়েদের ন্যূনতম বয়স হ'তে হবে ১৮ কোথাও ২০ কোথাওবা ২১ বছর প্রভৃতি দ্বারা নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ। আবার কেউ যদি (রাষ্ট্রভেদে) এই সীমারেখা অমান্য ও নিম্নগামী করে তাহ'লে তা প্রচলিত আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শুধু তাই-ই নয়, এর জন্য অভিভাবকবৃন্দকেও কারাদণ্ড-জরিমানা ভোগ করতে হয়। এখানে বয়সসীমা বেধে দেয়ার কারণে বিবাহ বহির্ভূত মিলনে বিশ্বব্যাপী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশায় যিনা-ব্যভিচার খুব দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। উক্ত পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। ফলে মানবতা এখন মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। রীতিমত উন্নত দেশ ও পাশ্চাত্য দেশের নীতি নির্ধারকদেরকে সাংঘাতিকভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। পরিবার বা সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই অদূরদর্শিতার কারণে এখন তারা নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে এ থেকে বাঁচার বা উত্তরণের উপায় কি? হ্যাঁ, সমাধান আছে একটাতেই; তা'হল সর্বজনীন মানবাধিকারের গ্যারান্টিযুক্ত সনদ 'আল-ইসলাম'।

সনদের ১৬ (২) ধারায় বলা হয়েছে যে, বর ও কনে তথা প্রত্যেক নারী-পুরুষের সম্মতিতেই বিয়ে হ'তে হবে। এখানে কোন জোর-জবরদোস্তির মাধ্যমে বিয়ের স্বীকৃতি আদায় করা যাবে না। এই ধারাটির ত্রুটিযুক্ত বিষয় হ'ল, কেবলমাত্র ছেলে-মেয়েদের সম্মতি বা স্বাধীনভাবে বিয়ের সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই একটি দীর্ঘস্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধশালী সংসার-জীবন নির্ভর করছে! যেখানে অভিজ্ঞ বা জ্ঞানী পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকের কোন সামান্যতম অনুমতির সুযোগ রাখা হয়নি। যেকারণ এত বড় একটি সিদ্ধান্ত অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদের

১৭৯. Dr. Borhan Uddin Khan, Fifty Years of the Universal Declarration of Human Rights, IDHRB, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Dhaka : 10 December, 1998, p. 202.

Contents

স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বাধীনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে তাদের যে ভুল হ'তে পারে তা তুলে ধরার কোন সুযোগ এখানে নেই। যেকারণে একটি দম্পত্তি সারা জীবন দুঃখের সাগরে ভাসতে পারে এবং বাস্তবে তাই-ই হচ্ছে। তাইতো কিছুদিন ভোগবিলাসের পর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অহরহ বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতে দেখা যায়। তাদের বিশেষ করে নারীদের চরম দুঃখজনক পরিণতির শিকার হ'তে হচ্ছে। অর্থাৎ এই ধারাতেও যে প্রচুর ত্রুটি রয়েছে, তা উপলব্ধি করা যায়।

সনদের ১৬ (৩) ধারাতে বলা হয়েছে, 'পরিবার সমাজের একটি মৌলিক ও স্বাভাবিক অঙ্গ। তাই প্রতিটি পরিবারই সমাজ এবং রাষ্ট্রের কাছে নিরাপত্তা পাবার অধিকারী'। এখানে একটি রাষ্ট্রে পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা ফুটে উঠেছে। শুধু তাই-ই নয়, সার্বভৌমসম্পন্ন একটি দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল, সুশৃঙ্খল পরিবার বা সমাজ কাঠামোর উপস্থিতি বিদ্যমান থাকা। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে পরিবার ও সমাজ বলতে যা বুঝায় তা চেনার উপায় নেই। ধরে নেয়া হৌক যে, একটি নতুন দম্পত্তি স্বাধীনভাবে বসবাসের নিরাপত্তা রাষ্ট্র কর্তৃক পাবার অধিকারী। সেটা পেল। কিন্তু সেখানকার পরিবারের যে চিত্র ধরা পড়ে তাহ'ল, স্বামী-স্ত্রীদের তাদের সন্তানদের খবর নেয়ার সময় থাকে না। রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি শিশু সন্তানের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতির দায়িত্ব পালন করা হয়। ফলে সন্তান আর পিতা-মাতার উপর নির্ভরশীল হয় না, একটু বুদ্ধি-জ্ঞান হ'লেই তাদের পিতা-মাতাকে তারা আর তোয়াক্কা করে না। তোয়াক্কা করার প্রয়োজনও পড়ে না, কারণ স্বামী-স্ত্রীও কাজে-কর্মে, সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, কে সন্তানদেরকে খবর নিবে? কে তাদেরকে পিতৃ-মাতৃস্নেহে লালন-পালন করবে? মূলত শৈশব বয়সেই ওদেরকে পরিবার থেকে পৃথক করে দেয়া হয়। শিশু-কিশোর বয়স থেকে ওরা ওদের সহপাঠি-বন্ধুদেরকে আবিষ্কার করার সুযোগ পায়। এক সময় যৌবনের উদ্দীপনায় তারা লাগামহীন জীবনে ঘুড়ে বেড়ায়, বিকিয়ে দিতে হয় তাদের জীবনের মূল্যবান সম্পদ সতীত্ব-সম্ভ্রমকে। যেমন একটি ঘটনা থেকেই বুঝা যাবে ভোগবাদী ও বস্তুবাদী পাশ্চাত্যপন্থীগণ কিভাবে শুধু দুনিয়া অর্জনের কারণে পরিবার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সিরিয়ার প্রখ্যত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আলী তানতাবী আমেরিকার সমাজ সম্পর্কে লিখেছেন, তাদের সেখানে মেয়ে যখন বয়স্কা হয়, তখন তার বাপ তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নেয় এবং ঘরের দুয়ার তার জন্য বন্ধ করে দেয়। তাকে বলে, এখন যাও উপার্জন কর এবং যাও, আমাদের এখানে আর তোমার জন্য কোন জায়গা নেই, কিছুই নেই। সে বেচারী বাধ্য হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং জীবনের সমস্ত কঠোরতা-জটিলতার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। দ্বারে দ্বারে ঘা খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বাপ-মায়ের সেজন্য কোনই চিন্তা-ভাবনা হয় না। কোন দুঃখবোধ করে না তাদের সন্তানের এই দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার কথা জেনে। সে বেচারী শেষ পর্যন্ত শ্রম-মেহনত করে রূযী-রোজগার করতে বাধ্য হয় কিংবা দেহ বিক্রয়ের নোংরা ও জঘন্যতম কর্মে জড়িয়ে পড়ে। এ কেবল আমেরিকাতেই নয়। সমগ্র ইউরোপীয় অঞ্চলের অবস্থাই এমনই। আমার উস্তাদ ইয়াহইয়া শ্যাম প্রায় ৩৩ বছর পূর্বে যখন প্যারিস থেকে শিক্ষা শেষ করে ফিরে এসেছিলেন, আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি সেখানে থাকার জন্য একটি কামরার সন্ধানে এক বাড়ীতে পৌঁছেছিলেন। সেখানে কামরাটি ভাড়া দেওয়ার জন্য খালী ছিল। সে বাড়ীতে পৌঁছাবার সময় দুয়ারের কাছ থেকে একটি মেয়েকে বের হয়ে যেতে দেখতে পেলেন। মেয়েটির চোখ দু'টি তখন ছিল অশ্রুসিক্ত। ডাঃ ইয়াহইয়া বাড়ীর মালিকের কাছে মেয়েটির কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, মেয়েটি বাড়ীর মালিকেরই ঔরসজাত সন্তান। এখন সে আলাদাভাবে বসবাস করে এবং এ বাড়ীর খালী বাসাটি ভাড়া নেওয়ার জন্য এখানে এসেছিল; কিন্তু মালিক (নিজ পিতা) তাকে ভাড়ায় দিতে অস্বীকার করার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, মেয়েটি মাত্র ১০ ফ্রাঁ (দশ আনার মুদ্রা) দিতে পারে। অথচ সে অন্য লোকের কাছ থেকে ত্রিশ ফ্রাঁ আদায় করতে পারে।[১৮০] এ হচ্ছে বস্তুবাদী সমাজ-সভ্যতার মর্মান্তিক পরিণতি। সমাজে কখনো এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়েরা হয়ে ওঠে হিংস্র ও পশুর আচরণের ন্যায়। তেমনি একটি সাড়া জাগানো লোমহর্ষক ও অমানবিক ঘটনা ঘটে যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও। তাও কি-না খোদ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিবার-গৃহে। ঘটনাটি হল, ঢাকার মালিবাগের এক ছন্নছাড়া হতভাগা ঐশী নামীয় কিশোরী কন্যা তার প্রিয় পিতা পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) মাহফুযুর রহমান ও স্বপ্না রহমান মাতাকে ২০১৩ সালের ১৬ই আগস্টে নির্মমভাবে ঢাকার নিজ বাসায় নিজ হাতে হত্যা করে। যা কল্পনাও করা যায় না। যদিও সদ্য আদালতের রায় অনুযায়ী তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেই পিতা-মাতাকে কেউ কি ফিরিয়ে দিতে পারবে? এর জন্য কে দায়ী? হ্যাঁ, এর জন্য আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় মূলত দায়ী। প্রথম থেকে এই পরিবারটি যদি ইসলামী অনুশাসনে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত থাকত, তাহলে ঐ পরিবারে হয়তবা এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটত না।

অন্য আর এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে- আমেরিকাতে ১৯৯১ সালে ১২ লাখ অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১৯৯০ সালে নিউজ উইক একটি জরিপ পরিকল্পনা করে তাতে দেখা যায়, প্রতি ১৮ সেকেন্ডে ১ জন নারী নির্যাতিত হয় এবং প্রতি ৬ মিনিটে ১ জন নারী ধর্ষিতা হয়। প্রতি চারজনের মধ্যে ১ জন অবিবাহিতা ১০-১৪ বছর বয়সীর গর্ভে জন্ম লাভ করে সন্তান। প্রতি বছর ১৫-১৭ বছর বয়সী অবিবাহিতা ৫০ হাযার মেয়ে গর্ভধারণ করে।[১৮১] আমেরিকার এফ.বি.আই-

১৮০. মাসিক রিযওয়ান, লাহোর; পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রকাশক : মোস্তফা আমীনুল হুসাইন, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৬, পৃঃ ৩৫২-৩৫৩।

১৮১. দৈনিক ইনকিলাব, ৫ এপ্রিল, ২০০৮, পৃ. ১৪।

এর ১৯৯০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ১০ হাযার ২৫৫ নারীর সঙ্গে ব্যভিচারের ঘটনা ঘটে (আদালতের দায়েরকৃত অভিযোগ)।[১৮২] ১৯৯০ সালে বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন, ১৯৭৯-৮৭ সাল পর্যন্ত নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশার কারণে ৪ লাখ জারজ সন্তান বাস করছে ইংলান্ডে। তাহ'লে ২০ বছর পর আজকে প্রায় এক কোটি জারজ সন্তান বাস করছে ইংলান্ডে।[১৮৩] অন্য এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ৫০% নারী ধর্ষণের স্বীকার হয়।[১৮৪] তাইতো বলা যায়, ওদের পরিবার ও সমাজটা হ'ল তথাকথিত উদার-খোলামেলা অথবা যিনা-ব্যভিচারে ভরপুর। ভাই-বোন, বাবা-মা পৃথক পৃথক নাইট ক্লাব, হোটেল-রেঁস্তোরায় নিয়মিত যাতায়াত যাদের সংস্কৃতি; তাদের পরিবার বলতে কি আর থাকতে পারে? এক অর্থে তারা পরিবারের সংজ্ঞাই বুঝেন না। আর অন্যরাও যাতে না বুঝে তার জন্য সম্মেলন করে আইনও করা হয়েছে। যেমন- ২০০০ সালে 'একুশ শতকে সাম্য, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা' বিষয়ে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়- (১) তরুণ-তরুণীদের কোন বাধাধরা না রেখে যৌন স্বাধীনতার প্রতি আহ্বান করতে হবে। (২) পরিবার গঠনে বিয়ের ভূমিকা নির্মূল করতে হবে। (৩) গর্ভ বিনষ্টকে আইনগত মর্যাদা দিতে হবে। (৪) সমকামিতা বৈধ বলে আখ্যায়িত করতে হবে। (৫) বেইজিং সম্মেলনের শপথের উপর কিছু কিছু ইসলামী দেশের পক্ষ হতে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।[১৮৫] তাহলে, পাঠকগণ দেখুন! ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার আইনের ১৬ ধারায় যে বিয়ের অধিকার, সংরক্ষণ, পরিবার গঠন প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে ২০০০ সালের জাতিসংঘের সহযোগিতায় উল্লেখিত প্রস্তাবগুলো নিঃসন্দেহে স্ব-বিরোধী ও নিতান্তই হাস্যকর। প্রকারান্তরে অবমাননাকর। তাহ'লে স্পষ্টই বুঝা যায়, এ সকল মানবাধিকার সনদের কোন গুরুত্ব এখন বিশ্ব বিবেকের কাছে আর গ্রহণীয় নয়। মুশকিল হল ঐ সভ্য দেশের সভ্য ছেলে-মেয়েদের অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার নোংরা এই সংস্কৃতির (Culture) ছোঁয়া এখন খোদ আমাদের দেশেই হিংস্র আকার ধারণ করেছে।

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রীয় আইনে যেখানে উল্লেখ রয়েছে, সন্তানদের অপরাধের কারণে সামান্য মার-পিটের মাধ্যমে শাসন অথবা পিতা-মাতা কর্তৃক বকাঝোকা বা কোনরূপ শাস্তি দেয়া নিষিদ্ধ। সেখানে সন্তানরা স্বেচ্ছাচারী হবে এটাই স্বাভাবিক। তবু জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের এই ধারায় যে পরিবার গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর জন্য সনদ প্রণয়নকারীদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ! কিন্তু সনদ প্রণয়নকারীগণ একটু ইসলামী পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে যদি সনদ প্রণয়ন করতেন তাহ'লে হয়তবা আমাদের আজকের এই লেখার তত প্রয়োজন পড়ত না। আসুন! এবার উপরিউক্ত ধারা-উপধারা গুলোর জবাব বা বিশ্লেষণ ইসলাম কীভাবে দিয়েছে তা অবলোকন করি।

ইসলামের আলোকে বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার :

ইসলামের আলোকে বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে বিবাহ কি এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। কেননা বিবাহ অনুষ্ঠান বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে, ইসলাম ধর্মের সাথে যার কোন সাদৃশ্যতা নেই। ইসলাম ধর্মে প্রথম বিয়ের প্রচলনটা বোঝা যায় মানব সৃষ্টির আদি পিতা-মাতা আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)-এর স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পরস্পর গ্রহণের মাধ্যমে। যদিও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আনিত বিয়ে পদ্ধতির মত ছিল না।

বিবাহের পরিচয় : বিবাহকে আরবীতে বলা হয় 'নিকাহ' (نكاح)। এর আভিধানিক অর্থ, মিলানো, একত্র করা ইত্যাদি।[১৮৬] বিবাহ অর্থে এ শব্দ পবিত্র কুরআনেও এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 'তোমরা তোমাদের পসন্দমত নারীকে বিবাহ কর' *(নিসা ৪/৩)*। শব্দটি সহবাস অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ বলেন, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ 'আর যদি সে তার স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দেয়, তবে ঐ স্ত্রী তার (স্বামীর) জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে (বিবাহ করে) সহবাস না করে' *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*।

বিবাহ মূলত একটি সামাজিক চুক্তি। কেউ কেউ একে মুসলিম দেওয়ানী চুক্তিও বলেছেন।[১৮৭] অর্থাৎ ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় বিবাহ এমন একটি চুক্তিকে বলা হয়, যা এমন দু'জন নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পাদিত হয়, যাদের পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হ'তে শরী'আত বাধা প্রদান করে না এবং এর ফলে তাদের একজন অপর জনকে স্বামী-স্ত্রীসুলভ ভোগ করা বৈধ হয়ে থাকে।[১৮৮] পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী বিয়ে সম্পন্ন হ'তে কয়েকটি শর্তের প্রয়োজন হয়। শর্তগুলো হ'ল-(ক) বর-কনের ইজাব বা সম্মতি (খ) সাক্ষী ও (গ) মোহরানা।[১৮৯] তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে তার পিতা অথবা

১৮২. ডাঃ জাকির নায়েক, ইসলামের উপর ৪০টি অভিযোগ ও তার দলীল ভিত্তিক জবাব, পিস পাবলিকেশন্স, পৃঃ ৩২।

১৮৩. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ইসলামিক সেন্টার, পৃঃ ৭৪।

১৮৪. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-৪, পিস পাবলিকেশন্স, মার্চ-২০০৯, পৃঃ ৭০।

১৮৫. সমঅধিকার নয় মর্যাদা চাই, পৃঃ ০৯।

১৮৬. ইসলামী আইন ও বিচার (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এ্যান্ড লিগাল এইড সেন্টার, মার্চ ২০১৪), পৃঃ ৩১ ।

১৮৭. পারিবারিক আইনে বাংলাদেশের নারী (ঢাকা : আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৩), পৃঃ ৭।

১৮৮. আলাউদ্দীন হাসকাফী, আদ-দুররুল মুখতার (বৈরুত : দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ ১৪১২ হিঃ/১৯৮৩ খ্রীঃ), পৃঃ ৩-৪; ইসলামী আইন ও বিচার, পৃঃ ৩২।

১৮৯. আহমাদ, তিরমিযী, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩১৩০,৩১।

পিতার অবর্তমানে মেয়ের বৈধ অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন আবশ্যক।[১৯০] আমাদের দেশে কন্যার পিতা বা অভিভাবক ছাড়া যে পদ্ধতিতেই বিয়ে হৌক না কেন তা শরী'আত সমর্থিত নয়। যদিও আমাদের দেশে ব্যাপক হারে এই ধরণের বিয়ে কোর্ট ম্যারেজের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এসব বিয়ে নিষেধ এবং ঐ দম্পত্তি থেকে যে সন্তান হচ্ছে তাও বৈধ নয়।[১৯১] অথচ হিন্দু-খৃষ্টান বা অন্য ধর্মে এ ধরণের সম্মতির প্রয়োজন পড়ে না।

মোহরানা :

মোহরানা বিয়ের অন্যতম একটি শর্ত, যা অমান্য করা শাস্তিযোগ্য। তা কম হৌক বা বেশী হৌক। কিন্তু অন্য ধর্মের কথা না হয় বাদই দিলাম, আমাদের মুসলিম সমাজে এ বিষয়ে খুব খাটো করে দেখা হয়। বাকীতে আকাশ-কুসম পরিমাণ মোহরানা বেঁধে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এমনও আছে কারো পরিশোধের ক্ষমতা থাকুক বা নাই থাকুক লক্ষ লক্ষ টাকা মোহরানা ধরা হয়। আবার কোন পরিবার আছে, যারা ৫০ লাখ অথবা এক কোটি টাকাও মোহরানা নির্ধারণ করে থাকে; যা স্রেফ বাকীতে। নগতে কিছুই দেয় না। অতঃপর কোন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে কিংবা স্বামীর মৃত লাশের সামনে গিয়ে স্ত্রীকে বলা হয়, মাপ করলে কি-না! উপায়ন্তর না পেয়ে সেই বিমর্ষ মুহূর্তে স্ত্রী কি আর করতে পারে। পরিশেষে মাপ করে দেয়া হয়। এমন করে নানা ভাবে আমাদের সমাজে মেয়েদেরকে ঠকানো হচ্ছে। অথচ এ নিয়ে নারীবাদীরা কোন কথা বলেন না। বিয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 'তোমরা তোমাদের পসন্দমত নারীকে বিবাহ কর' *(নিসা ৪/৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

'আল্লাহ্র বান্দার প্রতি তাঁর রহমতের নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের মধ্যে তোমাদের স্ত্রী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছে শান্তি পাও। তোমাদের আপোষের মধ্যে ভালবাসা, একে অপরের প্রতি মমত্ববোধ, দয়া সৃষ্টি করেছেন। এতে চিন্তাশীলদের জন্য বড় নিদর্শন আছে' *(রূম ৩০/২১)*।

সুধী পাঠক! সূরা নিসার ৩ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, ইসলাম ছেলেদেরকে পসন্দমত নারী বিয়ে করার স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, পথে-ঘাট, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন মেয়েকে দেখলেই পসন্দ করতে হবে অথবা পসন্দের নামে মেয়ের সাথে আমতলায়-বটতলায় বসে বসে নির্লজ্জ, বেহাপনা ও অশ্লীলতায় মেতে উঠবে অথবা হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, খেলার মাঠ, পার্ক, সিনেমা হলে বিয়ের পূর্বে প্রেম নিবেদনের মাধ্যমে স্বীকৃতি আদায় করবে। বর্তমানে শিক্ষিতদের মধ্যেও মোবাইল কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে এই সমস্ত নোংরা ঘটনা ঘটছে। ইসলাম এগুলো একদম সমর্থন করে না। দেখুন আপনি কোন্ মেয়েকে পসন্দ করবেন, আজীবনের সঙ্গী করবেন তা রাসূল (ছাঃ)-এর নিজ ভাষায় শুনুন। আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একজন মহিলাকে বিয়ে করার সময় চারটি বিষয় লক্ষ্য করা হয়। যথা : ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং দ্বীন। সুতরাং দ্বীনদার মহিলাই তোমার বিয়ে করা উচিৎ। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে'।[১৯২]

সুধী পাঠক! এখানে কয়েকটি দিক ফুটে উঠে। এর মধ্যে সৌন্দর্য, বংশ, অর্থগত দিক দেখার পরে বেশী দ্বীনদারকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যাতে সংসারটি শান্তিময় হয়। বিয়ের পূর্বে ছেলে মেয়েকে একবার দেখে নিবে। এটাই সুন্নাত। এতে বিয়ের পর ছেলে-মেয়ের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হয়। আদর্শ পরিবার গঠনে সুষ্ঠ পরিকল্পনাও করতে পারে। কিন্তু আজকাল সেদিকে খুব কম লোকই ভ্রুক্ষেপ করেন। অনেকে বলবেন, নারীদের ধন-সম্পদ আছে কি-না মানুষ কেবল সেদিকেই গুরুত্ব দেন। কিন্তু তা সঠিক নয়।

বেকার ও দরিদ্রদের বিয়ে : ইসলামের প্রত্যেক সামর্থবান বালেগ-বালেগা নর-নারীকে বিয়ে করতে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু যারা গরীব কিংবা বিয়ের যোগ্যতা রাখেনা তারা কী করবেন? এক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যৌবনকালে আমরা নবী (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম, কিন্তু আমাদের কোন সম্পদ ছিল না। এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে যুবসম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ রাখে তারা যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে (পর স্ত্রী দর্শন থেকে) দৃষ্টিকে নীচু রাখে এবং তার যৌন জীবনকে সংযমী করে। আর যে বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, সে যেন ছিয়াম রাখে। ছিয়াম তার যৌন-বাসনাকে কমিয়ে দিবে।[১৯৩] তবে এর অর্থ এই নয় যে, দরিদ্র বা বেকাররা কখনো বিয়ে করবে না। কারণ এ বিষয়ে ইমাম বুখারী 'বিয়ে' অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه '...যদি তারা দরিদ্র হয়। আল্লাহ মেহেরবাণী করে তাদের সম্পদশালী করে দিবেন' *(নূর ২৪/৩২)*।

কোন কোন দেশে এমনকি মধ্যপ্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে বেকার ছেলেদেরকে অথবা স্বল্প আয়ী পাত্রকে বিয়ে দিতে চায় না। এটাও ঠিক নয়। কারণ এমনও অনেক মেয়ের পিতা রয়েছে যারা ধনাঢ্য, অথচ মেয়েকে বিয়ে দেন না। এই জন্য যে

১৯০. বুখারী হা/৫১৩৬।
১৯১. বুখারী (ব্যাখ্যা) তাওহীদ প্রকাশনী, পৃঃ ৪৫।
১৯২. তাহক্বীক্ব বুলূগুল মারাম হা/৯৭১, বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি।
১৯৩. বুখারী হা/৫০৬৬।

মেয়ের মোহরনা বেশী পাবে। কিন্তু মেয়ের যে বয়স হয়ে যাচ্ছে-লোভী পিতা-মাতা ও অভিভাবক সেদিকে খেয়াল করেন না। এমনকি আমাদের সমাজে অনেক অভিভাবক রয়েছেন যে, আমাদের মেয়েরা শিক্ষিত হবে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করুক পরে বিয়ে দিব। এরকম ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েরা যদি কোন অপরাধ করেই ফেলে তার অভিভাবকগণ কখনোও এর দায় এড়াতে পারবেন না।

উক্ত হাদীছ থেকে আরো একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, বিয়ে-সাদীর ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী ধনী হ'তে হবে এমনটা নয়। শুধু তাই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে দুনিয়াতে একজন সৎ ধার্মিক গরীব ব্যক্তির মর্যাদা অনেক গুণ বেশী। তাঁকে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে সাহল (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে গমন করছিল, তখন তিনি (ছাহাবায়ে কেরামকে) বললেন, তোমাদের এর সম্পর্কে কী ধারণা? তাঁরা উত্তর দিলেন, 'যদি সে সুপারিশ করে, তাহ'লে সুপারিশ গ্রহণ করা যায়, যদি কথা বলে, তবে কান লাগিয়ে শোনা উচিৎ। এরপর সেখান দিয়ে একজন গরীব মুসলিম অতিক্রম করতেই রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? তাঁরা জবাব দিলেন, যদি এ ব্যক্তি কোথাও সাদীর প্রস্তাব করে তো বিবাহ দেয়া ঠিক হবে না। যদি সুপারিশ করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কোন কথা বলে তবে তা শোনার প্রয়োজন নেই। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সমস্ত পৃথিবীতে ঐ ব্যক্তির চেয়ে এ ব্যক্তি উত্তম অর্থাৎ ধনীদের চেয়ে গরীবরা উত্তম।[১৯৪]

এছাড়া গরীব ঈমানদার ব্যক্তি ধনী ঈমানদারের চেয়ে ৫শ বছর আগে জান্নাত যাবে। সূরা রুমের ২১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'নর-নারী পরস্পর বিয়ের মাধ্যমে শান্তি-সমৃদ্ধির মাধ্যমে একটা সুন্দর পরিবার গঠন করতে পারে। বিয়ের মাধ্যমে পর নারীর প্রতি কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে যেমন হেফাযত করতে পারে, তেমনি তাকে পবিত্র করতে পারে। পরিবারে সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে পরিবার তথা সমাজ গঠন হ'তে পারে। সেই সমাজ-ই হ'তে পারে সুশৃঙ্খল, নিরাপত্তা মূলক ও দীর্ঘস্থায়ী। যার মাধ্যমে একটা সুখী, সমৃদ্ধশালী দেশ ও জাতি গঠন সম্ভব। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বিয়ের ক্ষেত্রে এধরনের চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশ নেই।

কন্যার অনুমতি : প্রগতিবাদীগণ অথবা নারীবাদীগণ বলতে পারেন যে, মুসলিম পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের চিন্তা, বিবেক-স্বাধীনতা প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। এমনকি বিয়ের ক্ষেত্রে বর যেমন হোক না কেন তাকে দেখার প্রয়োজন পড়ে না। অথচ মেয়েদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তার বিপরীত। কিন্তু না, এ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান আরো স্পষ্ট। এ সম্পর্কে খানসা বিনতে খিযাম আল-আনছারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন তিনি অকুমারী ছিলেন তখন তার পিতা তাকে সাদী দেন। এ সাদী তার পসন্দ ছিল না। এরপর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গেলে তিনি এ সাদী বাতিল করে দেন।[১৯৫]

১৯৪. বুখারী হা/৬১৯৮।
১৯৫. বুখারী হা/৫১৩৮।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন বিধবা-নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কেমন করে তার অনুমতি নেয়া হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তার চুপ থাকাটাই তার অনুমতি।[১৯৬] এখান থেকে বুঝা গেল যে, শুধু অভিভাবক বা পিতা-মাতার নয়; কন্যাদের পসন্দমত বিয়ের ব্যাপারেও ইসলাম তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান নোংরা সংস্কৃতির মত যথেচ্ছা অনুমতি নয়; বরং পারিবারিকভাবে মার্জিত, সুন্দর ও ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যেই হ'তে হবে।

কনের জন্য কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ধার করা : মুসলিম নর-নারী বিয়েতে এক অপরের জিনিসপত্র আত্মীয়দের নিকট থেকে ধার করতে পারে। মানুষের জীবনে এরূপ সংকট কখনও দেখা দিবে এটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একসময় তিনি আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) থেকে একগাসি গলার হার ধার এনেছিলেন। তারপর তিনি তা হারিয়ে ফেললে রাসূল (ছাঃ) কতিপয় ছাহাবীকে সেটা খুঁজতে পাঠান। পথিমধ্যে ছালাতের সময় হলে পানি না পাওয়ায় তাঁরা বিনা ওযুতেই ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ফিরে আসার পর ঘটনাটি উল্লেখ করেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। ওসায়দ বিন হুযায়র (রাঃ) বলেন, 'হে আয়েশা! আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। কেননা যখনই তোমার উপর কোন অসুবিধা এসেছে, তখন কেবল তোমাকেই তা থেকে মুক্ত করা হয়নি; বরং গোটা মুসলিম জাতি তা থেকে কল্যাণ লাভ করেছে'।[১৯৭] ইসলাম বিয়ে-সাদীতে ছোট-বড়-দাস-দাসীর মধ্যে ভেদাভেদ করে না। যেটা অন্য ধর্মে ও জাতিতে থাকতে পারে। যেমন- হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণের ছেলে-মেয়েদের সাথে হিন্দুদের অন্য বর্ণের গোত্রের মধ্যে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। খৃষ্টানদের মধ্যেও এমন বর্ণ-গোত্র ভেদ রয়েছে। শুধু তাই-ই নয়; খোদ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে পরাশক্তিধর তথাকথিত গণতন্ত্রের দাবীদার এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার রক্ষক (?) সেখানেই কাজে-কর্মে বিয়ে-সাদীতে চরম বৈষম্যের চিত্র পাওয়া যায়। যেমন সেখানকার এক কৃষ্ণাঙ্গ ও শেতাঙ্গ ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিয়ে সংঘটিত হওয়ায় আমেরিকার এক আলাদতে জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেকে কারাদণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ইসলাম কী বলে? আপন দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করার ব্যাপারে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সাফিয়াকে আযাদ করলেন এবং এই আযাদীকে তাঁর সাদীর মোহরানা হিসাবে ধার্য করলেন।[১৯৮]

১৯৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'ওয়ালী ও নারীর অনুমতি' অনুচ্ছেদ।
১৯৭. বুখারী হা/৫১৬৪।
১৯৮. বুখারী হা/৫০৮৬।

এ সম্পর্কে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আপন কৃতদাসীকে শিক্ষা দেয় এবং উত্তম শিক্ষা দেয়; শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। এরপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে তার জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে'।[১৯৯] এখান থেকে বুঝা যায় যে, বন্দী হওয়ার পূর্বে সাফিয়া খ্রীষ্টান ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের প্রভাবে মুসলিম হওয়ার পর দাসী থেকে মুক্ত করে নিজ স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে তাঁকে (সাফিয়াকে) উঁচু মর্যাদার স্থানে অভিষিক্ত করলেন। কারণ তিনি ছিলেন তার পিতার উচ্চ বংশীয় গোত্রের সন্তান। একইভাবে উপরিউক্ত আলোচ্য হাদীছে গরীব দাস-দাসীকে মুক্ত করার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখানে জাতি-গোত্র হিসাবে কোন ভেদাভেদ করা হয়নি। অথচ অন্য ধর্মে-বর্ণে তা প্রকট আকারে বিদ্যমান আছে।

বয়স্ক পুরুষের সাথে কমবয়স্কা নারীর বিয়ে : ইসলামী রীতি অনুযায়ী কম বয়স্কা নারীর সাথে বয়স্ক পুরুষদের বিয়ে হ'তে পারে। উরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর বিয়ের প্রস্তাব করলে আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি তো আপনার ভাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহ্র দ্বীন ও কিতাবের দিক থেকে আমার ভাই। অতএব সে তো আমার জন্য হালাল। তাকে বিয়ে করতে কোন বাধা নেই'।[২০০] উল্লেখ্য যে, ছেলের থেকে মেয়েও যদি বড় হয় সেখানেও বিয়ে করাতে কোন আপত্তি নেই। যেমন-বিবি খাদিজার যখন বয়স ৪০ বছর তখন রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স মাত্র ২৫ বছর।[২০১] এখানে নারীবাদীরা এসকল বিয়ে নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারেন। এর জবাব হ'ল এই যে, এ ধরাতলে নারীরা শুধু পুরুষদের ভোগের ক্রীড়নক হয়ে আসেনি; বরং একটা সুন্দর পরিবার-সমাজ কীভাবে গঠন করা যায় তার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দূরদর্শিতাও এর দ্বারা ফুটে উঠেছে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। এখানে কম বয়সী মেয়ে লালন-পালন করে স্ত্রী হিসাবে তৈরি করাটা অতীব ধৈর্য ও সাহস না থাকলে সম্ভব নয়। আয়েশা (রাঃ) বালেগা হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাঁর সাথে বাসর রাত করেন। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে একমাত্র কুমারী মেয়ে আয়েশা (রাঃ)-কে মাত্র ৬ বছর বয়সে বিবাহ করে, সে সময়ের সমাজের মধ্যে যে কুসংস্কার ছিল তা দূর করেছিলেন। যেমন সে যুগে সহপাঠি, বন্ধু বা যে কোন ভাই সম্পর্কের মেয়েকে বিয়ে করাটা একটা নিন্দনীয় কাজ বলে প্রচলিত ছিল। আবুবকর (রাঃ) ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, দ্বীনী ভাই, ও সহচর। সুতরাং তাঁর মেয়ের বিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হ'তে পারে না। কিন্তু অন্ধকুসংস্কারের এই প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে তিনি (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। যার ফলাফলে পরবর্তীতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ দারুণভাবে উপকৃত হয়। দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা, হাদীছ বর্ণনা, ত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত গোটা মানবজাতিকে তথা বিশ্ব নারী সম্প্রদায়কে চিরকৃতজ্ঞভরে স্মরণ করতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে নারীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) ২২১০ টি অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছে ১২ হাযার শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ইমাম যুহরী বলেন, সকল পুরুষ এবং সকল উম্মুল মুমিনীনের ইলম একত্রে করা হ'লেও আয়েশা (রাঃ)-এর ইলম হবে তাঁদের সবার চেয়ে বেশি। শুধু তাই নয়, আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর বিপদে-আপদে, সাহস জোগানো, খেদমত, সাধারণ মানুষের সমাজ কল্যাণমূলক অবদান, নানা ত্যাগ-তিতীক্ষা বিশেষ করে যৌবনপ্রাপ্ত হয়েও যে ত্যাগ রেখেছেন; এখনকার কেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত এমন নযীর আর মিলবে না। এছাড়া তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত নারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অথচ প্রগতিবাদীরা এ বিয়েকে হাস্যকর এবং বেমানান বলে উল্লেখ করেন এবং এমর্মে ছেলে-মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিতে শুধু নিষেধ নয়; যদি কেউ তা করে তাদের জেল-জরিমানা এমনকি পিতা-মাতাকেও শাস্তি পেতে হবে মর্মে আইন করেছে। অথচ যা সম্পূর্ণ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ এবং মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। সম্প্রতি সরকার বাল্য বিয়ে রোধকল্পে ছেলে-মেয়েদের বিশেষ করে মেয়েদের ১৮-১৬ বছর করতে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কিছু পাশ্চাত্যপন্থী ও তথাকথিত নারীবাদীদের বিরোধীতার কারণে তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বরং এখন সরকার মেয়ের বয়স ১৮-২০ বছর করতে চাচ্ছে। কিন্তু যেটাই হোক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কারণ এর অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। সরকার চাচ্ছেন জনসংখ্যা কমাতে। নারীদের মান স্ট্যান্ডার্ট রাখতে, মেয়েদের কেবল ২/৩ বছর বিয়ের বয়স বাড়ায়, কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। বরং এর হিতে বিপরীত হচ্ছে। পারিবারিক এবং সামাজিক ভাবে যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, নারী হত্যা-গুমসহ নারীজনিত নানা প্রকারের অপরাধ ভয়ংকরভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বিশ্ব ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখতে পাব এর একটি চিত্র। বর্তমানে বিশ্বে প্রতি বছর দেড়কোটি বাল্য বিবাহ হয়। স্ত্রী নির্যাতন করে ৬০ শতাংশ ভারতীয়। বিয়ে হল আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। এর বিপরীতমুখী কোন পদক্ষেপ নিলে তার ফলাফল কখনও কল্যাণকর হতে পারে না, এটাই তার প্রমাণ। কিন্তু ইসলাম বলছে ছেলে-মেয়ে বালেগ-বালেগা হ'লেই বিয়ের ব্যবস্থা কর। যাতে তারা পবিত্র হ'তে পারে এবং পরস্পর নির্ভরশীল জীবন-যাপনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে। একথা অসত্য নয় যে, একজন ছেলে-মেয়েকে বালেগ-বালেগা হয়ে অথবা ঈমানের সাথে থেকে ক্ষেত্র বিশেষে একটু বয়স হয়ে বিয়ে করাটাও ভাল। কারণ মেয়েদের অল্প বয়সে মা হলে তার নিজ স্বামীর খেদমতসহ সন্তানের লালন-পালনের অভিজ্ঞতার একটা ঘাটতি দেখা দিতে পারে। অথবা স্বাস্থ্য অসচেতনার কারণে শারীরিক

১৯৯. বুখারী হা/৫০৮৩।
২০০. বুখারী হা/৫০৮১।
২০১. বিস্তারিত দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৭৭।

অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এজন্য শিক্ষিত সন্তানের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রী তথা পিতা-মাতা। অতএব উভয়ের শিক্ষা অর্জন করতে হবে। যা বিয়ের পরেও সম্ভব। যদি স্বামী-স্ত্রী শিক্ষিত হয়, তাহ'লে তাদের সন্তান মানুষ করার জন্য যেমন সহজ হয়; তেমনি একটি সুন্দর পরিবার ও সমাজ গঠনে দারুণ প্রভাব পড়ে। আর এটাই স্বাভাবিক। এ জন্য ইসলাম পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদেরও পৃথক অবস্থানে পর্দা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দ্বীনী শিক্ষাসহ অন্যান্য ভাল শিক্ষা দেওয়া যরূরী বলে ঘোষণা করেছে। তবে সহ শিক্ষা কখনো নয়। বলা বাহুল্য, পৃথকভাবে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা ইতোমধ্যে আমাদের সমাজে চালু হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডসহ পাশ্চাত্যের অনেক রাষ্ট্র এখন ছেলে-মেয়েদের পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মাধ্যমে ভাল ফলাফল পাচ্ছে বলে তারা প্রকাশ করে।

বিশ্বের তথা অমুসলিম দেশের বিয়ে প্রথা, পরিবার ও সামাজিক ভঙ্গুর চিত্রের কথা না হয় বাদই দিলাম-আমাদের মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে তৎসংক্রান্তে নারী-নির্যাতন যে হারে বেড়েই চলেছে তা অত্যন্ত ভয়ংকর। আদালতের একটি সমীক্ষা দেখলেই বুঝা যাবে। সমীক্ষাতে বলা হয়েছে, 'সুপ্রীম কোর্টের হিসাব মতে, গত ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত দেশের বিচারাধীন নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার সংখ্যা ১ লাখ ৪৪ হাযার ৭৯৬টি। অথচ দেশে ৫৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল ও ১৮টি যেলা আদালতে চলতি বছরের মার্চ (২০১৫) পর্যন্ত ১ লাখ ৪৯ হাযার ২৬৫টি মামলা বিচারাধীন হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের হিসাবে দেখা যায়, প্রতি মাসে দেড় হাযার নতুন মামলা দায়ের হচ্ছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে।[২০২] এ সংক্রান্তে বাংলাদেশ হিউমান রাইটস ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী এ্যাডভোকেট এলিনা খান তার মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। এজন্য তিনি বিচার পদ্ধতিকে দায়ী করতে চেয়েছেন।

সুধী পাঠক! বর্তমানে বিশ্বের ২য় মুসলিম প্রধান দেশ হয়েও এটি মুসলিমদের জন্য কতই না বড় অপবাদ? আর এর জন্য মূলত দায়ী কুরআন-ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন-যাপন না করা। বিয়ে-সাদী, পরিবার গঠন, বিচার-আচার সবকিছু ইসলামী বিধান মতে পরিচালিত না হওয়া। যতদিন নগ্ন সংস্কৃতি তথা ছেলে-মেয়েদেরকে বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে স্বচ্ছ-সুন্দর ইসলামী সংস্কৃতিতে না আনা যাবে এবং বেকার ও দরিদ্রতা দূর না করা যাবে, আল্লাহভীতি আনা না যাবে ততদিন এ থেকে উত্তরণের কোন পথ নেই। এটাই বাস্তবতা।

স্ত্রীর সাথে সদাচরণ :

কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বহু বর্ণনা এসেছে স্ত্রীদের সাথে স্বামীরা কিরূপ ব্যবহার করবে। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে এবং সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপরের হাড়। যদি তা সোজা করতে যাও, তাহ'লে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিতে চাও তাহ'লে বাঁকাই থাকবে। অতএব তোমাদের উচিত হবে নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য'। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আর যদি তোমরা তাদের থেকে ফায়দা উঠাতে চাও তাহ'লে বাঁকা থাকাবস্থায় তাদের থেকে উপভোগ নিতে থাকবে। আর যদি সোজা করতে চাও তাহ'লে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর ভেঙ্গে ফেলার অর্থ ত্বালাক্ব দেয়া'।[২০৩]

অন্যত্র স্ত্রীকে স্বামীর সাথে সদাচরণ ও স্বামীর অধিকার এর ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন- আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে একই বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর সে আসতে অস্বীকার করে, তাহ'লে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ মহিলার উপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে'। ছহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, 'আসমানে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকে, যতক্ষণ না তার স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট হয়।[২০৪]

অতএব উপরিউক্ত সার্বিক বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য ইসলামে নর-নারীর যে বিয়ে, বিয়ের অনুমতি, স্বাধীনতা বা পরস্পর মতামত, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর কর্তব্য প্রভৃতি দিক বিদ্যমান রয়েছে তা জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ত্রুটিযুক্ত দিক-নির্দেশনার আর প্রয়োজন পড়ে না। কেননা ইসলামই একমাত্র সর্বজনীন জীবন-ব্যবস্থা। এখানেই মওজুদ রয়েছে সকল সমস্যার একমাত্র সুষ্ঠু সমাধান। সুতরাং বিয়ের নামে নিকৃষ্ট অবাধ মেলামেশা, লিভটুগেদার, সমকামিতা সহ নানা অশ্লীল যৌনাচার দিয়ে বিশ্বকে যেভাবে কলুষিত করা হচ্ছে তা অচিরেই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। নইলে আল্লাহ্‌র গযব থেকে আমরা কেউই বাঁচতে পারব না। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন!!

(ক্রমশঃ)

[লেখক : সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

২০২. দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ২৬ নভেম্বর ২০১৫, বর্ষ-৬, সংখ্যা-৩১১, কলাম ৮, পৃঃ ২০।

২০৩. তাহক্বীক্ব বুলূগুল মারাম হা/১০১৫ (তাওঃ প্রঃ); বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, দারেমী প্রভৃতি।

২০৪. তাহক্বীক্ব বুলূগুল মারাম হা/১০২১ (তাওঃ প্রঃ); বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, আহমাদ প্রভৃতি।

'তোমরা হীনবল হয়ো না এবং
চিন্তান্বিত হয়ো না;
বস্তুতঃ তোমরাই বিজয়ী,
যদি তোমরা (প্রকৃত) মুমিন হয়'।
(আলে ইমরান ৩/১৩৯)।

আলোকপাত

প্রশ্ন (০১/৬১) : ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) নিজের রায় পরিবর্তন করে হাদীছের ফায়ছালা জারী করেছিলেন মর্মে ঘটনাটি জানতে চাই?

-মিনহাজুল ইসলাম, রাজশাহী

উত্তর : দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর মুজাদ্দিদ বলে খ্যাত, প্রসিদ্ধ তাবেঈ উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ)-এর খিলাফতকালে (৯৯-১০১ হিঃ) বিশ্বস্ত তাবেঈ মাখলাদ বিন খুফাফ আল-গিফারী একটি গোলাম খরীদ করেন ও তার জন্য খাদ্য ক্রয় করেন। তিনি বলেন যে, (কিছু দিনের মধ্যেই) তার কিছু (গোপন ও পুরাতন) দোষ আমার নিকটে প্রকাশিত হয়ে পড়ে (যা বিক্রেতা আমাকে বলেনি)। আমি তখন খলীফার দরবারে অভিযোগ দায়ের করলাম। তিনি আমাকে খাদ্যসহ উক্ত গোলাম ফেরত দানের ফায়ছালা দেন। অতঃপর আমি উরওয়া বিন যুবায়ের (২৩-৯৩ হিঃ)- এর নিকটে এলাম ও তাঁকে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন, আমি সন্ধ্যায় খলীফার নিকটে যাব ও তাঁকে আয়েশা (মৃঃ ৫৭ হিঃ) বর্ণিত রাসূলের হাদীছ শুনাব যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের একটি ব্যাপারে যামানতের বিনিময়ে জরিমানা (الخراج بالضمان) আদায়ের নির্দেশ দান করেছিলেন। একথা শুনে আমি ওমর বিন আব্দুল আযীযের নিকেট আসলাম উরওয়া বর্ণিত নবীর হাদীছ শুনালাম। উমাইয়া খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয তখন বললেন, আমি যে ফায়ছালা দিয়েছিলাম তার চেয়ে এখন আমার জন্য ফায়ছালা কতই না সহজ হয়ে গেল। আল্লাহ জানেন আমি আমার ফায়ছালার মধ্যে 'হক' ব্যতীত কিছুই আশা করিনি। এক্ষণে এ ব্যাপারে আমার নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে হাদীছ পৌঁছে গিয়েছে। অতএব আমি আমার পূর্বের সিদ্ধান্ত বাতিল করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ফায়ছালা জারি কললাম। এরপর উরওয়া (রাঃ) খলীফার নিকটে গেলেন এবং খলীফা আমাকে (ক্রয়মূল্য ফেরত নেওয়া ছাড়াও) খাদ্য দানের বিনিময়মূল্য গ্রহণের ফায়ছালা দান করলেন- যা ইতিপূর্বে বিক্রেতাকে প্রদানের জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/২৮৭৯; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ২/২৮১)*। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে লিখিত অন্য এক ফরমানে বলেন, لَا رَأْيَ لِأَحَدٍ مَعَ سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'রাসূলের সুন্নাতের বিপরীত কারো কোন 'রায়' গৃহীত হবে না' *(দিরাসাত ফিল হাদীছিন নববী ওয়া তারীখু তাদভীনিহি, পৃঃ ১৯; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১৪২-১৪৩)*।

প্রশ্ন (০২/৬২) : 'মুহাম্মাদই (ছাঃ) সর্বপ্রথম জান্নাতের কড়া নাড়াবেন' বক্তটি কি সঠিক?

-আবু যার গিফারী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

উত্তর : হ্যাঁ, রাসূল (ছাঃ)-ই জান্নাতের সর্বপ্রথম কড়া নাড়বেন *(মুসলিম হা/৫০৫; মিশকাত হা/৫৭৪২)*।

প্রশ্ন (০৩/৬৩) : ক্বাদেরিয়া তরীক্বা সম্পর্কে জানতে চাই?

-সাখাওয়াত হোসাইন, তানোর, রাজশাহী

উত্তর : এটি আব্দুল ক্বাদের জীলানী (১০৭৮-১১৬৬ খৃঃ)-এর নামে প্রচলিত তরীক্বা। যদিও তিনি কোন তরীক্বার প্রবর্তন করেননি। তার বংশের গাউছ জীলানী নামে এক ব্যক্তি ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে উক্ত তরীক্বার প্রচলন করেন। আর তথাকথিত ভক্তরা উক্ত তরীক্বার দোহাই দিয়ে আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ)-এর নামে অসংখ্য মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী তৈরী করে সমাজে বাজারজাত করেছে। এভাবে তার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। অথচ এ সমস্ত নোংরা ঘটনার সাথে তাঁর প্রকৃত আক্বীদা ও আমলের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন (০৪/৬৪) : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর একজন কাউন্সিল সদস্যের গুণাবলী জানতে চাই।

-জাহিদুল ইসলাম, সাতক্ষীরা

উত্তর : যে সকল কর্মী (ক) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন (খ) যিনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত অর্থাৎ তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত, ইত্তেবা ও তাক্বলীদ, ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং প্রচলিত রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন (গ) যিনি নিয়মিতভাবে সাংগঠনিক ও ইসলামী গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন (ঘ) যিনি আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বদা জান-মালের কুরবানী দিয়ে থাকেন (ঙ) যিনি নিয়মিত ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখেন ও দেখান (চ) যিনি নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উপরিউক্ত মর্মে নির্ধারিত ফরম পূরণ করেন ও শূরার অনুমোদন লাভ করেন এবং আমীরে জামা'আতের নিকট শারঈ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন *('বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর গঠনতন্ত্র, ৪র্থ সংস্করণ, আগস্ট ২০১২)*।

প্রশ্ন (০৫/৬৫) : 'দ্বীন যদি মানুষের রায়ের উপর ভিত্তিশীল হত, তাহ'লে মোযার নীচে মাসাহ করা যৌক্তিক হত' বক্তব্য কি সঠিক?

-ইমরান, উজিরপুর, বরিশাল

উত্তর : হাদীছটি ছহীহ *(আবুদাঊদ হা/১৬২, ১/২২ পৃঃ; দারেমী হা/৭৯৭; মিশকাত হা/৫২৫)*।

প্রশ্ন (০৬/৬৬) : বিখ্যাত চিকিৎসক যেমাদ আযদী কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি জানতে চাই।

-নাজমুস সাকিব আব্দুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

উত্তর : ইয়ামানের অধিবাসী যেমাদ আযদী ছিলেন ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে জিন ছাড়ানো চিকিৎসক। মক্কাবাসীদের নিকট

সবকিছু শুনে তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে জিনে ধরা রোগী মনে করে তাঁর কাছে আসেন এবং বলেন, يَا مُحَمَّدُ إِنِّى أَرْقِى مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِى عَلَى يَدِى مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ ‘হে মুহাম্মাদ! আমি এই ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি। আল্লাহ আমার কাছে যাকে ইচ্ছা আরোগ্য দান করে থাকেন। অতএব আপনার কোন প্রয়োজন আছে কী?’ জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে শুনিয়ে দেন খুৎবাতুল হাজতের সেই অমৃত বাণী সমূহ, যা প্রতিটি খুৎবা ও বক্তৃতার সূচনায় আবৃত্তি করা পরবর্তীতে সুন্নাতে পরিণত হয়। বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ :

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ.

‘নিশ্চয় সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়াতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল’।

যেমাদ কথাগুলো শুনে গদগদ চিত্তে রাসূল (ছাঃ)-কে বারবার কথাগুলো বলতে অনুরোধ করেন। পরে রাসূল (ছাঃ) কথাগুলো তিনবার বলেন। অতঃপর যেমাদ বলে উঠলেন,

لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاَءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلاَمِ فَبَايَعَهُ.

‘আমি অনেক জ্যোতিষী, জাদুকর ও কবিদের কথা শুনেছি। কিন্তু আপনার উক্ত কথাগুলোর মত কারুর কাছে শুনিনি। এগুলো সমুদ্রের গভীরে পৌঁছে গেছে। আপনি হাত বাড়িয়ে দিন! আমি আপনার নিকটে ইসলামের উপরে বায়‘আত করব’। অতঃপর তিনি বায়‘আত করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০; বিস্তারিত দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৮১-১৮২)*।

প্রশ্ন (০৭/৬৭) : ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর তৃতীয় দফা কর্মসূচী ‘তারবিয়াত’ বা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও করণীয় কী বিস্তারিত জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ মাসঊদ, খুলনা

উত্তর : এ দফার উদ্দেশ্য হ’ল : সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ যুবকদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাতের আলোকে যিন্দাযিল মর্দে মুজাহিদরূপে গড়ে তোলার এবং ধর্মের নামে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতের সকল প্রকার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ইসলামকে বিজয়ী করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী তৈরী করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রকৃত প্রস্তাবে এখান থেকেই আমাদের কাজ শুরু। যে সকল তরুণ ও ছাত্র যুবসংঘের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যুবসংঘের সংগে সংঘবদ্ধ হবে, তাদেরকে উপযুক্ত ট্রেনিং-এর মাধ্যমে প্রকৃত মুজাহিদ করে গড়ে তোলা ঈমানী দায়িত্ব। মোট কথা এই দফার সঠিক বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করে আন্দোলনের সফলতা এবং ইহার উপরই নির্ভর করে সাংগঠনিক মযবুতি ও যোগ্য নেতা ও কর্মী সৃষ্টি।

এ দফার করণীয় : ইসলামী সাহিত্য পাঠ, ইসলামী পাঠাগার স্থাপন, তাবলীগী সফরে অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান, ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ, লেখক সংঘ তৈরী, নৈশ জাগরণ, নফল ইবাদত, শিক্ষা সফর, মুহাছাবা।

প্রশ্ন (০৮/৬৮) : ‘স্বাধীন ও সার্বভৌম’ শব্দ দু’টির মধ্যে পার্থক্য কী?

-রায়হান ইউসুফ ছিয়াম, বাগবাড়ী, বগুড়া

উত্তর : ‘স্বাধীন’ দ্বারা বোঝায় স্বীয় ইচ্ছামত মানুষের কাজ করার অধিকার। আর ‘সার্বভৌম’ দ্বারা বোঝায় রাষ্ট্র যে গুণে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে।

প্রশ্ন (০৯/৬৯) : সৈয়দ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) তাক্বলীদকে কোন্ কোন্ ভাগে বিভক্ত করেছেন? বিস্তারিত জানতে চাই?

-মেহেদী হাসান, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ক্যাম্পাস

উত্তর : ভারতবর্ষে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইলমী মহীরুহ শায়খুল ইসলাম সৈয়দ নাযীর হুসাইন বিহারী দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) তাক্বলীদকে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা : (এক) ওয়াজিব : জাহিল ব্যক্তির জন্য। যে আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে যে কোন বিদ্বানের নিকট হ’তে প্রয়োজন মাফিক মাসআলা জেনে নিবে। তবে এই তাক্বলীদ হবে হাদীছের অনুকূলে হওয়ার শর্তসাপেক্ষে। যদি পরে দেখা যায় যে ফৎওয়াটি ছিল হাদীছ বিরোধী, তবে তখনই সেটা পরিত্যাগ করে তার জন্য হাদীছের উপর অনুসরণ অবশ্যকীয় কর্তব্য হবে। (দুই) মুবাহ : কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করা এই নিয়তে যে, এই তাক্বলীদ কোন শারঈ বিষয় নয়। অন্য মাযহাবের হাদীছ সম্মত কোন মাসআলা ইনকার করবে। বরং নিজেও কখনও কখনও তার উপরে আমল করবে। (তিন) হারাম : ওয়াজিব মনে করে কোন একটি মাযহাবকে নির্দিষ্টভাবে তাক্বলীদ করা। (চার) শিরক : অজ্ঞতার কারণে কোন একজন মুজতাহিদের কথা অনুযায়ী আমল করা। কিন্তু পরে ছহীহ ও গায়র মানসূখ হাদীছ পাওয়া গেলেও তা প্রত্যাখ্যান না করা অথবা তাহরীফ ও তাবীল করে যে কোন ভাবেই হৌক হাদীছকে ঐ মুজতাহিদের কথার অনুকূলে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু কোন অবস্থাতেই অনুসরণীয় বিদ্বানের কথাকে পরিত্যাগ না করা *(শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, ‘ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা ১/১৫৭-৫৮; আহলেহাদীছ আন্দোলন , পৃঃ ১৬৭-১৬৮)*।

প্রশ্ন (১০/৭০) : উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে কয়টি যুগে বিভক্ত করা যায় এবং কী কী?

-ফযলুর রহমান, নওগাঁ

উত্তর : উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে মৌলিকভাবে তিনটি প্রধান যুগে চিহ্নিত করা যায়। যেমন, **(১) প্রাথমিক যুগ :** ২৩-৩৭৫/৬৪৪-৯৮৪ খৃঃ, অন্যূন সাড়ে তিনশত বছর। **(২) অবক্ষয় যুগ :** ৩৭৫-১১১৪/৯৮৪-১৭০৩ খৃঃ, অন্যূন ৭৩৯ বছর এবং **(৩) আধুনিক যুগ :** শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২) থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত। ৩৭৫ হিজরী থেকে অলিউল্লাহ যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর সময়কালকে আমরা উপমহাদেশীয় বিচারে 'অবক্ষয় যুগ' (Age of Decadece) বলছি। কারণ 'গযনবী যুগে' (৩৮৮-৪৪৩/৯৯৭-১০৩০ খৃঃ) ক্ষমতাহারা শী'আদের গোপন দৌরাত্ম্য খুবই বেশী থাকায় সিন্ধুতে হাদীছ চর্চা ও আহলেহাদীছ আন্দোলন পুনরায় জোরদার হ'তে পারেনি। বাহমনী (৭৮০-৮৮৬/১৩৭৮-১৪৭২ খৃঃ) ও মুযাফ্ফরশাহী যুগে (৮৬৩-৯৮০/১৪৫৮-১৫৭২ খৃঃ) আহলেহাদীছ আন্দোলন কেবল দক্ষিণ ভারতেই জোরদার ছিল। কিন্তু রাজধানী দিল্লী হ'তে বাংলাদেশ পর্যন্ত উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিশাল এলাকায় আহলুর রায়দের হুকুমত, সুবিধাভোগী আলেমদের চক্রান্ত ও ব্যাপক সামাজিক অনুদারতার ফলে আহলেহাদীছ আন্দোলন একেবারে নিবু নিবু পর্যায়ে চলে এসেছিল। অতঃপর আওরঙ্গযেব (১০৬৮-১১১৮/১৬৫৮-১৭০৭ খৃঃ)-এর পরবর্তী ভোগলিপ্সু শাসকদের আমলে দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়ার মাধ্যমে অলিউল্লাহ পরিবারের উত্থান আহলেহাদীছ আন্দোলনে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করে। শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ)-এর জিহাদ আন্দোলনের সময়ে যা দ্রুতগতিতে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। মাদরাসা রহীমিয়ারই পরবর্তী বিহারী শিক্ষক শায়খুল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) ছাত্রবাহিনীর মাধ্যমেই প্রধানতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করে এবং দক্ষিণ এশিয়ার বাইরেও বিস্তার লাভ করে *(দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২০৫-২০৬)*।

প্রশ্ন (১১/৭১) : রাফঊল ইয়াদায়েন করার কারণে কোন্ ব্যক্তিকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছিল এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাটি জানতে চাই?

-শাহজাহান, মালদ্বীপ

উত্তর : সাতক্ষীরার স্বনামধন্য গাযী মাখদূম হোসাইন ওরফে 'মার্জ্জুম হোসেন'। তিনি সাতক্ষীরা যেলার সদর উপযেলাধীন ভালুকা চাঁদপুরের অধিবাসী ছিলেন। বৃটিশ ফরমানের মাধমে ব্যাপকভাবে ওয়াহ্হাবী ধরপাকড়ের হিড়িকের মধ্যেও গাযী মাখদূম হোসাইন দুর্বার সাহস নিয়ে শিয়ালকোটের এক মসজিদে রাফঊল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করেছিলেন। ফলে সাথে সাথেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান। উল্লেখ্য যে, সে যুগে ছালাতে রাফঊল ইয়াদায়েন ছিল 'ওয়াহ্হাবী' ধরার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অতঃপর যথারীতি বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। কিন্তু অলৌকিকভাবে ফাঁসির দড়ি তিন তিনবার ছিঁড়ে গেলে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ভয় পেয়ে তাঁকে ছেড়ে দেন। গাযী মাখদূম হোসাইন তাঁর একমাত্র সম্বল ১২০০ গ্রাম ওযনের তামার বদনাটি নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে একসময় সাতক্ষীরার নিজ গ্রাম ভালুকা চাঁদপুর এসে পৌঁছেন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত দিতে থাকেন। আজ সাতক্ষীরার গুনাকরকাটিতে পীরের যে আস্তানা হয়েছে, ওখানকার সমস্ত লোক এক সময় এই গাযী মাখদূম হোসাইনের ওয়ায শুনে ও কেরামতে মুগ্ধ হয়ে তাঁরই নিকটে 'আহলেহাদীছ' হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাতক্ষীরার আলীপুর গ্রামের মক্তবের শিক্ষক 'পীর' নামধারী জনৈক আব্দুল আযীযের প্ররোচনায় তারা পুনরায় 'হানাফী' হয়ে যায়। তবে যে বাড়ীতে ওয়ায হয়েছিল তারা সহ এখনো সেখানে মুষ্টিমেয় সংখ্যক আহলেহাদীছ আছেন ও তাদের একটি জামে মসজিদও রয়েছে *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪২১; দাওয়াত ও জিহাদ, পৃঃ ২০-২১)*।

প্রশ্ন (১২/৭২) : 'রাসূল (ছাঃ)-এর নাক্বীব' খ্যাত ছাহাবী উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) রোম বা ইটালি থেকে কেন ফিরে এসেছিলেন? সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি জানতে চাই?

-ওমর আলী, যশোর

উত্তর : উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে রোমে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানকার মানুষকে কমমূল্যের দিনারের বিনিময়ে স্বর্ণ ও কম মূল্যের দিরহামের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলেন। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা তো সূদ খাচ্ছ। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় কর না সমান সমান ব্যতীত। যেখানে অতিরিক্ত কিছু থাকবে না। তখন মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে আবুল ওয়ালিদ! আমি তো এখানে কোন সূদ দেখি না। তখন উবাদাহ (রাঃ) বললেন, আমি আপনাকে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করছি আর আপনি বলছেন আমি তো এখানে কোন সূদ দেখছি না? হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এখান থেকে বের করুন, যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর অপমান হয়। অতঃপর যখন মদীনাতে ওমর ইবনু খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল, তখন তিনি বললেন, উবাদাহ তুমি এখানে কেন? অতঃপর তিনি ঘটনা বর্ণনা করলেন। ওমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে আবুল ওয়ালিদ! তুমি সেখানে যাও, কেননা তোমার মত সম্মানিত মানুষ যেখানে থাকতে পারবে না সেখানে তো আল্লাহ্র গযব নেমে আসবে। অতঃপর তিনি মু'আবিয়ার নিকট পত্র লিখলেন এই মর্মে যে, উবাদাহর উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব নেই। সে যা বলে তার উপরই তুমি মানুষকে পরিচালনা করবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এটাই *(ইবনু মাজাহ হা/১৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৩/৭৩) : জিনদের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী জানতে চাই?

-রেযাউল করীম, ময়মনসিংহ

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর ত্বায়েফ থেকে ফেরার পথে জিনেরা কুরআন শুনে ইসলাম কবুল করে। জিনেরা দু'বার রাসূল

Contents

(ছাঃ)-এর কাছে আসে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ১০ম নববী বর্ষে ত্বায়েফ সফর থেকে ফেরার পথে তিনি ওকায বাজারের দিকে যাত্রাকালে নাখলা উপত্যকায় ফজরের ছালাতে কুরআন পাঠ করেছিলেন। তখন জিনেরা সেই কুরআন শুনে ইসলাম কবুল করে এবং তাদের জাতির কাছে ফিরে এসে বলে, হে আমাদের জাতি! إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا- يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا 'আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমরা কখনো আমাদের পালনকর্তার সাথে শরীক করব না' *(জিন ৭২/১-২; বুখারী ফাৎহুল বারীসহ হা/৪৯২১; মুসলিম হা/৪৪৯)*।

দ্বিতীয় বারের বিষয়ে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আমরা সবাই মক্কার বাইরে রাত্রিকালে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। কিন্তু এক সময় তিনি হারিয়ে গেলেন। আমরা ভয় পেলাম তাঁকে জিনে উড়িয়ে নিয়ে গেল, না-কি কেউ অপহরণ করল। আমরা চারিদিকে খুঁজতে থাকলাম। কিন্তু না পেয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় রাত কাটালাম। রাতটি ছিল আমাদের জন্য খবই 'মন্দ রাত্রি' (شَرُّ لَيْلَةٍ)। সকালে আমরা তাঁকে হেরা পাহাড়ের দিক থেকে আসতে দেখলাম। অতঃপর তিনি আমাদের বললেন, জিনদের একজন প্রতিনিধি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে তাদেরকে কুরআন শুনালাম। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে করে নিয়ে গেলেন এবং জিনদের নমুনা ও তাদের আগুনের চিহ্নসমূহ দেখালেন। অতঃপর বললেন, তোমরা শুকনা হাড্ডি ও গোবর ইস্তিঞ্জাকালে ব্যবহার করো না। এগুলো তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য' *(মুসলিম হা/৪৫০)*। উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসঊদ কর্তৃক আবুদাঊদে বর্ণিত হাদীছে কয়লার কথাও বলা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৩৯)*।

ত্বায়েফ সফরের ঘটনাবলীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করেন এবং দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে পুনরায় পথ চলতে শুরু করেন। অতঃপর নাখলা উপত্যকায় পৌঁছে সেখানকার জনপদে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। এখানেই প্রথম জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। যা সূরা আহক্বাফ ২৯, ৩০ ও ৩১ আয়াতে এবং সূরা জিন ১-১৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তবে জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের কথা তখনও তিনি জানতে পারেননি। বরং পরে সূরা জিন নাযিলের পর জানতে পারেন। অতঃপর মহান আল্লাহ সুরা আহক্বাফ ৩২ আয়াত নাযিল করে নিশ্চিত করেছিলেন যে, কোন শক্তিই তার দাওয়াতকে বন্ধ করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না, সে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাজিত করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত সে কাউকে সাহায্যকারীও পাবে না। বস্তুতঃ তারাই হ'ল স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত' *(আহক্বাফ ৪৬/৩২)*। এতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মনের মধ্যে আরও শান্তি অনুভব করেন।

নাখলা উপত্যকায় ফজরের ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর কুরআন পাট শুনে নাছীবাইন এলাকার নেতৃস্থানীয় জিনদের ৭ বা ৯ জনের অনুসন্ধানী দলটি তাদের সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে যে রিপোর্ট দেয়, সেখানে বক্তব্যের শুরুতে তারা কুরআনের অলৌকিকত্বের কথা বলে। যেমন إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا- يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا 'আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমরা কখনো আমাদের পালনকর্তার সাথে শরীক করব না' *(জিন ৭২/১-২)*। অতঃপর তারা বলল, وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا 'আমরা নিশ্চিত যে, পৃথিবীতে আমরা আল্লাহকে পরাজিত করতে পারব না এবং তাঁর থেকে পালিয়েও বাঁচতে পারব না' *(জিন ৭২/১২)*। সুহায়লী বলেন, এই জিনগুলো ইহুদী ছিল। অতঃপর তারা মুসলিম হয়। এদের বক্তব্য এসেছে সূরা আহক্বাফ ২৯,৩০ ও ৩১ আয়াতে।

উল্লেখ্য যে, জিনদের ইসলাম কবুলের বিষয়ে সব হাদীছ একত্রিত করলে বুঝা যায়, এরূপ ঘটনা মোট ৬ বার ঘটেছে। প্রথম ঘটনার কথা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারেননি। বরং সূরা জিন নাযিলের পর জানতে পারেন।

উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, শেষনবী (ছাঃ) জিন ও ইনিসানের নবী ছিলেন। বরং তিনি সকল সৃষ্ট জীবের নবী ছিলেন। তিনি বলেন, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ 'আমি সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে দিয়ে নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৮)*। অন্য হাদীছে সূরা সাবা ২৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ 'অতঃপর আল্লাহ তাকে জিন ও ইনসানের প্রতি প্রেরণ করেছেন' *(দারেমী হা/৪৬; মিশকাত হা/৫৭৭৩; বিস্তারিত দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৭৪-১৭৬)*।

প্রশ্ন (১৪/৭৪) : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মীকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য স্তরে উন্নয়নের ধারা জানতে চাই।

-ইফতেখার আলম, নারায়ণগঞ্জ

উত্তর : একজন কর্মীকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য দায়িত্বশীলকে অবশ্যই টার্গেট ভিত্তিক কাজ শুরু করতে হবে। টার্গেট স্থির করার সময় কর্মী শপথের পর থেকে তিনি সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা কতখানি মেনে চলেছেন এবং সংগঠনের উন্নয়ন ও কর্মী বৃদ্ধির জন্য তিনি কি কি কাজ করেছেন, তা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাক্বওয়া

Contents

সম্পন্ন এবং যোগ্যকর্মী বিবেচিত হ'লে কেবল তাকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হিসাবে টার্গেট করা যেতে পারে। অতঃপর তার প্রতিটি কর্ম ও আচরণ ভালভাবে নিরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে, তিনি ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণে যত্নবান কি-না।

এ জন্য যেলার দায়িত্বশীলদের মাঝে-মধ্যে ব্যক্তিগত কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে যোগ্যতার বিচার করবেন এবং যোগ্য বিবেচিত হ'লে কেন্দ্রীয় সভাপতি বা তার প্রতিনিধির সাথে কন্ট্রাক্টের সুযোগ করে দেবেন। অতঃপর কেন্দ্র বিবেচনা মনে করলে তাঁকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হিসাবে অনুমোদন দিতে পারে।

অবশ্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণ আন্দোলনের মূল শক্তি হিসাবে গণ্য হবেন। তাই কয়েকটি লিখিত দায়িত্বই তাদের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদেরকে অনেক অলিখিত দায়িত্ব পালন করতে হয়। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণ হবেন ছাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ্‌র ভয়ে যেমন তাঁরা থাকবেন সদা সন্ত্রস্ত; তেমনি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাতের অতুলনীয় পুরস্কার লাভের আশায় থাকবেন সদা কর্মচঞ্চল। তাঁদের জীবন হবে রুটিনে বাঁধা শৃংখলামণ্ডিত। তাওহীদের জোশে ও ঈমানের শক্তিতে তারা থাকবেন শক্তিমান। তাদের অনুপম চরিত্র-মাধুর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কঠোর আদর্শ-নিষ্ঠা অন্যের হৃদয় আকর্ষণ করবে *(কর্মপদ্ধতি, পৃঃ ১২)*।

প্রশ্ন (১৫/৭৫) : আমার পরিবার খুবই আধুনিক। তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে আমাকে অনেক অনৈসলামিক ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িয়ে যেতে হয়। অথচ আমি নিজে সেগুলো খুবই ঘৃণা করি। কিন্তু প্রকাশ্যে আমি বলতেও পারছি না যে এগুলো ঠিক নয়, আবার তা কাজেও বাস্তবায়ন করতে পারছি না। ফলে নিজেকে খুবই অপরাধী বলে মনে হয়। এক্ষুণে আমার জন্য করণীয় কি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সুফিয়া আখতার, নারায়ণগঞ্জ

উত্তর : প্রিয় বোন! আধুনিকতা অভিশাপ নয়। মূলতঃ ইসলামই আধুনিকতার আবিষ্কারক। কিন্তু আধুনিকতার ব্যবহারকারী তথাকথিত মনুষ্য শ্রেণীর এক প্রকার শিক্ষিত (?) মানুষরা এটাকে অন্য পথে ব্যবহার করে থাকে। পরিবারের অন্য সদস্যদের সামনে ধর্মীয় আলোচনা করা, কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন করতে, ইসলামী পোশাক পরিধান করতে, ইসলামী বিধান পালন করাকেই হয়তো আপনি নিজেকে তাদের নিকট একজন অন্য মানুষে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু আপনি জানেন না ইসলামের আধ্যাত্মিকতার নীরব বিপ্লব কত সুদূরপ্রসারী। অতএব হীনমন্যতা নয়। আপনি আপনার নিজস্ব স্বকিয়তায় আত্মপ্রকাশ করুন। ধর্মীয় চেতনায় নিজেকে উন্মোচিত করুন। নিজেকে পরিবারের সামনে একটি আদর্শ উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করুন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অগ্রগামী হোন। সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সহনশীলতার রূপে আবির্ভূত হোন। প্রত্যহ সকালে সবার আগে ঘুম থেকে জাগ্রত হোন। ছালাত আদায় করুন। কুরআন তেলাওয়াত করুন। আল্লাহ্‌র নিকট নিজেকে বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করুন। পরিবারের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হেদায়াত কামনা করুন। প্রয়োজনে সকালের নাশতা তৈরী শুরু করুন। পিতা-মাতা, অভিভাবক, ভাই-বোন ও প্রতিবেশীদের নিকট ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন। জান্নাতের নে'মতের কথা স্মরণ করুন। জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির কথা বাববার মনে করুন। দুনিয়ার চাকচিক্য পরিহার করুন। চিরস্থায়ী আবাস আখেরাতের সন্ধানে ব্রত হোন। আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করুন। সকল ইবাদত খুশূ'-খুযূ' ভাবে আদায় করুন। বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করুন। আধুনিকতার দুর্গন্ধযুক্ত ড্রেন থেকে নিজেকে পরহেয রাখুন। পাপ কাজ থেকে দূরে থাকুন। অল্পে তুষ্ট থাকুন। অধিকহারে নফল ইবাদত করুন। পরিবারের সকলের শুভ কামনায় আল্লাহ্‌র নিকট প্রাণখোলা দো'আ করুন- *'ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূবে ছাব্বিত ক্বালবী 'আলা দ্বীনিকা, আল্লা-হুম্মা মুছাররিফাল ক্বুলূবে ছাররিফ ক্বুলূবানা 'আলা ত্বোয়া-'আতিকা'*। অর্থাৎ 'হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপরে দৃঢ় রাখুন'। 'হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তর সমূহকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন' *(তিরমিযী হা/২১৪০; মুসলিম হা/২৬৫৪)*।

প্রশ্ন (১৬/৭৬) : আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে উঠা সহজ-সরল জীবন শহরের এই যান্ত্রিক জীবনে খুবই অস্থির লাগে। চতুর্দিকের নোংরা পরিবেশ, নগ্নতা-অশ্লীলতায় আচ্ছন্ন, দুর্নীতি, মারামারি, খুন-খারাবী প্রভৃতির ন্যায় জঘন্য পরিবেশে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও নির্লিপ্ত মনে হয়। প্রশ্ন জাগে মনে, উচ্চা শিক্ষা অর্জনের জন্য এ কোথায় আসলাম? না পারছি ঠিকমত পড়ালেখা করতে, না পারছি নিজের জীবনকে উত্তম মানুষে পরিণত করতে? আর না পারছি পিতা-মাতার মনের আশা পূরণ করতে? তাই এই নোংরা পরিবেশে আমি কিভাবে নিজেকে একজন সফল মানুষে পরিণত করতে পারি এ ব্যাপারে আপনাদের নিকট থেকে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য পরামর্শ প্রার্থনা করছি।

-ছিফাত আহমাদ আলিফ, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা

উত্তর : অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আপনি আপনার সমস্যা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। মৌলিকভাবে শিক্ষা হল নৈতিক শক্তির উন্নতি সাধন। প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতির উর্ধ্বে ওঠে অশান্ত ও অসুস্থ পরিবেশকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের পরিচয়। গ্রাম্য সহজ-সরল মানুষের জীবনধারা সত্যিই তৃপ্তিদায়ক, শান্তিদায়ক এবং উত্তম আবাসস্থল। পক্ষান্তরে শহরের যান্ত্রিক জীবনের হিংস্রতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বসবাসের অনুপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়েছে। ফলে নৈতিক শক্তির জাগরণ ছাড়া সুন্দর পরিবেশ অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। সেখানে ভাল ও মন্দের অসংখ্য দরজা রয়েছে এবং উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশেরও অবারিত সুযোগও রয়েছে। যারা ভাল দরজায় প্রবেশ করবে তার হবে উন্নত, সুসংহত, মার্জিত, রূচিশীল ও শৃংখলিত জীবনের প্রতিক। আর মন্দ

Contents

দরজায় প্রবেশ করলে এর বিপরীত হওয়ায় স্বাভাবিক। প্রিয় বন্ধু! সর্বজনীন বক্তব্য হল, ইসলাম নৈতিক শক্তি অর্জনের মূল হাতিয়ার। তাই সর্বাবস্থায় ইসলামী অনুশাসন মেনে চলুন। নিজেকে যাবতীয় নোংরা পরিবেশ, নগ্নতা-অশ্লীলতা, দুর্নীতি, মারামারি, খুন-খারাবী প্রভৃতি থেকে মুক্ত রাখুন। উত্তম ও তাক্বওয়াশীল বন্ধু নির্বাচন করুন। পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করুন। হিংসা-বিদ্বেষ, যিদ-অহংকার থেকে হৃদয়কে সর্বদা পবিত্র রাখুন। প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসরণ থেকে সর্বোতভাবে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। বেশী বেশী কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অধ্যয়ন করুন। মৃত্যুক স্মরণ করুন। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশী ও সহপাঠীদের সাথে সম্প্রীতি ও সহানুভূতি সম্পর্ক বজায় রাখুন। ঠিকমত অধ্যবসায় করে প্রকৃত মানুষে পরিণত হোন। পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে প্রাণখোলা দো'আ করুন। সর্বোপরি নিজেকে উত্তম ও আর্দশ মানুষরূপে গড়ে তুলতে সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট বিনয়াবনতচিত্তে খালেছ অন্তরে প্রার্থন করুন- '*রাব্বানা আ-তিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতাঁও, ওয়াফিল আখেরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা 'আযা-বান না-র*'। '*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআঁও, ওয়া রিযক্বান ত্বাইয়েবা, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বাববালা*'। অর্থাৎ 'হে আমার প্রতিপালক আল্লাহ! আপনি আমার দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন'। 'হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার নিকট উপকারী ইলম, পবিত্র খাদ্য ও কবুলযোগ্য আমলের জন্য প্রার্থনা করছি' *(বুখারী হা/৪৫২২; ইবনু মাজাহ হা/৯২৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৭/৭৭) : সিন্ধু বিজেতা মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম ও সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে জানতে চাই?

-হাফীযুর রহমান, সিরাজগঞ্জ

উত্তর : প্রাদেশিক আমীরদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম (৬৬-৯৬হিঃ) ছিলেন অনন্য গুণসম্পন্ন নেতা। তাঁর সময় থেকেই সিন্ধু ইসলামী খেলাফতের স্থায়ী প্রদেশের মর্যাদা পায়। খ্যাতনামা ছাহাবী আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর সম্ভাব্য শিষ্য তাবেঈ বিদ্বান তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম ২৭ বছর বয়সে ৯৩ হিজরীতে সিন্ধু আগমন করেন এবং ৯৬ হিজরীতে উচ্চমহলের রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার হয়ে নিহত হন। মাত্র তিন বছরের স্বল্পকালীন সময়ে সমগ্র বিজিত এলাকায় তিনি ইসলামী শাসনের এমন সুবাতাস বইয়ে দেন যে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মুগ্ধ প্রজাসাধারণ তাঁর বিয়োগ ব্যাথায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল এবং অমুসলিমগণ ভক্তি শ্রদ্ধায় তাঁর মূর্তি গড়েছিল। তাঁর সময়ে চতুর্দিকে ইলমে হাদীছের চর্চা হ'তে থাকে। আবর জগৎ হ'তে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী উলামা ও মুহাদ্দেছীন সিন্ধুতে আগমন করতে থাকেন। সিন্ধুর বহু ছাত্র আবর দেশে গিয়ে ইলমে হাদীছের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। ফলে এই যুগে বহু হিন্দী উলামা ও মুহাদ্দিছ-এর জন্ম হয় *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২০৮)*।

সিন্ধু বিজয়ের মূল ঘটনা :

হিজরী ৯৩ সালের কথা । ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৬-৯৬হিঃ)-এর জন্য মাকরান ও তৎসন্নিহিত এলাকায় তাঁর নিযুক্ত শাসক মুহাম্মাদ বিন হারুণ কর্তৃক উপঢৌকন হিসাবে প্রেরিত একটি জাহাজ সিন্ধুর একটি এলাকায় ডাকাতদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। যার মধ্যে শ্রীলংকায় জন্মগ্রহণকারী কিছু পিতৃহীন ইয়াতীম মুসলিম বালিকা ছিল। তাদের মধ্যকার বনু ইযারবূ' গোত্রের একটি মেয়ে 'ইয়া হাজ্জাজ!' বলে চিৎকার করে ডাক দেয়। এ খবর হাজ্জাজের নিকট পৌঁছে গেলে তিনি সাথে সাথে 'লাব্বাইক' বলে ওঠেন এবং সিন্ধুর রাজা দাহিরের নিকট মেয়েগুলোকে ছেড়ে দেবার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজা দাহির অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, 'ডাকাতরা তাদের নিয়ে গেছে। আমি তাদের উপর কোন ক্ষমতা রাখি না'। তখন হাজ্জাজ দাহিরের বিরুদ্ধে পরপর দু'টি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। তৃতীয়বারে মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিমকে প্রেরণ করেন এবং তিনি সিন্ধু বিজয়ে সফল হন *(বালাযূরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ৪২৩-৪২৪)*।

প্রশ্ন (১৮/৭৮) : 'অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক' আয়াতটি কোন্ সূরার?

-আলী হাসান, খুলনা

উত্তর : সূরা ইউসুফ ১২/১০৬ আয়াত।

প্রশ্ন (১৯/৭৯) : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উপযেলা গঠনের নিয়ম-পদ্ধতি জানতে চাই।

-আব্দুল মান্নান, বাঘা, রাজশাহী

উত্তর : (ক) কয়েকটি এলাকা নিয়ে একটি 'সাংগঠনিক উপযেলা' গঠিত হবে। ক্ষেত্র বিশেষে কোন একক এলাকা 'থানা' অথবা 'উপযেলা' হিসাবে অভিহিত হবে। (খ) যেলা সভাপতি স্বীয় কর্মপরিষদ ও সংশ্লিষ্ট এলাকা সভাপতিদের সাথে পরামর্শক্রমে উপযেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন দেবেন। উক্ত তিনজন যেলা সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি ও পরামর্শক্রমে অনধিক ১০ (দশ) সদস্যের পূর্ণাঙ্গ 'উপযেলা কমিটি' গঠন করবেন এবং শপথ নিবেন। (গ) যেলার অনুমোদন সাপেক্ষে উপযেলা শহরে অথবা উপযেলার কোন সুবিধাজনক স্থানে 'উপযেলা কার্যালয়' স্থাপিত হবে। (ঘ) প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ডিগ্রী কলেজ ও ফাযিল-কামিল মাদরাসা উপযেলার মান পাবে। (ঙ) ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট উপযেলা কর্মপরিষদ নিম্নরূপ : সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও দফতর সম্পাদক।

প্রশ্ন (২০/৮০) : Wi-Fi এবং Wimax-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

-সাব্বির আহমাদ, নন্দীগ্রাম, বগুড়া

উত্তর : Wi-Fi এবং Wimax উভয়ই তারবিহীন ডাটা পরিবহন প্রযুক্তি। Wi-Fi ব্যবহার করে ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন ডিভাইসে নেটওয়ার্কিং-এর কাজ করা হয়। কিন্তু Wimax প্রধানত ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

যে পোশাকে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন ইহূদী তরুণী

[পূর্ণাঙ্গ ও মনোনীত সর্বশেষ ধর্ম ইসলামের আলোকিত বিধি-বিধান, বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং নানা প্রথা যুগ যুগ ধরে সত্য-সন্ধানী বহু অমুসলিম চিন্তাশীল মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। যেমন জ্ঞান-চর্চার ওপর ইসলামের ব্যাপক গুরুত্বারোপ অনেক অমুসলিম গবেষককে অভিভূত করেছে। এমনিভাবে ইসলামী হিজাব বা শালীন পোশাক তথা পর্দার বিধানও আকৃষ্ট করে আসছে অমুসলিম নারী সমাজকে। ফরাসি নারী লায়লা হোসাইনও তাদের মধ্যে অন্যতম। এবার আমরা ফরাসি নও-মুসলিম লায়লা হোসাইনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কাহিনী তুলে ধরব]

পাশ্চাত্যের বঞ্চিত ও প্রতারিত নারী সমাজ ইসলামী শালীন পোশাকের মধ্যে প্রশান্তি, নিরাপত্তা ও পবিত্রতা খুঁজে পাচ্ছেন। পাশ্চাত্যের অনেক নারীই সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তারা এই পশ্চিমা ভূবনে মুসলিম মহিলাদের হিজাব দেখেই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়েছেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তারা বলেছেন, আমরা হিজাবের মধ্যে সত্যিকারের সুখ, প্রশান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করছি। ইসলামী হিজাবের এই প্রভাবের কারণে পশ্চিমা সরকারগুলো নানা অজুহাতে হিজাব পরিহিতা নারীদের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করছে। এ ছাড়াও এসব সরকার পর্দানশীন নারীদেরকে একঘরে করার ও দমিয়ে রাখার অপচেষ্টা করছে।

‘কুরআন ছিল আমার প্রথম অনুপ্রেরণা। যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ আমি পেয়েছি তা থেকে বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম সত্য ও খাঁটি ধর্ম। কারণ এ ধর্ম সব নবী-রাসূলকেই শ্রদ্ধা করে। আর আমার দৃষ্টিতেও এটা খুবই যৌক্তিক। ধীরে ধীরে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের শুধু বাহ্যিক দিক নয়, আছে অভ্যন্তরীণ দিকও। তাই ভেতর থেকেও ইসলামকে রক্ষা করতে হবে’।

ফরাসি নও-মুসলিম লায়লা হোসাইন ছিলেন একজন ইহূদী। টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘হিজাবের সৌন্দর্য দেখেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং বেছে নিয়েছেন পরিপূর্ণ হিজাব’। লায়লা হোসাইন বলেছেন, ‘মুসলিমদের ব্যাপারে সব সময়ই আমার মধ্যে এক ধরণের বীতশ্রদ্ধা ছিল। আমি এভাবেই বড় হয়েছি। কিন্তু আমি সব সময়ই হিজাব পরা মুসলিম নারীদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। তাদের পবিত্রতা ও বিনম্রতা আমাকে মুগ্ধ করত। আমার দৃষ্টিতে তাদের রয়েছে এক ধরণের নিজস্ব সৌন্দর্য। আমি ইহূদী সমাজের সদস্য হওয়ায় ইসলামী হিজাব রপ্ত বা আয়ত্ত করা আমার জন্য কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু ঈমান বা বিশ্বাস সম্পর্কে মানুষের ধারণাগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তারা (ইহূদীরা) মুসলিম মহিলাদের চেয়ে ইহূদী মহিলাদেরকেই বেশি শ্রদ্ধা করত’।

ইসলামের অন্য অনেক সৌন্দর্য গবেষণার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় লায়লা হোসাইনের কাছে। পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধিতে তাকে সহায়তা করেছে। তিনি বলেছেন, ‘কুরআন ছিল আমার প্রথম অনুপ্রেরণা। যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ আমি পেয়েছি তা থেকে বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম সত্য ও খাঁটি ধর্ম। কারণ এ ধর্ম সব নবী-রাসূলকেই শ্রদ্ধা করে। আর আমার দৃষ্টিতেও এটা খুবই যৌক্তিক। ধীরে ধীরে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের শুধু বাহ্যিক দিক নয়, আছে অভ্যন্তরীণ দিকও। তাই ভেতর থেকেও ইসলামকে রক্ষা করতে হবে’।

ইসলামে মানুষের আত্মা ও দেহ উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য ইসলামী বিশ্বাসের শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক আচার-আচরণ বা ইবাদতই যথেষ্ট নয়। মন বা হৃদয়ের গভীরে ইসলাম কতটা স্থান করে নিয়েছে লায়লা হোসাইনের মতে সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমা সরকারগুলো ইসলাম সম্পর্কে সঠিক চিত্র তুলে না ধরায় নও-মুসলিমরা অনেক সমস্যার শিকার হন। কিন্তু ইসলামের সৌন্দর্য ও বাস্তবতা নওমুসলিমদের কাছে এতই হৃদয়গ্রাহী যে সব ধরনের কঠোরতা, ক্লেশ ও বাধা-বিঘ্ন সহ্য করা তাদের জন্য সহজ হয়ে পড়ে।

লায়লা হোসাইন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘হিজাব পরার মাধ্যমে আমি নিজেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছি-এই ভেবে আমার পরিবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কারণ ফ্রান্সে হিজাব নিষিদ্ধ। স্কার্ফ বা ওড়না মাথায় দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যাওয়া এ দেশে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ফলে হিজাবধারীকে সামাজিক অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হ’তে হয়। শুধু বিশেষ পোশাক পরার কারণে আমি আমার সামাজিক জীবনকে বিপদাপন্ন করেছি বলে আমার পরিবার মনে করত। এ অবস্থা মেনে নেয়া তাদের জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। তারা মনে করত, আমি আমার মুসলিম হওয়ার বিষয়টি হিজাবের

Contents

মাধ্যমে প্রকাশ না করলেই ভাল হত। ইসলামের প্রতি আমার বিশ্বাস কেবল মনের মধ্যে লালন করলেই তা যথেষ্ট হত বলে তারা মনে করত। কিন্তু আমার কাছে বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পবিত্র কুরআনে ও রাসূল (ছাঃ)-এর অনেক হাদীছে হিজাবের ওপর অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মুসলিম পরিচয়ের জন্যও যে তা যরূরী তা সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। তাই হিজাব পরিত্যাগ করতে রাজি হইনি আমি। আমার কাছে হিজাব শুধু হাত ও মাথা ঢাকার বিষয় নয়, বরং এর চেয়েও বড় কিছু'।

ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অনেক ইহূদী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন। এ ধরনের ঘটনা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রচলিত ইহূদী ধর্ম (যা আসলে আদি বা অকৃত্রিম ইহূদী ধর্ম নয়) অনুযায়ী এ ধর্ম ত্যাগ করা যায় না। ফলে নও-মুসলিম ইহূদীরা অনেক সমস্যার শিকার হচ্ছেন। 'তাসুয়ি ইহুদা লাভ' নামের একজন ইহূদী পুরোহিত বলেছেন, ইহূদীর মেয়েরা অন্য ধর্ম গ্রহণেরও পরও ইহূদী থেকে যায়। কারণ ইহূদী ধর্ম অনুযায়ী ইহূদী মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া ইহূদী অন্য ধর্ম গ্রহণ করার পরও ইহূদী থেকে যায়'।

এ ছাড়াও বিশ্বের ইহূদীদের অভিভাবক হওয়ার দাবিদার দখলদার ইহূদীবাদী ইসরাঈল ফিলিস্তীনের বাইরে ইহূদীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ঠেকানোর জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নিয়েছে। তা সত্ত্বেও ইসরাঈলী 'দৈনিক মারিভ' সম্প্রতি লিখেছে, 'ইসরাঈলের ভেতরেই প্রতি বছর শত শত ইহূদী নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মীয় পরিচয় পরিবর্তনের ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য ইসরাঈলী বিচার-বিভাগের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। ইসরাঈলী ইহূদীদের মধ্যে এ ধরনের আবেদনের সংখ্যা বর্তমানে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে'।

আবার অনেক ইহূদী ধর্ম পরিবর্তন সংক্রান্ত এ ধরনের আবেদন করছেন না, কিংবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে গেলে যেসব সীমাবদ্ধতা ও হয়রানির শিকার হ'তে হবে তা এড়ানোর জন্য এ পবিত্র ধর্ম গ্রহণের কথা প্রকাশ করছেন না। গবেষণায় দেখা গেছে, ফিলিস্তীনিদের ওপর ইসরাঈলী হত্যাযজ্ঞ ও সহিংসতা এবং ইহূদীবাদীদের হাতে তাদের সম্পদ দখল ও লুণ্ঠনের ঘটনাগুলো অধিকৃত ফিলিস্তীনে আসা ইহূদীদেরকে বিকৃত হয়ে পড়া ইহূদী ধর্ম ত্যাগের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে ভূমিকা রাখছে।

ইহূদীদের মধ্যে অন্য ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা বাড়তে থাকায়, বিশেষ করে ইসলামের আকর্ষণ তাদের মাঝে বাড়তে থাকায় ইহূদীবাদী ইসরাঈল অ-ইহূদী বিয়ে করাকে ইহূদী যুব সমাজের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অ-ইহূদী স্বামী বা স্ত্রীর প্রভাবে ইহূদী যুব সমাজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করছে বলেই ইসরাঈল তা ঠেকাতে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ইহূদীবাদী রাজনৈতিক নেতা আভরি আভরবাখ বলেছেন, 'প্রত্যেক ইহূদীর নিজ ধর্ম ত্যাগের ঘটনা ইহূদী গ্রুপগুলোর জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ক্ষতি বয়ে আনছে। কিন্তু লায়লা হোসাইনের মতে, 'সত্য ধর্ম তার স্বচ্ছতা ও স্পষ্ট নানাভিদ শিক্ষার কারণেই মানুষের অন্তর জয় করছে এবং জীবন, ভালবাসা ও বিশ্বাসের প্রকৃত অর্থ তুলে ধরছে'। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপসন্দ করে'।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

স্মরণদীবের স্মরণকথা

(এক)

‘আই বোয়ান’ দীর্ঘজীবী হউন। সিংহলিজদের প্রথম সম্ভাষণ, শেষ সম্ভাষণ। শ্রীলংকা সফরে সিংহলীজ ভাষার এই একটি শব্দ ছাড়া আর কিছু বোধগম্য হয়নি। অবশ্য এক বিমানে ছাড়া শব্দটি আর কানে আসেনি। সিংহল দেশে ক্ষণিকের জন্য পা রাখার সুযোগ হ’ল ৬ জুলাই ২০১৫। ১৮ রামাযানের রাত। দিন গড়িয়ে রাত তখন প্রায় ৭টা বেজে ১০ মিনিট হ’তে চলেছে। করাচী থেকে শ্রীলংকান এয়ারলাইন্সে ওঠার পর ভাবছিলাম, রাতে ট্রানজিটের ৯টি ঘণ্টা কলম্বো বিমানবন্দরে কাটাব কীভাবে। রাত বলেই একটু চিন্তা। অবশেষে তার অবসান ঘটল। অনিশ্চয়তার সময় আল্লাহ্র রহমত টের পাওয়া যায় নগদে। বিমানবন্দরে নামার পর হাঁটছিলাম আনমনে ইতিউতি করে। করাচীর মত বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত না হলেও ঝা চকচকে বিমানবন্দর। নানা দেশ নানা বর্ণের মানুষের পদভারে গমগমে। পর্যটনের দেশ শ্রীলংকা। সারাবছর ভরপুর থাকে পর্যটকে। ছাদের উপর ঝুলন্ত প্রধানমন্ত্রী মাইথ্রিপালা সিরিসেনার পোর্ট্রেট ছবি দেখে বোঝা যায় এসে গেছি শ্রীলংকা। ডিউটি ফ্রি শপের প্রবেশমুখে বিশালাকার বুদ্ধমূর্তিও জানান দেয় তুমি এখন বৌদ্ধদের দেশে। করাচী থেকে সহযাত্রী হয়ে আসা দুই বর্মী তাবলীগী ভাইকে ভারী ব্যাগ-বোচকা নিয়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে দেখে থমকে দাঁড়াই। দু’জনের একজন সামান্য উর্দূ জানেন। সেটুকু সম্বল করে ইণ্ডিয়া-পাকিস্তান ঘুরে এসে এখন তারা স্বদেশের পথে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এই ভাষাহীন মানুষগুলো কীভাবে দাওয়াতের কাজ করেন আল্লাহ মা’লূম। আরাকানী মুসলিমদের দুরবস্থার কথা জানতে চেয়ে বিশেষ কোন উদ্বেগ টের পাইনি তাদের চেহারায় বা কথাবার্তায়। নিতান্তই আলাভোলা প্রকৃতির। তাদেরকে ট্রানজিট যাত্রীদের বিশ্রামাগার খুঁজে দেয়াটা দায়িত্ব মনে করলাম। আর সেটা করতে গিয়েই সৌভাগ্যক্রমে নিজের গন্তব্যটাও খুঁজে পেলাম। এয়ারলাইন্সের সৌজন্যে হোটেল বরাদ্দ হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

গাড়িতে হোটেলে যেতে যেতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্যাগোডা, মন্দির, চার্চ এবং বিশাল বিশাল মূর্তির বহর দেখে বিস্মিত হলাম। অন্তত খৃষ্টান চার্চগুলো এত মূর্তিময় হ’তে পারে, ধারণা ছিল না। প্যাগোডা আর মন্দিরের পার্শ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতেই কি এত মূর্তির আমদানি! কলোম্বোর পাশ্ববর্তী শহর নেগোম্বোতে একদম সাগরতীরে অবস্থান চমৎকার হোটেলটির। রাতের খাওয়ার পর হোটেলের পিছন দিয়ে সাগরপাড়ে নেমে এলাম। ১১টা বেজে গেছে। মেঘে ঢাকা আকাশ। দূরাগত নিয়নবাতির ক্ষীণ আলো রাতের জমাট আঁধারকে যেন আরো জমাট করে তুলেছে। নির্জন গা ছমছমে সৈকতে তখন কেবল তরঙ্গক্ষুব্ধ সাগরের তুমুল গর্জন আর শো শো নোনা বাতাস। সারি সারি হাযারো নারিকেল গাছ উথাল-পাথাল আবহ সঙ্গীত বাজাচ্ছে অবিরাম। সেই মিলিত সুরের আবেশে ঢেউয়ে পা ছুঁইয়ে বালুকাবেলায় হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর গেলাম। নিশুতি রাতের নিরবতা খান খান করা ঢেউয়ের আওয়াজ হৃদয়জগতের সবগুলো জানালা খুলে দেয়। ডুবিয়ে দেয় এক অন্তহীন কল্পনার প্লাবনে। সেই ঘোরলাগা প্রহর কাটিয়ে হোটেলে ফেরৎ আসলাম ১২টার পর। গোছল এবং ছালাত আদায় শেষে ১টা বেজে গেল। ঘণ্টা দুই পরই সাহারী করতে হবে। ঘুমাবো না সিদ্ধান্ত নিয়েও ঘুম এসে গেল একফাঁকে। ঘুম ভাঙলো সাড়ে তিনটার দিকে। কাছে থাকা এক প্যাকেট দুধ দিয়ে সাহারী সারলাম। ফজর ছালাত শেষ করতেই টেলিফোন বাজল। ৪টার মধ্যে বেরিয়ে আসলাম হোটেল ছেড়ে। ভোরের আলো ফোঁটার অনেক আগেই দেখা গেল রাস্তায় মানুষের চলাচল শুরু হয়ে গেছে। টুপি পরা মসজিদগামী কিছু মানুষেরও দেখা মিলল। বিমানবন্দরে এসে আনুষ্ঠানিকতা সারতে বেশ সময় লাগল। তার কারণ সাথে থাকা পাকিস্তান থেকে আনা রুটি মেকার। কাস্টমসওয়ালারা ঐ জিনিসটা খুব পসন্দ করল। নেড়ে চেড়ে দেখল অনেকক্ষণ। পরস্পর মজা করল। পরিশেষে সকলেই একমত হ’ল তাদের গিন্নীদের জন্য এমন একটি জিনিসের বড়ই প্রয়োজন।

লাউঞ্জে গিয়ে বসার পর অনেক বাংলাদেশীর সাথে দেখা হ’ল। মালদ্বীপ থেকে এসে কানেক্টিং ফ্লাইটে বাংলাদেশ যাচ্ছে। সকলেই প্রায় শ্রমিক। ৭টার দিকে উড়াল দিল বিমান। শ্রীলংকা এতটা সবুজে সবুজে ভরা ধারণাই ছিল না। প্রায় অর্ধেকটা দেশ জুড়ে বোধহয় কেবল নারিকেল গাছ। সাতসকালের সোনালী আলোর ঝলকানীতে আকাশের উপর থেকে সেই ঘন সবুজ বনানী অনন্যরূপে ধরা দেয়। সেই সবুজকে ঘীরে ভারত মহাসাগরের অন্তহীন নীলাভ জলরাশি আর সাগরতটে দুগ্ধ ফেনিভ ঢেউয়ের রেখা কি যে এক অপরূপ নিসর্গের সৃষ্টি করেছে! নীল সমুদ্রে পটে আঁকা ছবির মত সাদা সাদা দ্বীপপুঞ্জ আর চওড়া লেগুনগুলো তন্ময় হয়ে দেখতে থাকি জানালা দিয়ে। মোটামুটি তখনই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলি, দেশ থেকে ফেরার পথে দিন কয়েকের জন্য বিরতি নিতেই হবে পৃথিবীর অন্যতম সৌন্দর্যবিধৌত এই দ্বীপরাজ্যে।

(দুই)

আদিকালে আরবরা বলত ‘স্বরণদীব’। যার মূলে ছিল সংস্কৃত শব্দ ‘সিমহালাভিপা’। পরবর্তীতে নাম হয় ‘সীলান দ্বীপ’। ভূপর্যটক ইবনে বতুতা দু’টি নামই উল্লেখ করেছেন তাঁর সফরনামায়। পর্তুগীজ এবং বৃটিশরাও এই সীলান নামটি ব্যবহার করত। অতঃপর ১৯৭২ সালে দেশটির পরিবর্তিত নাম হয় ‘শ্রীলংকা’। যার সংস্কৃত অর্থ ‘সুন্দর দ্বীপ’। তবে

সীলন শব্দটি এখনও বহুল ব্যবহৃত। দেশে দেড় মাস ছুটি কাটিয়ে আবার পাকিস্তান ফেরত যাওয়ার পথে এক দিনের বিরতি ছিল কলম্বোতে। সেটাকে তিন দিনে রূপান্তরিত করতে তেমন কাঠখড় পোড়াতে হ'ল না। ভিসার প্রক্রিয়াও খুব সহজ। ২৫ আগস্ট দুপুরে ঢাকা থেকে রওনা হলাম। ব্যস্ততার মধ্যে সফরটি সাজিয়ে নেয়ার সুযোগ ছিল না। কেবল ওয়েবসাইট থেকে নেয়া ভাসাভাসা হালকা কিছু তথ্য এবং পূর্বপরিচিত কলম্বো শহরের দু'জন ভাই 'শ্রীলংকা তাওহীদ জামা'আতে'র সেক্রেটারী আব্দুর রাযিক এবং তাওসীফ আহমাদের ঠিকানাই ছিল ভরসা। আব্বার থিসিস থেকে 'শ্রীলংকায় আহলেহাদীছ আন্দোলন' অংশটিও অবশ্য একবার পুনরাবৃত্তি করে রেখেছি। বিমানে ওঠার পর যথারীতি মনটা খারাপ। দুই ভাগ্নে-ভাগ্নির জন্য একটু বেশীই। দেশ ছাড়ার পর থেকে দেখছি এই জাতীয় আবেগ বেশ গাড়ভাবে জায়গা করে নিয়েছে ভিতরে। প্রায় ৩ ঘণ্টা যাত্রার পর কলম্বোতে নামলাম। আনুষ্ঠানিকতা সারতে সময় লাগল না। বাইরে এসে ডলার ভাঙিয়ে শ্রীলংকান রুপিয়াহ নিলাম। সেই সাথে সীমকার্ড। মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম শায়খ ইয়াহইয়া সিলমী এবং আব্দুর রাযিক ভাইয়ের সাথে। কিন্তু দু'জনের কাউকে পাওয়া গেল না। অগত্যা কলম্বো শহরে পৌঁছে পরবর্তী করণীয় ভাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। এয়ারপোর্ট থেকে ১ ঘণ্টা পর পর শাটল বাস যায় কলম্বো সিটি বাস টার্মিনালে। সেই বাসে চেপে বসলাম। দুই বাঙালী যুবককে পেলাম একই বাসে। তারাও শ্রীলংকা বেড়াতে এসেছে। লম্বা শশ্রুমণ্ডিত দু'জনই। অথচ এমন উগ্রভাবে সিগারেট ফুঁকছে যে দ্বিতীয়বার কথা বলার রুচি হ'ল না।

৪৫ মিনিট লাগল কলম্বো ফোর্ট বাস টার্মিনালে পৌঁছতে। বাস থেকে নেমে গল রোডের দেহিওয়ালাতে অবস্থিত সালাফী সেন্টারে যাওয়ার জন্য টুকটুক (সিএনজি) ভাড়া করলাম। শায়খ ইয়াহইয়া সিলমীর পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ওয়েবসাইট থেকে নিয়েছিলাম। একজন সঊদী ফেরত আলেম হিসাবে তাঁর সাথেই প্রথম সাক্ষাৎ করা কর্তব্য মনে করলাম। দীর্ঘ যানজট কাটিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর পৌঁছলাম সেই ঠিকানায়। কিন্তু অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পেলাম না। শায়খ ইয়াহইয়াকে আবার ফোন করলাম। এবার ফোন ধরলেন তিনি। কিন্তু যা বললেন তাতে 'থ' হয়ে গেলাম। কলম্বোর এই অফিসটি তাঁরা সম্প্রতি গুটিয়ে নিয়েছেন। বর্তমান অফিসটি তাঁর আবাসস্থল তথা নেগোম্বোতে। সেখানেই যাওয়ার আমন্ত্রণ করলেন। সেই সাথে যোগ করলেন, 'কলম্বো শহরে আরও কিছু সালাফী দাওয়াহ সেন্টার রয়েছে, তবে তারা কেউই প্রকৃত সালাফী নয়, বরং সালাফী দাওয়াতের শত্রু! সুতরাং অন্য কোন অফিসে যাওয়া মোটেই ঠিক হবে না'। ফোন রেখে বেশ ধন্দে পড়ে গেলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নেগোম্বো যেতে আরও প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। একে তো নতুন দেশ এবং অপরিচিত জায়গা, তার উপর ভারী লাগেজ নিয়ে রাতের বেলা ঠিকানা খোঁজাখুঁজি। মন সায় দিল না। আপাততঃ কোন হোটেলে আশ্রয় নিয়ে একটু স্থির হয়ে নেয়া প্রয়োজন। সেই টুকটুক ড্রাইভারই নিয়ে এলো গল রোডে ওয়াল্লাওয়াত্তা (কলোম্বো-৬) নামক স্থানে। সাগরের পার্শ্বেই স্টেশন রোডে সুরিয়ান রেস্টহাউজে ঠাঁই নিলাম। ক্যাথলিক ড্রাইভার অনিষের আন্তরিক সহযোগিতা ছিল সত্যিই দারুণ। পর্যটনের দেশ হওয়ায় কাজ চালানোর মত ইংরেজী জানে এখানকার অধিকাংশ ড্রাইভার। ফলে ভাষাগত সমস্যায় পড়তে হয়নি। শুরুতেই শ্রীলংকার মুসলিমদের সম্পর্কে নিজ থেকেই ভাল ভাল মন্তব্য করে মনটা জয় করে নিয়েছিল। সিটি সেন্টারসহ শহরের প্রধান প্রধান স্পটগুলো চিনে নিয়েছিলাম তার কাছ থেকে। হোটেল মালিকের সাথে কথাবার্তা বলে থাকার সুবন্দোবস্ত তার হাতেই হ'ল। তবে হাদিয়াটা দিতে হ'ল অনেক চড়া। রাতের খাবারের জন্য নিকটবর্তী এক হোটেলে ঢুকলাম। কলাপাতায় রোল করা লাল ভাত আর নারিকেল মেশানো অপরিচিত সব খাবার। চেনা খাবার শুধু পরাটা আর ডিমভাজা। সেটাই অর্ডার দিলাম। বিল দিতে গিয়ে আঁৎকে উঠতে হ'ল। যদিও রুপিয়ার মান অনেক কম (১ ডলার=১৩৬ রুপিয়াহ), তারপরও জিনিসপত্রের দাম তুলনামূলক যথেষ্টই বেশী। রুমে এসে আব্দুর রাযিক ভাইকে ফোনে পেলাম। বিকালে সাংগঠনিক প্রোগ্রামে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা। কলম্বো-১০ এ তাঁদের অফিসটি। ওয়াল্লাওয়াত্তা থেকে বেশ দূরে। সুতরাং পরদিন তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রোগ্রাম ধার্য হ'ল। রাতে শুয়ে পড়লাম ১০টার মধ্যেই।

পরদিন সকালে উঠে সাগরপাড়ে হাঁটতে বের হলাম। তীর ঘেঁষে শতবর্ষের পুরোনো ওয়াল্লাওয়াত্তা রেলস্টেশন। বৃটিশ শাসনের স্মৃতি বহন করছে যথারীতি। কিছুক্ষণ পরপর ট্রেন আসছে-যাচ্ছে। অফিস, স্কুল-কলেজগামী মানুষ বাদুড়ঝোলা হয়ে ট্রেনে চড়ছে। নিজ দেশের পরিচিত দৃশ্যের সাথে মিলটা খুঁজে পেয়ে মনে মনে হাসি। স্টেশনে ঢুকে স্টেশনমাষ্টারের কাছে গল এবং ক্যান্ডি যাওয়ার পথ সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। তিনি খুব আন্তরিকতার সাথে কোন্ বাসে কিভাবে যেতে হবে সবিস্তারে লিখে দিলেন। সেখান থেকে ফিরে নাস্তা করতে বের হলাম। এক পথচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কোথাও মুসলিম রেস্টুরেন্ট আছে কি-না? তিনি দূরে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলেন একটি হোটেল। হোটেল ডি ফাইয়ায। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের কাছাকাছি এসে বিপরীত দিকে সোনালী গম্বুজবিশিষ্ট বিশাল এক দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নযরে এল। আরবীতে লেখা–মাসজিদুল জামে' ওয়াল্লাওয়াত্তা। মনটা আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। মসজিদে ঢুকে মুয়াজ্জিন ও খাদেমসহ কয়েকজনের দেখা পেলাম। মসজিদ, আবাসিক বাসা, ছোটদের জন্য সাপ্তাহিক মাদরাসা এবং হিফয মাদরাসা মিলে

পূর্ণাঙ্গ একটি কমপ্লেক্স। পাগড়ি পরিহিত বাচ্চাদের সাথেও কুশল বিনিময় হ'ল। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ঢুকলাম। ভাত দেখে তর সইল না। অর্ডার দিতে চারকোন বিশিষ্ট প্লেটে লাল চালের ভাত, চারকোনায় নারিকেলের তরকারী, ডাল, শুটকি মাছ, নাম না জানা শাক আর উপরে একটি সিদ্ধ ডিম সাজিয়ে নিয়ে আসল। রেডরাইস কারি। নারিকেলের প্রাচুর্যের কারণে এদেশের প্রায় সব খাবারে নারিকেলের উপস্থিতি অপরিহার্য। শুধু তাই নয় নারিকেলের শাস দিয়েও তৈরী হয় আলাদা তরকারী। ক্ষুধার মাথায় খুব তৃপ্তি ভরে খেলাম। তবে নাক, চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল ঝালের দাপটে। পরের কয়েকদিনে অবশ্য টের পেয়েছি ঝাল খাওয়া শ্রীলংকানদের জাতীয় ঐতিহ্যেরই অংশ। তারা গর্ব করে বলে শ্রীলংকা হ'ল চিলিলংকা/স্পাইসিলংকা। সুতরাং খাবার টেবিলে বসতে হ'লে ঝালের তীব্রতা মাথায় রেখেই বসতে হবে।

নাস্তা শেষে আবার হোটেলে ফিরলাম। যোহর পড়ে কলম্বো ফোর্ট বাস টার্মিনালের উদ্দেশ্যে রওনা হব, তারপর ক্যান্ডি হয়ে হাট্টন শহরে পৌঁছে রাতে বিখ্যাত 'এ্যাডামস পীকে' আরোহণ করব–এভাবেই সাজিয়েছিলাম প্ল্যান। হাতে সময় আছে দেখে সাগরে গোসল করতে নামলাম। দীর্ঘদিন পর সাগরে নামা। কক্সবাজার সৈকতে ৩ নং সতর্ক সংকেতের মধ্যে বিশাল বিশাল ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে নির্ভয়ে দাপাদাপি করেছি। কিন্তু এখানকার ঢালু সৈকতে স্রোতের তীব্র টান দেখে সে সাহস পেলাম না। তারপরও ঘণ্টাখানেক গা ভিজিয়ে ফিরে আসলাম।

মসজিদে যোহরের জামা'আতের টাইম দেখে এসেছি ১২টা ২৭ মিনিটে। অর্থাৎ ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে আযান হয়। আর তার ১০ মিনিট পরই ছালাত। ফজরের ছালাত বাদে সব ওয়াক্তে একই নিয়ম। ৯৫% শাফেঈ মাযহাবপন্থী মুসলিমদের এই দেশে এটাই ছিল আমার কাছে প্রথম চমক যে, জামা'আতের সময় এখানে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। গোসল করে সময়মত মসজিদে হাযির হলাম। সুসজ্জিত দোতলা বিরাট মসজিদ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। ছালাতের নিয়মে আমাদের সাথে তেমন কোন তারতম্য পেলাম না, কেবল পায়ে পা মিলানোয় আলসেমি ছাড়া। ছালাত শেষে অবশ্য সম্মিলিত মুনাজাত হ'ল। সুন্নাত ছালাতের পর মুয়াজ্জিন আমাকে ইমাম ছাহেবের ঘরে নিয়ে গেলেন। নাম মুহাম্মাদ হাসান। বয়স ৩৫-এর কোঠায়। অতিশয় ভদ্র এবং দ্বীনদার চেহারা। সাবলীল ভঙ্গিতে আরবী বলা শুরু করলে জিজ্ঞাসা করলাম আরব দেশে পড়াশোনা করেছেন কি না। জানালেন, পড়াশোনা করেছেন শ্রীলংকাতেই, গলে অবস্থিত মাদরাসা বাহজাহ ইবরাহিমিয়াতে। সেখানে এক মিছরী শিক্ষকের কাছে তাঁর আরবী ভাষার হাতেখড়ি।

তিনি জানালেন, রাজধানী কলম্বোসহ গোটা দেশে মুসলিমদের অবস্থান যথেষ্ট শক্ত। বিশেষতঃ দেশটির পূর্বাঞ্চলে। মুসলিম জনসংখ্যা ১০% তথা ২০ লক্ষের মত। কলম্বো শহর এবং শহরতলীতে অর্ধশতাধিক মসজিদসহ কয়েকটি মাদরাসাও রয়েছে। কলম্বোর কেন্দ্রস্থল কলম্বো ফোর্ট এলাকায় হানাফী (মেমন) এবং ব্রেলভীদের মসজিদ থাকলেও অধিকাংশ মুসলিম শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী। আক্বীদার ক্ষেত্রে তারা আশ'আরী মতাবলম্বী। মাযারপুজায় বিশ্বাসী না হলেও ছূফী তরীকা শাযলীয়াহ ফাসিয়াহ অনুসরণ করেন একটা বড় অংশ। তাবলীগ জামা'আতের প্রভাব সর্বব্যাপী। মুসলিমরা সবাই মূলতঃ তামিলভাষী। তবে অমুসলিম তামিলদের থেকে নিজেদের পৃথক করার জন্য নিজেদের 'মূর' তথা আরব বংশদ্ভূত মুসলিম বলে পরিচয় দেন। অবশ্য পর্তুগীজরাই প্রথম তাদেরকে মূর (স্পেনে মুসলিমদেরকে মূর বলা হত) বলা শুরু করে। কিন্তু ঐতিহাসিক মতে, বর্তমানে প্রাচীন আরব বণিকদের রক্তধারা বহনকারী মুসলিমের সংখ্যা খুব কম। বরং অধিকাংশের পূর্বপুরুষ ইণ্ডিয়ান তামিল। এছাড়া ডাচ ঔপনিবেশিক আমলে (১৬৫৮-১৭৯৬ খৃঃ) মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে অনেকে অভিবাসী কিংবা নির্বাসিত হয়ে আসেন শ্রীলংকায়। কেননা জাভা দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল সে সময় ডাচদেরই করতলগত ছিল। এই মালয়ী মুসলিমদের সংখ্যাও কম নয়। প্রায় ৫০ হাযার। তারা আজও মালয়ী মিশ্রিত তামিল ভাষায় কথা বলেন।

মসজিদগুলোতে তামিল ভাষাতে খুৎবা হয়। তামিল ভাষায় শ্রীলংকা এবং ইণ্ডিয়ায় প্রচুর ইসলামী বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যার সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের তেমন পরিচয়ই ঘটেনি ভাষাগত দূরত্বের কারণে। সরকারীভাবে সিংহলিজ এবং তামিল দু'টি ভাষাই সমানভাবে স্বীকৃত এবং রাস্তাঘাটে সকল সাইনপোস্টে দুই ভাষাতেই পথনির্দেশ রয়েছে। প্রায় ৭০% বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশ। তা স্বত্ত্বেও সরকারীভাবে মুসলিমদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। মুসলিম জনগোষ্ঠীর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে। জেনে ভাল লাগল, শ্রীলংকার জাতীয় পতাকার সবুজরঙ্গা অংশটি সেদেশের মুসলিম ঐতিহ্য বহন করছে।

ইমাম ছাহেব আমার সফর পরিকল্পনা শোনার পর বললেন, যদি গলে যান তবে অবশ্য গল ফোর্টের ভেতর অবস্থিত শ্রীলংকার অন্যতম প্রাচীন মাদরাসা 'মাদরাসা বাহজাহ ইবরাহিমীয়াহ' ঘুরে আসবেন। মাদরাসার মূদীর মাওলানা রিযভী ছাহেবের মোবাইল নম্বরও দিয়ে দিলেন। তাঁর সাথে কথা শেষ হবে এমন সময় জানালেন, আমাদের এই মসজিদে একজন বাঙালী ভাই ছালাত আদায় করেন। মুয়াজ্জিন তৎক্ষণাৎ মসজিদে ঢুকে সেই ভাইকে পেয়ে গেলেন এবং ভিতরে ডেকে আনলেন। আমি তো আনন্দে উল্লসিত। মনে হ'ল কতদিনের পরিচিত ব্যক্তিকে যেন কাছে পেলাম।

একটা গোপন কথা ফাঁস করি, বাঙালীরা নতুন নতুন কোন দেশে গিয়ে কোন বাঙালীর সন্ধান পেলে আনন্দে আটখানা হন বটে, কিন্তু অনেকদিন ধরে যারা সে দেশে আছেন তারা আবার উল্টা বাঙালী দেখলে অনেক সময় এড়িয়ে যেতে চান। তার কারণ তারা ভেবেই বসেন যে লোকটা হয় বিপদে পড়েছে, তাকে সাহায্য করা লাগবে কিংবা কোন মতলব নিয়ে এসেছে। সোহেল ভাইয়ের সাথে পরিচয়ে খুশী যেমন হলাম, তেমনি একটু শংকাবোধ করলাম, লোকটা অন্যকিছু ভাবছে না তো। পরে বিষয়টি উল্লেখ করে দু'জনই খুব হাসলাম। সোহেল ভাই এক বছর ধরে এখানে আছেন। অবিবাহিত। বয়স ৩৫। তাঁর বড় ভাই দেশ থেকে আলু এক্সপোর্ট করেন শ্রীলংকায়। সেই ব্যবসা দেখাশোনা করছেন। থাকেন পেয়িং গেস্ট হিসাবে মসজিদ থেকে বেশ দূরে এক বাসায়। তাবলীগ জামা'আতের সাথে যুক্ত আছেন সক্রিয়ভাবে। শ্রীলংকার আইন-শৃংখলা এবং মুসলিমদের মধ্যে ধর্মের প্রতি সচেতনতা দেখে তিনি ভীষণ মুগ্ধ। তাই বিয়েশাদি করে এদেশেই স্থায়ী থেকে যাওয়ার কথা ভাবছেন। তিনি বললেন, এদেশে মুসলিমরা ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে খুব যত্নবান। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন পেশায় তারা সততা ও কর্মদক্ষতার কারণে জনগণের কাছে ব্যাপক প্রশংসিত। ব্যাপারটা হয়ত কিছুটা মনস্তাত্ত্বিকও। কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিমদের মুকাবিলায় স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার একটা তাকীদ তাদের মধ্যে কাজ করে। দেশটির বিজনেস সেক্টরটি বিশেষতঃ মুসলিমরাই নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের অধিকাংশ বড় বড় শিল্প-কারখানা, আবাসন ও আমদানী-রফতানি ব্যবসায় তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পুরানো বড় বড় বিল্ডিং-এ প্রায়ই দেখা যায় মুসলিম নাম, 'হামীদ বিল্ডিং', 'রহমান বিল্ডিং' প্রভৃতি। যা এ দেশে মুসলিমদের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়।



দুপুরে সোহেল ভাইয়ের সাথে হোটেল ডি ফাইয়াযে কাঁচা কাঁঠালসহ অপরিচিত সব তরকারী আর সামুদ্রিক মাছ খেলাম। ঝালের তীব্রতা কাটানোর চেষ্টা মিষ্টি দই নেয়া হ'ল। কিছুটা রক্ষা পেলাম তাতে, কিন্তু খাবারের স্বাদ পাওয়া গেল না। খাওয়ার পর সোহেল ভাই বললেন, কলম্বোতে আজ থেকে যান, শহরটা ঘুরিয়ে দেখাই আপনাকে। হোটেলে ফিরে দুপুরের পর তাঁর সাথে বের হলাম। প্রথমে গেলাম সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব গ্রাউণ্ড সংলগ্ন ইন্ডিপেনডেন্স স্কয়ারে। ১৯৪৮ সালে বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের স্মরণে মনুমেন্টটি তৈরী করা হয়েছে। যথারীতি হরেকরকম মূর্তিতে সয়লাব মনুমেন্ট। সম্মুখভাবে দণ্ডায়মান বিশাল কালো বর্ণের এক মূর্তি। নীচে লেখা শ্রীলংকার প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং ফাদার অফ ন্যাশন ডন স্টিফেন সেনানায়েকে (১৮৮৩-১৯৫২খৃঃ)। দু'টো হতভাগা কাক এসে হঠাৎ মূর্তিটির মাথার উপরে বসল। একটি উড়ে গেলেও অপরটি বসে রইল দীর্ঘক্ষণ। অগোচরে মল নিষ্ক্রান্তও করল কি-না কে জানে! দৃশ্যটা ক্যামেরাবন্দি করলাম যত্নসহকারে। হায়, নির্বোধ খেচরটাও বোঝে নিস্প্রাণ জড়বস্তুর অক্ষমতা! বিবেকবান মানুষও যদি একটু বুঝত, সম্মানের জায়গা প্রস্তরখণ্ডে নয়, হৃদয়গহীনে!

মনুমেন্ট থেকে বের হয়ে সবুজ ঘাসের সুবিশাল চত্বর অতিক্রম করে সংলগ্ন আর্কেডে ঢুকলাম। প্রাসাদোপম বনেদিয়ানার ছাপ। সবকিছুর দাম আকাশছোঁয়া। কেবল শ্রীলংকান হোয়াইট চা কিনে বিদায় হলাম। তারপর টুকটুক নিয়ে বেইরা লেক হয়ে পৌঁছলাম গল ফেস সী বীচে। বেইরা লেকের পার্শ্বে নির্মাণাধীন কলোম্বো লোটাস টাওয়ারের কেন্দ্রস্থল দেখা হ'ল। ৩৫০ মিটার উঁচু এই টাওয়ারটির অর্ধেক কাজ হয়েছে। সম্পূর্ণ হবার পর এটিই হবে দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ টাওয়ার। ইণ্ডিয়া এমনকি বাংলাদেশ থেকেও না-কি টাওয়ারটি দৃশ্যমান হবে। বিশ্বাস হ'ল না যদিও। গল ফেস সী বীচ সংলগ্ন রোডে শ্রীলংকার সাবেক পার্লামেন্ট ভবন। সেখানে বেশ কয়েকটি পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণাধীন। বীচের সামনে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে শত শত ঘুড়ি উড়াচ্ছে মানুষ। চিংড়ি ও কাঁকড়া ভেজে বিক্রি করছে ভ্রাম্যমান হকাররা। বীচ থেকেই দেখতে পেলাম হোটেল হিলটন ইন্টারন্যাশনাল। ১৯৯৩ সালের ২৬ আগস্ট এশীয় দেশসমূহের প্রথম ইসলামী সম্মেলনে এসে আব্বা এই হোটেলেই উঠেছিলেন। অদ্ভূত ব্যাপার হ'ল আজ ২২ বছর পর কাকতালীয়ভাবে সেই ২৬ আগস্টেই আমি এই হোটেলের সামনে! ঔপন্যাসিক হুমায়ন আহমেদের ভাষায় 'প্রকৃতি না-কি পুনরাবৃত্তি পসন্দ করে'। এ যে দেখছি তেমনই ব্যাপার-স্যাপার! আব্বার সেই সফরের ফটো এ্যালবামে উপনিবেশিক আমলের কালোরঙা এক কামানের ছবি ছিল সমুদ্রতীর ঘেষে। পার্লামেন্ট ভবন অতিক্রম করে একটু সামনে সেই কামানটি হঠাৎ নযরে পড়ল। স্মৃতির পাতায় ফিরে গেলাম মুহূর্তে। শৈশবের

দিনগুলোতে স্বপ্নডানায় পাখা মেলে কত ঔৎসুক্য নিয়ে না ফটো এ্যালবামের এই কামান, এই সমুদ্রতীরের ছবিগুলো দেখতাম! আজ তা চোখের সামনে! এ যেন কতশত দিনের চেনা দৃশ্যপট!



সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে গল ফেস বের হয়ে সিটি বাসে হোটেলে ফিরে আসলাম। কলম্বো শহরের জানযটের চিত্র দেখে ঢাকার কথা মনে পড়ে। ৫/৭ কি. মি. পথ যেতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। আশোক লেল্যাণ্ডের সিটি বাসগুলোই মূলতঃ রাস্তা দখল করে রেখেছে। ফুটওভার বা ফ্লাইওভার ব্রীজ দেখলাম না কোথাও। ফুটপাত ধরে মানুষের চলাচল প্রচুর। মাঝেমাঝেই রাস্তা পারাপারের জন্য জেব্রাক্রসিং। ক্রসিং-এ মানুষের যাতায়াত দেখলে গাড়ি অবশ্যই থামবে এবং পারাপারের সুযোগ দেবে। নারীদের পোশাক-আশাকে পশ্চিমা উগ্রতার ছাপ সুস্পষ্ট। জিন্স এবং টিশার্ট বোধহয় প্রায় জাতীয় পোষাকে পরিণত করেছে তারা। মাঝে মাঝে কালো বোরকা পরিহিতা নারীদের দেখে বোঝা যায় এরা মুসলিম। সোহেল ভাই বললেন, শ্রীলংকার খারাপ দিক হ'ল দেশটি এখন ফ্রী সেক্সের দেশে পরিণত হয়েছে এবং মদ এদের নিত্য সাথী। যত্রতত্র নানা ব্রাণ্ডের মদের দোকান পাওয়া যায়। আর ভাল দিক হ'ল এ দেশটির আইন-শৃংখলা খুব মজবুত। ফলে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-রাহাজানি এসব নেই। যত রাতই হোক না কেন, পথে-ঘাটে মানুষ পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে চলাফেরা করতে পারে। মনে মনে ভাবলাম, অমুসলিম দেশে যতই নিরাপত্তা বা দুনিয়াবী সুযোগ-সুবিধা থাকুন না কেন, ঈমান-আমল নিয়ে বেঁচে থাকা যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার।

ওয়াল্লাওয়াত্তা ফিরে মাগরিব ছালাত পর মসজিদের সেক্রেটারীর সাথে আলাপ হ'ল। বড় ব্যবসায়ী মানুষ। তাবলীগ জামা'আতের অন্তঃপ্রাণ কর্মী। উর্দূও যথেষ্ট ভাল জানেন। আমি হোটেলে আছি শুনে তিনি ফোন করলেন আসলাম নামক এক তাবলীগী ভাইকে। তাঁর হোটেল ব্যবসা আছে। খানিকবাদে তিনি মসজিদে পৌঁছলে সেক্রেটারী ছাহেব তাঁর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি এই ভাইয়ের এপার্টমেন্টে থাকবেন, বাইরে থাকার দরকার নেই। তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম। 'এডামস পিক' যাওয়ার পরিকল্পনা শুনে তিনি বললেন, এখন তো অফ সিজন। মানুষজনের যাতায়াত নেই। যেহেতু যাত্রা শুরু করার নিয়ম রাত ২টায়, তাই জঙ্গলের রাস্তায় প্রচুর সাপ, পোকামাকড়ের সম্মুখীন হ'তে হবে। বর্ষাকালে রাস্তাও খুব পিচ্ছিল। সুতরাং এখন যাওয়াটা খুব বিপদজনক। সোহেল ভাইও তাঁর সাথে যোগ দিয়ে সাধ্যমত নিরুৎসাহিত করলেন। তাঁদের কথায় আশাহত হলাম, কিন্তু হাল ছাড়লাম না। মনে মনে হিসাব কষলাম ক্যান্ডি পর্যন্ত পৌঁছি, তারপর একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে ইনশাআল্লাহ। সোহেল ভাই আমার সাথে যেতে চেয়েছিলেন ক্যান্ডি। তবে শেষ পর্যন্ত কী কাজে আটকে গেলেন। আমিও জোর করলাম না। এমন বাউণ্ডুলে সফরে সবাইকে নেয়া চলে না। রাতে ওয়াল্লাওয়াত্তাতে আসলাম ভাইয়ের 'লক্ষীকোর্ট' এপার্টমেন্টে থাকলাম। ৩ রুমের বিলাসবহুল বাসা। সাধারণতঃ আরব পর্যটকরাই তাঁর কাস্টমার। তবে আজ ফাঁকা ছিল বলে আমার জন্য ব্যবস্থা করলেন এখানে।

রাত কাটিয়ে ফজর ছালাত পড়তে গিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। মসজিদের সামনে গাড়ির বহর। ফজর ছালাত পড়তে এসেছেন মুছল্লীরা গাড়িতে, বাচ্চাদের নিয়ে। মসজিদে ঢুকে দেখলাম অন্য ওয়াক্তের চেয়ে ফজরের ছালাতেই উপস্থিতি বেশী। ছালাত শেষ হওয়ার পর সোহেল ভাইয়ের সাথে দেখা। বললেন, শুধু এখানেই নয়, কলোম্বোর সব মসজিদেই এই দৃশ্য দেখতে পাবেন। মসজিদের সাথে এদের সম্পর্ক খুব দৃঢ়। যারা ছালাত পড়তে এসেছেন তারা শহরের বড় বড় ব্যবসায়ী কিংবা পেশাজীবী। ব্যস্ততার কারণে অন্য ছালাতে আসতে না পারলেও ফজর এবং এশায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন এবং সন্তানদেরকেও নিয়ে আসেন। সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে মুসলিমরা এখানে যেমন ধর্মপরায়ণ, তেমনি একতাবদ্ধ। মসজিদকে কেন্দ্র করেই তাদের সব কার্যক্রম চলে। প্রতিটি মসজিদের আশেপাশে রয়েছে হালাল রেস্টুরেন্ট। এভাবে মসজিদভিত্তিক একটা সুন্দর সমাজ রয়েছে প্রত্যেক এলাকাতেই। আরও একটি ব্যাপার হল ভোরের আলো না ফুটতেই রাস্তা-ঘাট সচল হয়ে উঠেছে। সিটি বাসগুলো যাত্রীতে ঠাসা। কাজে বের হচ্ছে মানুষ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। *(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)*

লেখক : আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
এম.এস (হাদীছ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ
পাকিস্তান।

প্রগতির নামে আধুনিকতা নাকি অশ্লীলতা?

-লিলবর আল-বারাদী

ভূমিকা :

ইসলাম হ'ল মহান আল্লাহ মনোনীত ধর্ম এবং সার্বিক সুস্থতা ও সমাধানের একমাত্র নির্ভুল ও স্বচ্ছ পথ প্রদর্শক। সুস্থ উপায়ে বাঁচার গ্যারান্টিসহ সার্বিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা একমাত্র কল্যাণকর জীবন বিধান ইসলামেই রয়েছে । কারণ ইসলাম তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মানব জাতির কল্যাণার্থে প্রেরিত হয়েছে। সেখানে যত প্রকার আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা যেমন মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর, ঠিক তেমনি তা সাফল্যের যুগান্তকারী চিরস্থায়ী দৃষ্টান্তও বটে। অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ অনুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ইসলামের এই পরিপূর্ণ সাফল্যের কারণেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে মানব জীবনের পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে পরিগণিত করা হয়। অথচ তথাকথিত প্রতির নামে সকল পাপাচার, অন্যায়, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনাকে বৈধ মনে করা হচ্ছে। আর লজ্জশীলতা, শালীনতা ও ভদ্রতাকে আধুনিক জাহেলিয়াতের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। নিম্নে 'প্রগতির নামে আধুনিকতা না-কি অশ্লীলতা' শিরোনামে প্রগতি, আধুনিকতা ও অশ্লীলতার বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ইসলাম বনাম প্রগতি :

ইসলাম মানেই শান্তি। অর্থাৎ এর আইন-কানূন, আদেশ,-নিষেধ, অনুসরণ ও অনুকরণ মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় সহ সর্বক্ষেত্রে সমাধান, শান্তি এবং শৃংখলা বয়ে আনে, যা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণসহ একটি পরীক্ষিত সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ সমগ্র পৃথিবী আজ আবারও জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানব সমাজ আজ বিশৃংখলতায় নিপতিত হয়ে অনিবার্য ধ্বংসের সম্মুখীন।

যারা পথভ্রষ্ট, ইসলাম ধর্ম থেকে বহির্ভূত ও প্রগতির নামে প্রহসনের কর্ণধার তাদের চিন্তা-ধারায় প্রতিপালিত ও প্রচারিত, তারা সর্বদা প্রচার করছে 'আধুনিক সভ্যতা থেকে মুসলিমরা পিছ পা ও সেকেলের'। মূলতঃ তারা ইসলামের প্রতি ধারণা করে থাকে। তারা এ সমস্ত নিকৃষ্ট কথা ও কাজ দ্বারা ইসলামের রূপকে বিকৃত করে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মস্তিষ্ক ধোলাই করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তেমনি অশ্লীলতা মানব মস্তিষ্ককে বিকৃত করে উন্মাদ বানিয়ে নির্লজ্জ ও নিষ্প্রভ করে চলেছে।

শয়তানের প্রথম হামলা লজ্জা :

মানব প্রকৃতির মধ্যে লজ্জা প্রবণতা জন্মগত এক অতিব স্বাভাবিক প্রবণতা। লজ্জাশীলতা মানুষকে তার তাক্বওয়া বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং শালীনতা বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা মানুষকে আল্লাহভীতি থেকে বিরত রাখে ও অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করে। ফলে মানুষ পশুর পর্যায়ে চলে যায়। শালীনতা ও অশালীনতার মধ্যে পার্থক্য ভুলে যায়। বিবেক নামের স্বচ্ছ যন্ত্রটি অকেজো হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। এছাড়াও মানব শরীরের যে সকল অংশ নারী-পুরুষের জন্য যৌন আকর্ষণ আছে, তা প্রকাশ্যে লজ্জাবোধের সাথে আচ্ছাদিত রাখার প্রচেষ্টা করা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বভাব। যদি কেউ তা না করে নির্লজ্জ বেহায়ার মত নিজের কুরুচি প্রকাশ করে, তাই অশ্লীলতা। যা ইসলামী শরী'আতে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত। অবশ্য শয়তানের ইচ্ছা, যেন মানুষ লজ্জাকে পিছনে ফেলে নিজের নির্লজ্জতা প্রকাশ করে। শয়তান মানুষকে এ ব্যাপারে সর্বদা প্ররোচিত করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا 'অতঃপর শয়তান আদম ও তার স্ত্রীকে প্ররোচিত করল, যেন তাদের যে অংশ আচ্ছাদিত ছিল তা তারা উন্মুক্ত করে' *(আ'রাফ ৭/২০)*।

প্রগতির স্রোতে ভাসমান নারী সমাজ :

বর্তমান বিশ্বে নারীরা পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তথাকথিত সুশিক্ষিত, সুসভ্য জাতি (?) ও প্রগতির ধ্বজাধারীরা অশ্লীলতা বিস্ফোরণে মূল উপাদান নারীদেরকে মূল হাতিয়ারে পরিণত করেছে। তাদের ব্যাপারে ইসলামের প্রদত্ত মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে শুধু ভোগের সামগ্রী হিসাবে বিশ্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিঘ্নিত হচ্ছে নারী জাতির নিরাপত্তা। প্রকটভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে নারী স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা।

নারীদেরকে সিনেমা, টেলিভিশন, থিয়েটার, বিজ্ঞাপন, পত্র-পত্রিকায় নগ্ন, অর্ধনগ্ন অবস্থায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। নায়ক নায়িকাদের যৌন আবেদন মূলক অশ্লীল ও অশোভন অভিনয়, নাচ-গান, বেহায়াপনা, স্পর্শকাতর গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দেহ প্রদর্শন করছে। ফলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কুৎসিত চিন্তা-চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যমে কামোদ্দীপনা সৃষ্টি করে যুবসামজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নারী জাতির এ বেহাল অবস্থা দর্শন করে সর্বস্তরের জনসাধারণ হারিয়ে ফেলেছে নারীদেরকে মা-বোনদের মত সম্মান করার মানসিকতা, কলুষতায় ভরে গেছে তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা। বর্তমানে নারীদের নগ্ন শরীর ও অশ্লীলতাকে কিভাবে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করা যায় তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রীতা টেম্পিলটন নামে জৈনক মহিলা চার সন্তানের জননী, যিনি পেশায় একজন লেখিকা। তিনি তার সন্তানদের নারী শরীর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে তাদের সম্মুখে নগ্ন হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, নারী শরীরকে পণ্য করে তোলার প্রতিবাদে রীতার এই অভিনব ভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছে বহু প্রগতিশীল মানুষ।

হায়রে সমাজ ব্যবস্থা! ভাবতে আবাক লাগে, যারা নারী জাতির সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তারাই আবার নারী মুক্তি আন্দোলনের জন্য সভা-সমিতি করে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তুলছে নানা রকম ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বক্তব্য দিয়ে। নারীর আর কি মুক্তি চায় তারা? তারা তো তাদের নারীদেরকে মুক্ত ভাবে ছেড়ে দিয়ে সর্বনাশের শেষ সীমায় নিমজ্জিত করেছে।

Contents

নারী অধিকারের নামে ধৃষ্টতা :

পাশ্চাত্য সমাজে সাম্যের দিক বিবেচনা করে যে, নারী ও পুরুষ নৈতিক মর্যাদা এবং মানবীয় অধিকারের দিক দিয়ে শুধু সমান নয়, বরং পুরুষ যে কাজ করে নারীও তাই করবে। সাম্যের ভ্রান্ত ধারণার ফলে নারীরা অফিস, আদালত, কল-কারখানার চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। অথচ তাদের দাম্পত্য জীবনের গুরুদায়িত্ব, সন্তান প্রতিপালন ও গৃহের সু-ব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় করণীয় বিষয়গুলো নারীর কর্মসূচী হ'তে বাদ পড়েছে। তাদের প্রকৃতিগত কাজকর্মের প্রতি ঘৃণা জন্মে গেছে। সংসার জীবনের সুখ-শান্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ শুরু হয়েছে। অশান্তিতে ভড়ে গেছে সুখ ও শান্তির নীড়।

প্রশ্ন হ'ল, কেনই বা হবে না এমনটি? যে নারী নিজে উপার্জন করে যাবতীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম, সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, সে শুধু যৌন সম্ভোগের জন্য পুরুষের অধীন থাকবে কেন? এর ফলে পারিবারিক শান্তি না থাকায় তাদের জীবন তিক্ত হ'তে তিক্ততর হচ্ছে এবং একটি চিরন্তন দুর্ভাবনা তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি দিতে পারছে না। এটাই ইহলৌকিক জাহান্নাম, যা লোকেরা তাদের নির্বুদ্ধিতা ও লোভ-লালসার উন্মাদনায় ক্রয় করে নেয়।

বিশ্লেষণ :

সামাজিক নির্দেশের মধ্যে ইসলামের প্রথম কাজ নগ্নতার মূলোচ্ছেদ করা এবং নারী-পুরুষের জন্য সতরের সীমারেখা নির্ধারণ করা। এ ব্যাপারে আরব জাহিলিয়াতের যে অবস্থা ছিল বর্তমান জাতিগুলোর অবস্থা প্রায় অনুরূপ। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। বর্বর যুগে একে অপরের সম্মুখে বিনা দ্বিধায় উলঙ্গ হত, গোসল ও মল ত্যাগের সময় পর্দা করা তারা নিস্প্রয়োজন মনে করত। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করত এবং একে তারা উৎকৃষ্ট ইবাদত মনে করত। নারীরাও তাওয়াফের সময় উলঙ্গ হয়ে যেত। তাদের স্ত্রীলোকদের পোশাক এমন হত যে, বুকের কিছু অংশ, বাহু, কোমর এবং হাটুর নীচের কিছু অংশ অনাবৃত থাকত। এ অবস্থা ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানে দেখা যায়। অথচ শরীরের কোন্ অংশ অনাবৃত ও কোন্ অংশ আবৃত থাকবে তা নির্ধারণকারী সমাজ ব্যবস্থা পাশ্চাত্য দেশ সমূহে নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى 'হে মানব সন্তান! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শরীর আবৃত করার জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছেন এবং ইহা তোমাদের শোভাবর্ধক' *(আ'রাফ ৭/২৬)*।

নারী পর্দা করে সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকবে এমনটি নয়। বরং শালীনতা বজায় রেখে নারীরা বাড়ীর বাইরেও চলাফেরা করবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ 'হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুসলিম নারীগণকে বলে দিন, তারা যেন আপন চাদর দ্বারা নিজের ঘোমটা টেনে দেয়। এ ব্যবস্থার দ্বারা আশা করা যায় যে, তাদেরকে চিনতে পারা যাবে, অতঃপর তাদেরকে বিরক্ত করা হবে না' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*।

সুধী পাঠক! আল্লাহ তা'আলা শরী'আতের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে মানুষের কার্যাবলী একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে পরিচালিত হয়। আর এর মাধ্যমে সামাজের শালীনতা বজায় থাকে।

পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা তথা ইসলামী জীবন বিধান ও চিন্তা-চেতনা থেকে মানুষ বহু দূরে সরে যাওয়ার কারণেই মানব সভ্যতার আজ এ অধঃপতন। তাই বিশ্ব মানবতা আজ পদে পদে লাঞ্ছিত, অপমানিত, পদদলিত । বৈজ্ঞানিক উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি পাশ্চাত্য তথা উন্নত বিশ্বকে ঐশ্বর্য দান করেছে, প্রচুর বিত্তশালী করেছে; কিন্তু ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য সুখ সামগ্রী তাদেরকে শারীরিক এবং মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই আজ বড়ই প্রয়োজন কুরআনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীকে বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ উজ্জ্বল আলোকে বিশ্লেষণ করে নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়ন করা।

অশ্লীলতা ও ইসলাম :

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। যিনা ও অশ্লীলতার পরিণাম সম্পর্কেও অত্যন্ত ভয়াবহ বিধান জারি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমরা যিনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ কাজ এবং খুবই খারাপ পথ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩২)*।

প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে কোনভাবেই এই অশ্লীলতার নিকটে গমন করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে, উহার নিকটবর্তী হবে না, তা প্রকাশ্যেই হোক অথবা অপ্রকাশ্যে হোক' *(আন'আম ৬/১৫১)*।

নীরব ঘাতক যেনার ব্যপকতা লাভ :

যেনা মানব সমাজে বল্গাহীনভাবে প্রসার লাভ করে চলেছে। ইংল্যান্ডে প্রতি ১০০ জন নারীর মধ্যে ৮৬ জন নারী বিয়ে ছাড়াই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। অবৈধ সন্তান জন্মের সময় এদের শতকরা ৪০ জন নারীর বয়স ১৮-১৯ বছর, ৩০ জন নারীর বয়স ২০ বছর এবং ২০ জন নারীর বয়স ২১ বছর।[২০৫] সেখানে প্রতি তিনজন নারীর একজন বিয়ের পূর্বে সতীত্ব সম্পদ হারিয়ে বসে। ডাঃ চেসার তার রচিত 'সতীত্ব কি অতীতের স্মৃতি?' গ্রন্থে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন'।[২০৬] Indian Council for Medical Research-এর ডিরেক্টর জেনারেল অবতার সিংহ পেইন্টাল বলেন, We used to think our women were chaste, But people would be horrified at the level of promise culty here. 'অর্থাৎ আমাদের নারীদেরকে আমরা সতী বলে মনে করতাম। কিন্তু অবৈধ যৌনকর্ম এখানে এতবেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, লোকে এতে ভীত না হয়ে পারে না।[২০৭]

---

২০৫. Sehwarz Oswald, The Psycology of Sex (London : 1951), P. 50.

২০৬. Cheser Is Chastity Outmoded, (Londen : 1960), P. 75.

২০৭. হাফেয মাসঊদ আহমদ; মাসিক আত-তাহরীক, বিশ্বে বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারী : একটি সমীক্ষা, (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারী ২০০৩), পৃঃ ৪।

আমেরিকার বিদ্যালয় সমূহে অশ্লীল সাহিত্যের চাহিদা সর্বাপেক্ষা বেশী। যুবক-যুবতীরা এসব অধ্যয়ন করে অশালীন কাজে লিপ্ত হয়। এছাড়া হাইস্কুলের শতকরা ৪৫ জন ছাত্রী স্কুল ত্যাগ করার পূর্বে চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আর এদের যৌন তৃষ্ণা অনেক বেশী।[২০৮] বৃটেনেও শতকরা ৮৬ জন যুবতী বিয়ের সময় কুমারী থাকে না।[২০৯]

পাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে তাদের শিক্ষা খাতে ব্যয়ের প্রায় অধিকাংশ খণ্ডকালীন যৌনকর্মী হিসাবে অর্জন করে থাকে। মঙ্গোলয়েড দেশসমূহে যৌন সম্পর্কীয় বিধি-বিধান অত্যন্ত শিথিল। অন্যদিকে থাইল্যান্ডের ছাত্রীদের বিপুল যৌনতা লক্ষ্য করা যায়।[২১০] চীনের ক্যান্টন শহরে কুমারীদের প্রেম বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি বিদ্যালয় খোলা হয়েছে।[২১১] পশ্চিমা সভ্যতার পূজারীরা সার্বজনীন অবৈধ যৌন সম্পর্কে মহামারীর পথ প্রশস্ত করেছে।[২১২] চীনে যৌন স্বাধীনতার দাবী সম্বলিত পোষ্টারে যার সাথে খুশী যৌন মিলনে কুণ্ঠিত না হবার আহ্বান জানানো হয়।[২১৩] ইউরোপে যৌন স্বাধীনতার দাবীতে পুরুষের মত নারীরাও নৈতিকতা হারিয়ে উচ্ছৃংখল ও অনাচারী এবং সুযোগ পেলেই হন্যে হয়ে তৃপ্ত করত যৌনক্ষুধা। অশুভ এই প্রবণতার ফলে বৈবাহিক জীবন ও পরিবারের প্রতি চরম অনিহা সৃষ্টি হয়।[২১৪] অর্থ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে আমেরিকার ৭৫ লাখ নারী-পুরুষ বিবাহ ব্যতীত 'লিভ টুগেদার'-এর সাথে জড়িত।[২১৫] পুরান ঢাকায় বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রী খুন হওয়ার পর জানা যায়, নিহত ওই শিক্ষার্থী এক বয়ফ্রেন্ডের সাথে বাসা ভাড়া নিয়ে লিভটুগেদার করতেন। অথচ নিহত ছাত্রীর মা-বাবা জানতেন তিনি কলেজের হোস্টেলে থাকেন।[২১৬]

পাশ্চাত্যে ক্রমবর্ধমান অবৈধ যৌন স্বাধীনতাই সবচাইতে ক্ষতি সাধন করেছে। নারীর দেহকে বাণিজ্যিক রূপ দেয়ার কোন প্রচেষ্টাই বাকী রাখা হয়নি। অবিবাহিত মহিলাদের গর্ভধারণের সংখ্যা বৃদ্ধি, অবৈধ সন্তান জন্ম, গর্ভপাত, তালাক্ব, যৌন অপরাধ ও যৌন ব্যাধিই এর বাস্তব প্রমাণ। অপর দিকে অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে কোন আইন-বিচার ও আইনী শাস্তির বিধান নেই। বরং এটাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বিবেচনা করা হয়।[২১৭] সম্প্রতি ভারতেও অবৈধ যৌন সম্প্রীতি ও হিন্দু-মুসলিম যুবক-যুবতীর নির্বিঘ্নে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার হিড়িক পড়ে গেছে।

সুধী পাঠক! এরকম বেহায়া লজ্জাষ্কর পরিবেশ অনৈতিক ও অনাচার সম্পর্কে অভিভাবকরা কয়েক বছর আগে চিন্তা করতে পারতেন না। বর্তমানে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সংস্কৃতি যেভাবে দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে তাতে উদ্বিগ্ন সুশীল সমাজ।

প্রগতির প্রচারে প্রযুক্তির ব্যবহার :

প্রযুক্তির প্রসার ও সামাজিক যোগাযোগসহ বিভিন্ন মাধ্যমের কারণে তরুণ সমাজে খুব দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড ও দোস্ত কালচার, এমনকি তা গড়িয়ে যাচ্ছে পরোকিয়ায়। পর্ণোগ্রাফির বিস্তার ও সংস্পর্শে আসার কারণে লজ্জা এবং নৈতিকতার বাঁধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বিপরীতে ছড়িয়ে পড়ছে লজ্জাহীনতা, খোলামেলা ও অবাধ মেলামেশার পরিবেশ। একসময় মা-বাবার উদ্বেগ ছিল ছেলেমেয়েদের মোবাইলে কথা বলা এবং এসএমএস বিনিময়ে সময় ব্যয় করা নিয়ে। কিন্তু এখন ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, স্কাইপ, ট্যাংগো, উইচ্যাট, হটসআপ ইত্যাদি ওয়েবক্যামের কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরী এবং কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি অবারিত হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ, বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড, দোস্ত কালচারের বিস্তৃতি, পর্ণো আগ্রাসন, অবাধ মেলামেশার ফলে তরুণ সমাজ জড়িয়ে পড়ছে প্রেম-ধর্ষণ-পরকীয়ার মতো অনেক অচিন্তিয় দুর্ঘটনায়। কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ছেন ত্রিমুখী, চতুর্মুখী সম্পর্কের জালে। এ নিয়ে বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও ঘটছে সজ্ঞাত ও হানাহানির ঘটনা। এসবের রেশ ধরে ঘটছে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা। ঘটছে আত্মহত্যা ও খুনের মতো চাঞ্চল্যকর ঘটনা। অনাকাঙ্খিত এসব ঘটনার খবরে প্রায়ই বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছে গোটা দেশবাসী। বর্তমানে হাতের মোবাইল ইন্টারনেটে অশ্লীল ভিডিও প্রসার লাভ করেছে। চোখের পলক ফেলতে যত দেরী তার চেয়েও দ্রুত পেয়ে যাচ্ছে তাদের কাংখিত পর্ণোগ্রাফি। ইউটিউব, ইউপর্ণ ও লাইফপেজের 'বাংলা চটি' নামে নানারকম নোংরা ও মিথ্যা গল্প-কাহিনী প্রকাশ করে ব্লগাররা। এই সব মিথ্যা গল্প-কাহিনী পড়ে পুরুষ-মহিলা জড়িয়ে যাচ্ছে নানা প্রকার অনৈতিক প্রেমালাপে। ফলে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে দেশের মানবসম্পদ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নোংরা ও অশ্লীলতা :

মস্তিষ্ক হ'ল মানব দেহের প্রদান কার্যালয়। এখান থেকে সারা শরীরের যাতবীয় চাহিদা মোতাবেক সংবেদনশীল সকল প্রকার নির্দেশ গৃহীত হয়। আর স্নায়ুবিজ্ঞান (Neuroscience) এখন স্বীকার করে যে, মানুষের মস্তিষ্ক অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যদিয়ে মস্তিষ্কে পরিবর্তন ঘটে এবং আমরা যা দেখি, শুনি বা জানি, তার সবকিছুর সাথেই মস্তিষ্কের সংযোগ গড়ে ওঠে। আপাতদৃষ্টিতে অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হ'লে মস্তিষ্কের তাৎক্ষণিক সংযোগ গড়ে ওঠে। অনুরূপভাবে অশ্লীল গান শোনা, টেলিভিশন, পর্ণোগ্রাফীর মত নোংরা ছবি দর্শন একটি নীরব প্রতিচ্ছায়া অথচ ভীষণ ভয়ঙ্কর সমস্যা, যা সারা বিশ্বে মহামারী আকার ধারণ করেছে। এতে নারী-পুরুষ ও যুবসমাজ নিরবে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যার ক্ষতি অপূরণীয়।

মানুষের শেখা ও মনে রাখার ভিত্তি হ'ল সিন্যাপটিক প্লাসটিসিটি (Synaptic Plasticity), যা মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতায় সাড়া দিতে মস্তিষ্ক তার নিউরন কোষ

২০৮. George Lindsey, Revolt of Modern Youth P-82-83.
২০৯. দৈনিক ইনকিলাব, ৬ই জুন ১৯৯৮ ইং।
২১০. মাসিক পৃথিবী (প্রশ্চাত্যে যৌন বিকৃতি, জুলাই ২০০১ইং, পৃঃ ৫২-৫৩।
২১১. জহুরী, খবরের খবর, ১ খন্ড, ১১৬ পৃঃ।
২১২. মরিয়ম জামিলা, ইসলাম ও আধুনিকতা, ৯৯ পৃঃ।
২১৩. খবরের খবর, ১ খন্ড, ১১৬ পৃঃ।
২১৪. সায়্যেদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, ৯৮ পৃঃ।
২১৫. দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৬ এপ্রিল ২০১১, পৃঃ ৫।
২১৬. দৈনিক নয়া দিগন্ত, এপ্রিল ২০১৪।
২১৭. ইসলাম ও আধুনিকত, পৃঃ ২৩।

Contents

সমূহের মধ্যকার সংযোগগুলোর শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোন ধরণের স্নায়ুবিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবং সেইসাথে কি পরিমাণ নিউরোট্রান্সমিটারের (Neurotransmitter –আনবিক গঠন সম্পন্ন স্নায়ুবিক সংবাহক) নির্গমন ঘটবে, তা নিয়ন্ত্রণ করাও এই ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। মস্তিষ্কের একটি অত্যাবশ্যক নিউরোট্রান্সমিটার হ'ল ডোপামিন (Dopamine)। এর ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি সচেতন অঙ্গসঞ্চালন, অনুপ্রেরণা দান, আনন্দ অনুভব, প্রতিদান, শাস্তি দেওয়া ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। শিশুদের এডিএইচডি (ADHD –Attention Deficit-Hyperactivity Disorder), বার্ধক্যজনিত স্মৃতিশক্তি হ্রাস (Cognitive Decline) এবং বিষন্নতার (Depression) ক্ষেত্রেও ডোপামিনের সংশ্লিষ্টতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোকেইনের মত ড্রাগগুলোর কার্যকারিতা ডোপামিনারজিক সিস্টেম (Dopaminergic System) কেন্দ্রিক। আর এই ড্রাগগুলোর কার্যকারিতার ফলে প্রচুর পরিমাণে ডোপামিনের নিঃসরণ ঘটে। ফলে শরীরে উচ্চমাত্রার শক্তি সঞ্চিত ও আনন্দ অনুভূতি সৃষ্টি হয়, যা ক্রমেই আসক্তিতে পরিণত হয়। একাধিক গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, ডোপামিন আনন্দের আবহ তৈরি করে প্রত্যক্ষ আনন্দ দানে ভূমিকা রাখে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে, চরম আনন্দ লাভের মুহূর্তে, কিংবা আনন্দ লাভের পরে, ডোপামিনের নিঃসরণ ঘটে। এই নিঃসরণের সময়, ডোপামিন শারীরিক ক্রিয়ার সাথে মস্তিষ্কের নতুন সংযোগগুলোকে আরও বেশি শক্তিশালী (Strengthen) ও দৃঢ় (Reinforce) করে এবং ব্যক্তিকে আবার ঐ আনন্দ লাভের জন্য একই কাজ করতে উৎসাহ যোগাতে থাকে। অনুরূপভাবে অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফীর সাথে এর সম্পর্কটা হ'ল পর্দায় যখন অশ্লীল যৌন ক্রিয়াকলাপের দৃশ্য দেখে তখন যৌন উত্তেজনা তৈরি হয়, যা ডোপামিনারজিক সিস্টেম (Dopaminergic System)-কে সক্রিয় করে তোলে। যার ফলে পর্দায় দেখা দৃশ্যগুলো ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিপটে না-গিয়ে ডোপামিনের দৃঢ়করণ (Reinforcement) প্রক্রিয়ার কারণে স্থায়ী স্মৃতিপটে প্রবেশ করে। এখানে দৃশ্যগুলো দর্শকের মনে রিপ্লেই মোডে (Replay mode) স্থায়ীত্ব লাভ করে।

অশ্লীল পর্ণোগ্রাফী হ'ল অলীক কল্পনা (Fantasy)। প্রতিটি নতুন নতুন দৃশ্যে পর্দা থেকে অবাস্তব কল্পনার পাশাপাশি এক ধরনের তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ (Electromagnetic wave) বিচ্ছুরিত হয়, যা মস্তিষ্কে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। ফলে ডোপামিনের নিঃসরণ ঘটে। মস্তিষ্কে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহ খুবই যৌগিক ও সরল। ফলে অশ্লীলতায় আসক্তির জন্ম হয় এবং ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। যার ফলে পুরুষ/স্ত্রী তার স্বামী/স্ত্রী'র সাথে ঐসব দৃশ্যের পুনর্মঞ্চায়ন করতে চায়, যার অনিবার্য পরিণাম হতাশা। অবাস্তব কল্পনা নির্ভর প্রত্যাশার কারণে বাস্তবে যখন হতাশার সৃষ্টি হবে, মস্তিষ্ক তখন ডোপামিনের নিঃসরণ শুধু বন্ধই করবে না; বাস্তবিক অর্থে এই নিঃসরণ স্তর তখন সর্বনিম্ন স্তরেরও নীচে নেমে গিয়ে বিষন্নতার স্তরে গিয়ে পৌঁছবে। ফলে দাম্পত্য জীবনে হতাশা, অতৃপ্তি এবং অশান্তির জন্ম হবে।

চাঞ্চল্যকর তথ্য হ'ল, মস্তিষ্ক একটি সামগ্রিক সত্তার মত কাজ করে; এর কার্যকারিতার পরিধি হ'ল সর্বব্যাপী। ফলে মস্তিষ্কের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিবর্তন হ'লে অন্যান্য অংশও প্রভাবিত হয়। অশ্লীল দৃশ্য দেখার মাধ্যমে আক্ষরিক অর্থেই পুরো মস্তিষ্কের সকল স্নায়ুবিক সংযোগগুলোর পুনর্বিন্যাস ঘটে। ফলে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ এবং তাদের কর্মদক্ষতার উপর প্রভাব পড়ে। স্নায়ুবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অশ্লীলপর্ণোগ্রাফীতে আসক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বেশ পীড়াদায়ক চিত্র উঠে এসেছে। স্নায়ুবিজ্ঞানের মতে, অশ্লীল পর্ণোগ্রাফীতে আসক্ত ব্যক্তিদের মেধাশক্তি হ্রাস পায়, স্মরণ শক্তি লোপ পায়, ভালো-মন্দ যাচাই-বাছাই ও হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, কুরুচিপূর্ণ ইসলাম ও সমাজ বিরোধী কর্মে লিপ্ত হয় ইত্যাদি।[২১৮] অথচ ১৯৯৯ সালে নিউরো সায়েন্টিস্টের অবাক করা তথ্য আমাদের মস্তিষ্কের সামনের অংশে বহুল গবেষণা করে তিনি বলেন, 'প্রত্যেকের মস্তিষ্কের সামনের একটি ছোট অংশ রয়েছে, যা সৃষ্টিকর্তাকে (আল্লাহ) নিয়ে চিন্তা করার সময় সচল (Active) হয়, অন্য সময় তা নিষ্ক্রিয় (Inctive) থাকে'।

পরিশেষে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোনপ্রকার চ্যালেঞ্জ চলে না। আমরা যতই কূটকৌশল করে হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম বানানোর পথকে সুগম করি না কেন, আল্লাহ হলেন সর্বোত্তম সুকৌশলী। অতএব ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাগিয়ে অবাধ যৌনাচার থেকে বিরত রাখার মধ্যেই রয়েছে প্রতিবিধান। যুবসমাজকে চরিত্রের উত্তম গুণাবলী দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে অশ্লীলতার প্রতিরোধ গড়ে তোলতে হবে। অশ্লীলতা মানুষকে ইহকালীন শান্তি ও পরোকালীন মুক্তি দিতে পারে না। সমাজকে সোচ্চার হ'তে হবে। সকলের মাঝে আল্লাহভীতি ও স্ব স্ব মূল্যবোধের ধারনা দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নচেৎ তারা ও আমরা অচিরেই লুত্ব (আঃ)-এর জাতির মত ধ্বংস হয়ে যাব। সকলের উচিত যে, নিজ নিজ পরিবারের সকল প্রকার অশ্লীলতা রোধে ইসলামী অনুশাসনের প্রাচীর গড়ে তোলা। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন-আমীন।

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

২১৮. সূত্র: almahmudent.blogspot.com, প্রবন্ধ : পর্ণোগ্রাফী মস্তিষ্ক বদলে দেয়।

আদর্শিক চেতনা ফিরে পেলাম

আমি মুহাম্মাদ নাজমুল হক্ব, পিতা- আব্দুস সালাম। ১৯৮৯ সালের ৩১শে অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ যেলার রূপগঞ্জ থানাধিন সুলপিনা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। বর্তমানে যেটি পূর্বাচল উপশহরের ৮ নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের এলাকাটি মূলতঃ আহলেহাদীছ অধ্যুষিত। ফলে ছোটবেলা থেকেই শিরক-বিদ'আতের ঘোর বিরোধী ছিলাম। তাছাড়া আহলেহাদীছ ইমামগণ মসজিদগুলোতে শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে খুৎবার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে থাকেন।

সত্য অনুসন্ধানের অভিপ্রায় :

আমার গ্রাম্য চাচা মীযানুর রহমান দীর্ঘদিন যাবত সঊদী আরব থাকতেন। তিনি ২০০৩ সালে দেশে ফিরে এসে ইলিয়াছি তাবলীগ তথা তাবলীগী জামায়াতের কাজ শুরু করেন। আমরা এলাকার কিছু মানুষ তার সঙ্গী হয়ে প্রায় ৪ বছর কাজ করেছিলাম। যখন তিন দিনের জন্য তাবলীগে বের হতাম, সাথে নিয়ে যেতাম 'ফাযায়েলে আমল' নামক কিতাবটি। কারণ আমরা যাদের সাথে তাবলীগে বের হতাম তারা ছিল হানাফী। হঠাৎ একদিন আমাদের এলাকার একজন আলেম এই কিতাবটিকে 'গাজাখোরি কিতাব' বলে আখ্যায়িত করে। কারণ কিতাবটিতে জাল-যইফ ও কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে ভরপুর। অতঃপর আমি তাদের নিকট প্রস্তাব দেই যে, দাওয়াতী কাজে আমরা ছহীহ বুখারী বা ছহীহ মুসলিমের হাদীছ উপস্থাপন করব। কিন্তু তারা শুনিনি। অবশেষে আমি নিজেই ছহীহ বুখারী নিয়ে তাদের সঙ্গে তাবলীগে বের হতাম। আর তারা ফাযায়েলে আমল নিয়ে যেত। আমি আমার দলের অন্য সদস্যকে ছালাতে জোড়ে আমীন বলা, রাফঊল ইয়াদাইন করা, কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা রেখে ছালাত আদায় করার জন্য বলতাম। যে হাদীছগুলো আমি ছহীহ বুখারীতে পেয়েছিলাম। আমাদের মসজিদে জুম'আর খুৎবার মাধ্যমে আমি জেনেছিলাম যে, বুখারী ও মুসলিমে কোন যইফ ও জাল হাদীছ নেই, সবই ছহীহ হাদীছ। আর এটাই সঠিক।

তাবলীগে আমাদের ৬ নম্বর শিখানো হত। যথা- কালিমা, ছালাত, ইকরামে মুসলিমীন, ছহীহ নিয়ত, দাওয়াত ও তাবলীগ। ছালাতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলা হত রাসূল (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করেছেন, ছাহাবীদেরকে তিনি যেভাবে ছালাত শিক্ষা দিয়েছেন সেই ছালাত আমাদের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম যে, যারা আমাদের ছালাতের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তারাই রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় করেন না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তাদের মধ্যে 'তাক্বলীদে শাখছি' প্রকট আকারে প্রবল। তারা অন্যদের কুরআন ও হাদীছ মানার জন্য দাওয়াত দিচ্ছে। অথচ নিজেরা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আমল করে না। ফলে শুরু হ'ল সত্য অনুসন্ধান।

আর্দশিক চেতনার অভিপ্রায় :

২০০৭ সালে বন্ধু মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম ভাইয়ের মাধ্যমে আমি সর্বপ্রথম 'আত-তাহারীক' পত্রিকা পাই। ঘুরে গেল জীবনের চাকা। কিছুদিন পর আমাদের মসজিদের ইমাম মাওলানা মীযানুর রহমান আমাকে শায়খ আয়নুল বারী আলিয়াভী (রহঃ)-এর লেখা 'ইসলাম ধ্বংসে তাবলীগ জামাত : বিভ্রান্তির ভেড়াজালে মুসলিম উম্মাহ' নামক একটি বই আমাকে পড়তে দেন। যা আমি খুব ভালভাবে পড়ি। বইটি পড়ে তো আমার মাথা ঘুরে গেল। সেখানে 'ফাযায়েলে আমল' নামক কিতাবে যে সকল হাদীছ যইফ ও জাল এবং কিচ্ছা-কাহিনী আছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ভাবলাম ফাযায়েলে আমল বইটিতে কুরআনের কিছু আয়াত, ছহীছ কিছু হাদীছ, যইফ কিছু হাদীছ, জাল এবং কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে জগাখিচুরী বই লিখা হয়েছে। আর এমন বই দিয়ে তাবলীগ করা যায় ঠিক নয়। বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছই তাবলীগের একমাত্র মাধ্যম। আহলেহাদীছ পরিবারের সন্তান হওয়ায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতি আকর্ষণটা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির।

ছহীহ দাওয়াতের কর্মতৎপরতা এবং তাবলীগ জামাআতের নিকট চিঠি প্রেরণ :

সুধী পাঠক! বিশ্বের অনেক মানুষ ইলিয়াছি তাবলীগ করে। আর নির্ভর করে ফাযায়েলে আমলের মত এক জগাখিচুরি কিতাবের উপর। এটা আমি মেনে নিতে পারিনি। এজন্য তাবলীগী ভাইদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখলাম। যাতে করে তারা ফাযায়েলে আমল কিতাবের পরিবর্তে পবিত্র কুরআন ও বুখারী, মুসলিম কিংবা যেকোন ছহীহ হাদীছের কিতাব দিয়ে তাবলীগের কাজ করেন। আর নিজেরাও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করেন। অতঃপর ১০ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে শায়খ আয়নুল বারী ছাহেবের বই ও চিঠি তাবলীগী জামায়াতের তৎকালীন আমীর মাওলানা জুবায়ের আহমাদের নিকট দেওয়ার জন্য ঢাকার কাকরাইল মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। অথচ যাওয়ার সময় অনেকে আমাকে নিরুৎসাহিত করে বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বলে আমাকে ভয় দেখায়, যাতে আমি থেমে যাই। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। মানুষকে যঈফ ও জাল হাদীছ এবং শিরক-বিদ'আতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে আর আহলেহাদীছের সন্তান হয়ে আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না? বুকে সাহস নিয়ে চলে গেলাম ঢাকার কাকরাইল মসজিদে। যোহরের ছালাত শেষে ইমামকে জিজ্ঞেস করলাম, মাওলানা মুহাম্মাদ জুবায়ের কে এবং তিনি কোথায়? তিনি বললেন, তিনি এখন পাকিস্তান সফরে আছেন। ভাবলাম এত দূর থেকে এসেছি আর তার সংগে দেখা না করে চলে যাব। মনটা শায় দিচ্ছে না। ফলে আরো দু'জনকে জিজ্ঞেস করি। মসজিদের তৃতীয় তলায় উঠে জিজ্ঞেস করলে তারাও বলল তিনি পাকিস্তানে আছেন। খুব শিঘ্রই আসবেন। আমি তখন বই ও চিঠি বের করে ঐ লোকটিকে দিলাম এবং বললাম কথা বলার মত আর কেউ কি

Contents

এখানে আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। তবে এখন কথা বলতে পারবেন না। আমি তখন বললাম, ভাই মাওলানা ছাহেব পাকিস্তান থেকে আসলে এই বই ও চিঠি তাকে দিতে পারবেন? লোকটি বলল, ঠিক আছে। তারপর আমি চিরতরে ইলিয়াছি তাবলীগ ছেড়ে দিলাম। আর খুঁজতে লাগলাম একটি সংগঠন। যে সংগঠনটি হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়ার আদর্শের স্বাচ্ছা অনুসারী।

হঠাৎ একদিন শুনলাম কাঞ্চন বাজারে আহলেহাদীছের একটি ইসলামী সম্মেলন হবে। বক্তা হিসাবে আছেন ডঃ মুছলেহ উদ্দিন, মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা) সহ আরো অনেকে। সেখানে গিয়ে পরিচয় হ'ল ভাই মুহাম্মাদ কামাল হোসেনের সাথে। যিনি ছিলেন আমার গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দা। তিনিও সঠিক একটি ইসলামী সংগঠন খুঁজছিলেন। তিনি বললেন, ভাই আমরা যেমন সংগঠন খুঁজছি এমন একটি সংগঠন বাংলাদেশে আছে। যার নাম **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**। আমি তাদের ঢাকার অফিসে একদিন গিয়েছিলাম। অতঃপর কামাল ভাইয়ের মাধ্যমে আমি জানতে পারি আমাদের এলাকায় মাওলানা এম.এ. কেরামত নামের একজন আলেম আছেন, যিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল করার জন্য মানুষের মাঝে দাওয়াতী কাজ করেন। অতঃপর ওয়ায শুনে চলে আসলাম। পরের দিন মাওলানা মীযানুর রহমানের সাথে সংগঠন নিয়ে কথা বলি। তিনি বললেন, আলমপুর এলাকায় রফিকুল ইসলাম নামের একজন ব্যক্তি রয়েছেন, যার সাথে প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ-আল-গালিব ছাহেবের সম্পর্ক আছে। যিনি 'যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতঃপর আমাদের এলাকায় সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমি রফিকুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি 'যুবসংঘ' ঢাকা যেলার দায়িত্বশীল মাওলানা সফিউল্লাহ্‌র সংগে কথা বলব। তিনি কথা বলে তারিখ ঠিক করলেন এবং বললেন মাওলানা সফিউল্লাহ আসবেন। আমি সুলপিনা জামে মসজিদে জায়গা নির্ধারণ করে মানুষদের দাওয়াত দিলাম। বাদ আছর মাওলানা সফিউল্লাহ সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। ফলে মানুষ দু'দলে ভাগ হয়ে গেল। কিছু লোক বলল, আজই কমিটি গঠন করা হোক। আবার কিছু লোক এর চরম বিরোধিতা করল। যাইহোক সব বিবেচনা করে কমিটি গঠন না করেই মাওলানা সফিউল্লাহ চলে গেলেন। ব্যাথা ভরা মন নিয়ে আমরাও যার যার বাসায় চলে গেলাম।

এরপর থেকে আমি নিয়মিত মাওলানা সফিউল্লাহর সাথে যোগাযোগ রাখতাম। ফলে তার সাথে একটা ভাল সম্পর্ক হয়ে গেল। ২০০৯ সালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর জাতীয় তাবলীগী ইজতেমা উপলক্ষ্যে মাওলানা সফিউল্লাহ্‌র সংগে আমি নওদাপাড়া রাজশাহীতে যাই। রাত ১১ টায় বাসযোগে যাত্রা করে ফজরের সময় পৌঁছি। সফিউল্লাহ ভাই আমাকে মুহতারাম আমীরে জামাতের সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে কিছু নছিয়ত করে বললেন, 'হক্বকে গ্রহণ কর আর বাতিলকে পরিত্যাগ কর। আত-তাহরীক পড়'। ভাবলাম আমাকে দুই কথায় বিধায় দিয়ে দিল। পরে বুঝলাম পুরা কুরআনের আদেশ ও নিষেধ এই দুই কথার মধ্যে নিহিত আছে। ইজতেমা শেষে বাড়ী ফিরে এলাম।

সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের যাত্রা :

তাবলীগী ইজতেমা থেকে ফিরে এসে নাজমুল ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করি। সংগঠনের কার্যক্রম শুরু করার ব্যাপারে আমরা আলোচনা করি। কিভাবে এই এলাকায় নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র দাওয়াত জোরদার করা যায়। আমরা দু'জনেই সিদ্ধান্ত নিলাম, আগে ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে। অতঃপর আমরা সফিউল্লাহর সাথে ঢাকা যেলার 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন প্রোগ্রামে উপস্থিত হতাম।

২০১১ সালে এক প্রোগ্রাম শেষে বাড়ী ফেরার পথে অহিদুল্লাহ নামের আমাদের এক ভাই বললেন, আমাদের এলাকায় সংগঠনের কাজ করা যায় কি-না? একটি কমিটি গঠন করি। সকলে রাজি হয়ে যার যার বাড়ী চলে গেলাম। আমিতো দারুণ খুশি। তখন হঠাৎ করে মনে উদয় হ'ল, এইতো সময় পূর্বাচল উপশহরে 'যুবসংঘ'-এর কমিটি গঠন করার। পরে আমি ও নাজমুল ইসলাম ভাই কাঞ্চন বাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা শফিকুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করি। কমিটি গঠনের ব্যাপারে কথা বলে প্রোগ্রামের জন্য স্থান নির্ধারণ করলাম মাঝিপাড়া জামে মসজিদ। মাওলানা সফিউল্লাহ আসলেন। বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার দূর মাঝিপাড়া জামে মসজিদে নিয়ে গেলাম। প্রোগ্রাম শুরু হ'ল। আলোচনা করলেন মাওলানা সফিউল্লাহ ও কেরামত স্যার। অতঃপর মাওলানা এম.এ. কেরামত স্যারকে সভাপতি, ছালাউদ্দীন মেম্বারকে সহ-সভাপতি করে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পূর্বাচল শাখা গঠন করা হয়। আর কামাল হোসেনকে সভাপতি, মুশাররফকে সহ-সভাপতি, আমাকে (নাজমুল হক্ব) সাধারণ সম্পাদক করে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পূর্বাচল শাখা গঠন করা হয়। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

[লেখক : সমাজকল্যাণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, নারায়ণগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা]

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের
মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য
ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে চলে আসা
নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

-বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

Contents

সংগঠন সংবাদ

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা পশ্চিম ২৩ অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ টি.এ্যান্ড.টি আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে যেলা 'যুসবংঘ'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস প্রমুখ। সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

জাফরনগর, ঝিকরগাছা, যশোর ২৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর জাফরনগর আহলেহাদীছ ঈদগাহ ময়দানে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ জাফরনগর শাখার ব্যবস্থাপনায় কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এবং 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, যশোর যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা বযলুর রশীদ, কেশবপুর উপযেলা 'আন্দোলনে'র সহ-সভাপতি মুত্তালিব বিন ঈমান, যশোর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা তরিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি হাফেয তরিকুল ইসলাম, যশোর যেলা 'সোনামণি' সংগঠনের পরিচালক আশরাফুল আলম প্রমুখ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঝিকরগাছা উপযেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা মনিরুযযামান।

মারকায এলাকা ২১ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর মারকায জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' মারকায এলাকার যৌথ উদ্দেগে পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মারকায মাদরাসার হেফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও 'মাসিক আত-তাহরীক'-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী এবং 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর মারকায এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ। পরিশেষে শাহীন রেজা (ছানাবিয়া ২য় বর্ষ)-কে সভাপতি ও সিরাজুল ইসলাম (৯ম)-কে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট মারকায এলাকার কমিটি পুণর্গঠণ করা হয়। কমিটি ঘোষণা করেন 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী মহানগরের সাধারণ সম্পাদক নাজীদুল্লাহ বিন নূরুল হুদা।

ঝিনাইদহ ৩১ শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার গোবরা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর পাবনা যেলার সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র শূরা সদস্য ও সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হারুনুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মিলন আখতার। উল্লেখ্য যে, প্রায় চার শতাধিক কর্মী ও সুধীর উপস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে ইজতেমার কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং আলোচনা শেষে বক্তাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে উপস্থিত সকলের মধ্যে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং সঠিক উত্তর দাতাদেরকে 'তাওহীদের ডাক' পুরস্কার প্রদান করা হয়।

যেলা সংবাদ

ঝিনাইদহ ০৯ নভেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার চোরকোল দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক হাফেয আব্দুল আলীম। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র শূরা সদস্য ও সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হারুনুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মিলন আখতার, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ বিল্লাল হোসেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল মুমীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক ইকরামুল হক।

যশোর বিমান বন্দর, ২৩ নভেম্বর, সোমবর : অদ্য বাদ যোহর যশোর বিমানবন্দর জামে মসজিদে বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক জনাব আলমগীর পাঠানের সভাপতিত্বে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তা'লীমী বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে আলোচনা পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর ঢাকা যেলার সাবেক সভাপতি আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যবুসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও যশোর যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন, মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক

(রাজশাহী), যশোর সদর উপযেলা আন্দোলনের সভাপতি মোঃ জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

মনোহরপুর, মনিরামপুর, যশোর, ২৩ নভেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর মনোহরপুর দাখিল মাদরাসা মাঠে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, মনোহরপুর শাখার উদ্যোগে ইসলামী সম্মেলন-২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক জিরাজুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি, পিস টিভি বাংলার আলোচক শায়খ আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল আল-মাদানী। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (রাজশাহী) আহলেহাদীছ যুবসংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি যশোর যেলা আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠির প্রধান জনাব শফিকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা বযলুর রশীদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা তরিকুল ইসলাম, সম্মেলনের আহবায়ক যশোর যেলা 'সোনামনি' সংগঠনের পরিচালক আশরাফুল আলম প্রমুখ।

আখ গড়গড়িয়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা পূর্ব, ৪ ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব গড়গড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউনুস আলী সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অসংখ্য ছাত্র, যুবক ও সুধীমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা পশ্চিম, ৪ ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ আমবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সুধী জনাব মুহাম্মাদ শাহীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান প্রমুখ।

গোলহাড়িয়া, রাজশাহী ১৩ নভেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর গোলহাড়িয়া মাদরাসা প্রাঙ্গনে শাখা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক 'যুব সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুর রকীব, 'সোনামণি'-এর রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আলী সহ প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে অসংখ্য যুবক, সুধী মণ্ডলী ও মহিলা উপস্থিত হন।

শিরোইল, রাজশাহী ২৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব শিরোইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন।

বাসুদেবপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ২৮ নভেম্বর, শনিবার : অদ্য বাদ আছর বাসুদেবপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শাখা গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের ইমাম দেলোয়ার হোসেনর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম।

কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১০ নভেম্বর, মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর কানসাটে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতিত্বে একটি 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

খারেজী মতবাদ : পর্ব-১

১. খারেজী মতবাদ কোন্ ধরণের মতবাদ?
উত্তর : একটি প্রাচীন মতবাদ।
২. ফের্কাবন্দীর ইতিহাসে প্রধান ভ্রান্ত ফের্কা কোন্টি?
উত্তর : খারেজী ফের্কা।
৩. খারেজী মতবাদ কোন্ জিনিসকে কেন্দ্র করে উদ্ভব ঘটেছে?
উত্তর : নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতাকে কেন্দ্র করে।
৪. রাজনৈতিক দল হিসাবে খারেজী মতবাদের মূল টার্গেট কী?
উত্তর : রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করা।
৫. কোন্ সময় খারেজী মতবাদের আর্বিভাব লক্ষ্য করা যায়?
উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর তিরোধানের পূর্বমুহূর্তে।
৬. খারেজী মতবাদের মুখোশ কখন উন্মোচিত হয়?
উত্তর : ওমর এবং ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার পর।
৭. ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর হত্যাকারী কারা?
উত্তর : খারেজীরা।
৮. খারেজী দল কাকে হত্যা করে আত্মপ্রকাশ লাভ করে?
উত্তর : আলী (রাঃ)-এর।
৯. ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র চিরন্তন শত্রু কারা?
উত্তর : চরমপন্থী খারেজীরা।
১০. খারেজীদের সম্পর্কে কে সর্বাধিক বেশী সতর্ক করেন?
উত্তর : রাসূল (ছাঃ)।
১১. চরমপন্থীদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ার করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছ কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে?
উত্তর : 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৩০১)*।
১২. কারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করলে তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না?
উত্তর : খারেজীরা *(মুসলিম হা/২৪৬৬)*।
১৩. খারেজীরা ইসলাম থেকে কিভাবে বের হয়ে যাবে?
উত্তর : তীর শিকারীকে ভেদ করে বের হওয়ার ন্যায় *(ঐ)*।
১৪. সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট জাতি কারা?
উত্তর : খারেজী চরমপন্থীরা।
১৫. কারা মুসলিমকে হত্যা করবে?
উত্তর : খারেজীরা।
১৬. রাসূল (ছাঃ) খারেজীদেরকে কাদের মত হত্যা করতে চেয়েছিলেন?
উত্তর : 'আদ সম্প্রদায়ের ন্যায় *(ঐ)*।
১৭. শেষ যামানায় চরমপন্থীদের পরিচয় কেমন হবে?
উত্তর : অল্প বয়সী নির্বোধ তরুণ।
১৮. কাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না?
উত্তর : অল্প বয়সী নির্বোধ তরুণদের।
১৯. খারেজীদের হত্যা করার ফযীলত কেমন?
উত্তর : অশেষ নেকী রয়েছে *(বুখারী হা/৩৬১১)*।
২০. পৃথিবীর সর্বাধিক ঘৃণিত ফের্কা কোন্টি?
উত্তর : খারেজী ফের্কা।
২১. খারেজীদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণী কখন প্রকাশ পায়?
উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর যুগের শেষ দিকে।
২২. ইয়ামান থেকে গণীমতের মাল কে প্রেরণ করেছিলেন?
উত্তর : আলী (রাঃ) *(বুখারী হা/৭৪৩২)*।
২৩. তৎকালীন খারেজীদের নেতা কে ছিল?
উত্তর : যুল-খুওয়াইছির *(ঐ)*।
২৪. যুল-খুওয়াইছির কোন্ গোত্রের লোক ছিল?
উত্তর : বনু তামীম গোত্রের *(ঐ)*।
২৫. গণীমতের মাল বণ্টনে রাসূল (ছাঃ)-কে সন্দেহ করেছিল কে?
উত্তর : যুল-খুওয়াইছির *(ঐ)*।
২৬. 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি ইনছাফ করুন' কথাটি কে বলেছিল?
উত্তর : যুল-খুওয়াইছির *(মুসলিম হা/২৪৫৩)*।
২৭. 'হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় কর' কথাটি কার?
উত্তর : খারেজী নেতা যুল-খুওয়াইছিরের *(বুখারী হা/৭৪৩২)*।
২৮. যুল-খুয়াইছিরকে প্রথম হত্যা করতে কে গিয়েছিলেন?
উত্তর : আবুবকর (রাঃ) *(আল-আহাদীছুল মুখতারাহ হা/২৪৯৯)*।
২৯. যুল-খুওয়াইছিরকে হত্যা করতে গিয়ে আবুবকর (রাঃ) তাকে কোন্ অবস্থায় পেয়েছিলেন?
উত্তর : ছালাতরত অবস্থায় *(ঐ)*।
৩০. যুল-খুওয়াইছিরকে হত্যা করতে দ্বিতীয়বার কে গিয়েছিলেন?
উত্তর : ওমর (রাঃ) *(ঐ)*।
৩১. যুল-খুয়াইরিছকে হত্যা করতে গিয়ে ওমর (রাঃ) তাকে কোন্ অবস্থায় পেয়েছিলেন?
উত্তর : ছালাতরত অবস্থায় *(ঐ)*।
৩২. যুল-খুওয়াইছিরকে হত্যা করতে তৃতীয়বার কে গিয়েছিলেন?
উত্তর : আলী (রাঃ) *(ঐ)*।
৩৩. আলী (রাঃ) যুল-খুওয়াইছিরকে হত্যা করতে গিয়ে তাকে কি পেয়েছিলেন?
উত্তর : না *(ঐ)*।
৩৪. উম্মতের প্রথম শত্রু কে?
উত্তর : যুল-খুওয়াইছির *(ঐ)*।
৩৫. কাকে হত্যা করলে পৃথিবীতে আর মতভেদ থাকত না?
উত্তর : যুল-খুওয়াইছিরকে *(ঐ)*।
৩৬. বানী ইসরাঈলরা কত দলে বিভক্ত ছিল?
উত্তর : ৭১ দলে *(তিরমিযী হা/২৬৪১, সনদ হাসান)*।
৩৭. উম্মতে মুহাম্মাদী কতদলে বিভক্ত হবে?
উত্তর : ৭৩ দলে *(তিরমিযী হা/২৬৪১, সনদ হাসান)*।
৩৮. মুক্তিপ্রাপ্ত দল কয়টি?
উত্তর : একটি *(তিরমিযী হা/২৬৪১, সনদ হাসান)*।
৩৯. মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় কী?
উত্তর : একটি ঐক্যবদ্ধ জামা'আত *(আল-আহাদীছুল মুখতারাহ হা/২৪৯৯, সনদ ছহীহ)*।
৪০. 'আমি ও আমার পথে যারা থাকবে তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত' বক্তব্যটি কার?
উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর *(তিরমিযী হা/২৬৪১, সনদ হাসান)*।

Contents

আইকিউ

[কুইজ-১; কুইজ-২; শব্দজট-৩-এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ১০ জানুয়ারীর মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ ১/৮ (১) :

১. অশান্তির মূল কারণ কী?

২. লুক্বমান হাকীম নবী ছিলেন কী?

৩. মতপ্রকাশের অধিকার মানুষের কোন্ ধরনের অধিকার?

৪. মতপ্রকাশের মূলনীতি কয়টি?

৫. ইয়ামান থেকে গণীমতের মাল কে নিয়ে এসেছিলেন?

৬. পশ্চিমবঙ্গের সাথে সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের একমাত্র যেলা কোন্টি?

৭. ২০১৫ সালে শরণার্থীদের সর্বোচ্চ আশ্রয়দাতা দেশ কোন্টি?

৮. 'ইংরেজ ক্যাম্প রুস্তম' কী?

৯. 'আল-মুহাররিয' কী?

১০. 'হুজ্জাতুল ইসলাম' উপাধি কার?

১১. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করা যাবে কি?

১২. 'জাতিসংঘ' কতসালে মানবাধিকার সনদ তৈরী করে?

১৩. ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের খিলাফত কাল কত?

১৪. উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন কতটি যুগে বিভক্ত?

১৫. মুহাম্মাদ বিন কাসিম কত হিজরীতে সিন্ধু জয় করেন?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. বাব-এল-মান্দের প্রণালী ২. একটি শী'আ ফের্কা ৩. আনছারুল্লাহ বা শাবাব মুসলিম ৪. প্রবৃত্তির অনুসরণ ৫. ভীত-সন্ত্রস্ত করে ৬. শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী ৭. হাফেয আব্দুল গণী আল-মাক্বদেসী ৮. ইবনু রজব ৯. ১৬ হাযার ৩০০টি ১০. লিটল বয় ১১. ফ্যাটম্যান ১২. যথাক্রমে ৯.৮৪ ফুট এবং ১০.৬ ফুট ১৩. দীর্ঘ ৬৮ বছর ১৪. ৫১টি ১৫. ১১১টি।

কুইজ ২/৮ (২) :

১. আল্লাহ্র অহি-র উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন কে?

২. পৃথিবীতে সকল ঈমান আনয়নকারীর সমান নেকী পাবেন কে?

৩. কোন্ স্ত্রীর জীবদ্দশায় রাসূল (ছাঃ) কোন বিয়ে করেননি?

৪. রাসূল (ছাঃ)-এর সন্তানের জননী কে ছিলেন?

৫. রাসূল (ছাঃ) সর্বাধিক কোন্ স্ত্রীকে স্মরণ করতেন?

৬. রাসূল (ছাঃ)-এর কোন্ স্ত্রীকে আল্লাহ সালাম পাঠিয়েছিলেন?

৭. খাদিজার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর মুহাব্বাত ছিল কেমন?

৮. খাদিজার উপর রাসূল (ছাঃ)-এর কোন্ স্ত্রী ঈর্ষান্বিত ছিলেন?

৯. উম্মতে মুহাম্মাদীর সর্বপ্রথম মহিলা কে?

১০. রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে নারীদের নেত্রী কে ছিলেন?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. খাদিজা। ২. আবু হালা হিন্দা ইবনু যুরারা আত-তামীমী ৩. ধনী ও চরিত্রবান ৪. ফাতিমা বিনতু যায়েদ। ৫. খুওয়াইলিদ ইবনু আসাদ। ৬. ৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। ৭. পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা। ৮. ২৫ ও ৪০ বছর। ৯. ১৫ বছর। ১০. খাদিজা।

শব্দজট ৩/৮ (১) :

এবারের শব্দজটটি তৈরী করেছেন কুষ্টিয়া পশ্চিম যেলার 'সোনামণি'-এর পরিচালক মামুন বিন হাসমত।

	১			২	৩	
৪			৫		৬	৭
		৮		৯		
	১০			১১		
১২						১৩
১৪	১৫				১৬	
	১৭			১৮		

পাশাপাশি : ১. ইসলামের চতুর্থ খলীফা ২. মসজিদের শহর ৪. শান্তির শহর নামে খ্যাত ৬. রাজশাহী যেলার একটি উপযেলা ৮. আদম (আঃ)-এর একজন সন্তান ১০. কালীমুল্লাহ উপাধিপ্রাপ্ত নবী ১১. একটি ঋতু ১৪. মানুষ ব্যতীত আরেকটি জাতি, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন ১৬. ফুল দিয়ে তৈরী ১৭. বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ ১৮. আসবাবপত্র তৈরীর উপকরণ।

উপর-নীচ : ১. একটি সুস্বাদু ফল ৩. ইসলামের সর্বপ্রথম গৃহের নাম ৪. Patient শব্দের বাংলা অর্থ ৫. স্ত্রী শব্দের প্রতিশব্দ ৭. জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান যে দেশের নাগরিক ৮. আলী (রাঃ)-এর একজন সন্তান ৯. যার পানি হতে জন্ম এবং পানি স্পর্শেই মৃত্যু ১২. Warrior এর বাংলা অর্থ ১৩. একটি সূরার নাম ১৫. নতুন-এর প্রতিশব্দ ১৬. যেখানে ফসল উৎপন্ন হয়।

গত সংখ্যার শব্দজটের সঠিক উত্তর : উপর-নীচ : ১. বকুল ২. রহমত ৪. রসুন ৫. রহীম ৭. কালেমা ৯. মদীনা ১১. আম।

পাশাপাশি : ১. বদর ৩. তয়ব ৫. রমযান ৬. হামহাম ৮. মারয়াম ১০. পাবনা ১১. আযান।

*[**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা :** বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]*